কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা

The necessity of the Madhab for the implementation of rules of the Quran and the Hadith

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

পিএইচডি গবেষক
ফাতেমা মারজান
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা
রেজি নং ১০২/২০১৭-২০১৮

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফেব্রুয়ারী ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচডি গবেষক ফাতেমা মারজান কর্তৃক পিএইচডি ডিগ্রি লাভের জন্য রচিত ও উপস্থাপিত 'কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা' Necessity of the Madhab for the implementation of rules of the Quran and Hadith শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। অভিসন্দর্ভের পুরোটা বা আংশিক কোথাও প্রকাশিত হয়নি বা অন্য কোনো ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা যেতে পারে।

আমি গবেষকের সার্বিক সাফল্য ও উন্নতি কামনা করছি।

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা প্রদান করছি যে, 'কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা' Necessity of the Madhab for the implementation of rules of the Quran and Hadith শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও প্রকাশ বা ডিগ্রি লাভের জন্য জমা দেই নি।

বিনীত-

ফাতেমা মারজান

পিএইচডি গবেষক

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা
রেজি নং ১০২/২০১৭-২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুরুতে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শোকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে 'কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত করার তাওফীক দান করেছেন। প্রাণ উজাড় করা দরূদ ও সালাম পেশ করছি সৃষ্টির সেরা আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি কুরআ'ন মজীদের আলোকে জীবন গড়ার বাস্তব নমুনা দুনিয়ার মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। সেই নমুনা সুন্নাহ তথা হাদীসের সুবিশাল ভাণ্ডারকে সামনে রেখে মাযহাবের ইমামগণ মুসলিম সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন পুরণের জন্য আইনের সৌধমালা রচনা করেছেন। আমার এই গবেষণাকর্মের পেছনে যাঁদের দু'আ, ত্যাগ, দিক-নির্দেশনা ও অবদান রয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষত এই গবেষণাকর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান স্যারের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁর আন্তরিক নির্দেশনা, পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে অকৃপণ সহযোগিতা, পরামর্শ ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করছেন।

আমার সম্মানিত মা ও বাবার প্রতি প্রাণ উজাড় করা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁদের স্নেহের পরশে ছোটবেলা থেকে দ্বীন সম্পর্কে একটি সহীহ সমঝ নিয়ে বড় হয়েছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যায়তনের ইসলামিক স্টাডিজ এর বাগান হতে জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছেন। শৈশবে মা বাবার সাথে ইরানে অবস্থানকালে ফারসি ভাষা শেখা, পরে মাদরাসা জীবনে আরবী ভাষার সাথে পরিচয় লাভে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ঢাকাস্থ কালচারাল সেন্টার এর প্রধান কালচারাল কাউন্সেলর ড. হাসান সেহহাত এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যিনি আমার গবের্ষণাকর্মটি এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে কালচারাল সেন্টারের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি ও সুযোগ দিয়েছেন। একই সাথে আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত জনাব রেযা নাফার এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যিনি ইরান দূতাবাসের সমৃদ্ধ লাইব্রেরী হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি, যাঁদের অনুপ্রেরণ, দু'আ ও নির্দেশনা আমাকে এতদূর আসতে সাহায্য করেছে। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের যশস্বী শিক্ষক ও অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম খানের প্রতি, যিনি আমার গবেষণাকর্ম সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক সরবরাহ করেছেন।

একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরী, মাদরাসা আলিয়া ঢাকা লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, পাবলিক লাাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরী এবং চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা সময়ে অসময়ে আমার গবেষণাকর্মের

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে উদার মনে সহায়তা দিয়েছেন। বিশেষ করে আরবি ফারসি বইয়ের সমাহার আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরীর আনুকূল্যের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

জীবন চলার পথে নানা বাধা উপেক্ষা করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে যিনি আমাকে নিত্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, আমার অনেক অবহেলা অনুরাগ সহ্য করেছেন তিনি আমার জীবনসাথী মোশররফ হোসাইন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার গবেষণাকর্মের ব্যস্ততার জন্য মায়ের স্নেহসোহাগ বঞ্চিত আমার প্রিয় সন্তান মাহনায মারিয়াম, হোসাইন মুহাম্মাদ আকিফ শাহীর ও হোসাইন মুহাম্মদ রূহুল্লাহ মুকাদ্দাস এর প্রতি রইল প্রাণভরা দো'আ ও আদর।

পরিশেষে আবারো আমার মা বাবা ও তত্ত্বাবধায়ক স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাদের যত্ন ও পরিচর্যা আমাকে জ্ঞানচর্চার জগতে এতদূর নিয়ে এসেছে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমার মরহুম দাদাজান ইলাহী বখশ এর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি, যাঁর প্রাণভরা দু'আ ও স্বপ্ন ছিল আমাকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আমার নানাজান মরহুম মওলানা আব্দুল হাই সাহেবের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি, যিনি জ্ঞান সাধনায় নিজের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও ঐতিহ্য রেখে গেছেন।

মুসলিম উম্মাহর অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে এই অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। আমার সাধ্যের আওতায় বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের প্রতি একটি সতর্কবার্তা দেয়াই আমার উদ্দেশ্য। কেননা, ফিকহ শাস্ত্রকে অস্বীকার ও মাযহাবের বিরুদ্ধাচরণ করে উগ্র চিন্তাধারায় যুব সমাজের মন মানসকে কলুষিত করার একটি প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যার ভয়াবহ পরিণাম থেকে আমরা কেউ রেহাই পাব না। আল্লাহ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবূল করুন। আমীন।

বিনীত-

ফাতেমা মারজান

পিএইচডি গবেষক

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

রেজি নং ১০২/২০১৭-২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা

প্রস্তাবনা- ১৪

১ম অধ্যায়

মানব সভ্যতায় শরী'আ ও মাযহাব

মানব সমাজে আসমানী নির্দেশনার গুরুত্ব - ২০

সমাজবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব - ২০

সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষায় যুগ যুগে আসমানী পথনির্দেশ - ২১

আসমানী পথনির্দেশের বিষয়বস্তু - ২১

দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, অনৈক্য পরিহারের নির্দেশনা - ২২

হযরত নূহ (আ)-এর শরী'আ - ২২

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরী'আ - ২৩

হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আ - ২৪

হযরত ঈসা (আ)-এর যমানায় শরী'আ - ২৫

বিশ্বনবী (সা)-এর শরী'আ - ২৫

২য় অধ্যায়

কুরআ'ন মাজীদ মানব জাতির হেদায়তের আলোকবর্তিকা

সভ্যতা নির্মাণে কুরআ'ন মাজীদ - ২৮

ঘন্টার আওয়াজের মত একটানা - ২৮

মানুষের বেশে ফেরেশতার আগমন - ২৯

সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলা - ৩০

ওহীর বাণী সরাসরি অন্তরে ঢেলে দেয়া - ৩০

স্বপযোগে - ৩০

কুরআ'ন নাযিলের পর্যায়ক্রম - ৩০

প্রথম পর্যায় - ৩০

দ্বিতীয় পর্যায় - ৩১

মক্কী ও মাদানী সূরা - ৩১

শানে নুযুল - ৩১

ওহী ও হাদীসে কুদসি - ৩১

Dhaka University Institutional Repository

কুরআ'ন মাজীদ সংকলনের ইতিহাস

যেভাবে ওহী লিপিবদ্ধ করা হত - ৩২

আয়াতগুলো যেভাবে সাজানো হত - ৩২

একত্রে সংকলনের প্রথম উদ্যোগ - ৩৩

সংকলিত প্রথম কুরআ'ন যার কাছে সংরক্ষিত ছিল - ৩৩

অভিন্ন কুরআ'ন সংকলন - ৩৩

মাসহাফে উসমানীর বিবরণ - ৩৪

কুরআ'ন হাকীমের লেখকগণ - ৩৫

নোকতার প্রচলন - ৩৬

হরকত - ৩৭

মনযিল - ৩৭

পারা - ৩৭

রুকু - ৩৭

রুমুযে আওকাফ বা যতিচিহ্ন - ৩৮

আয়াত সংখ্যা - ৩৮

আয়াতের নাম্বার - ৩৮

কুরআ'ন মাজীদের আত্মপরিচয় - ৩৮

আল-কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য - ৫২

যাদের বিরুদ্ধে কুরআ'ন নালিশ করবে - ৫২

৩য় অধ্যায়

ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদীসশাস্ত্র

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব - ৫৫

কুরআনের সাথে সাথে হাদীসও দ্বীনের মূল স্তম্ভ - ৫৬

আল কুরআনে রাসূল (সা) এর গুরুত্ব - ৬০

হালাল হারাম নির্ধারণের ভার রাসূল (সা) এর উপর ন্যস্ত - ৬৭

রাসূলের আনুগত্যের তাৎপর্য - ৬৯

রাসূল (সা) এর অমান্যতার অপরাধ - ৭১

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্যের তাত্ত্বিক কারণ - ৭২
ইত্তিবা ও ইতাআতে রাসূলে তফাৎ - ৭৩
হাদীস হল কুরআ'ন মজীদের ব্যাখ্যাতা- ৭৫
ইসলামের উৎস হিসেবে হাদীসে রাসূলের স্বতন্ত্র মর্যাদা - ৭৮
নবী কারীম (সা) এর হাদীস ও ইজতিহাদের মধ্যে তফাৎ - ৮৩
হাদীস অমান্যকারী কাফের - ৮৬
আহলে কুরআ'নদের ফিতনা - ৮৭

হাদীস সংকলনের বিবরণ

প্রথম পদ্ধতি: হাদীসের বর্ণনা মুখস্থকরণ - ৯২
দ্বিতীয় পদ্ধতি: কর্মে পরিণতকরণ - ৯৩
তৃতীয় পদ্ধতি: লিপিবদ্ধকরণ - ৯৪
হাদীস সংরক্ষণে হযরত আলী (রা)-এর অবদান - ১০৩
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর শাসনামলে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ - ১০৪
হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস শরীফ সংকলন - ১০৬
হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস শরীফ সংকলন - ১০৭
হাদীসের প্রকারভেদ ও তার গুরুত্ব - ১১০
হাদীস শরীফ চর্চাকারীগণের বিভিন্ন স্তর - ১১৩
মূলপাঠ ও সনদের বিধানগত পার্থক্য - ১১৪
জাল হাদীসের বিধান - ১১৫
হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়সমূহের বিবরণ - ১১৫

প্রখ্যাত হাফেযুল হাদীসগণের নাম

ক. হানাফী মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম - ১১৬
খ. শায়েফী মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম - ১১৭
গ. মালেকী মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম - ১১৮
ঘ. হাম্বলী মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম - ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির বিভিন্ন স্তর

প্রথম স্তর - ১১৯

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির দ্বিতীয় স্তর - ১২০

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির তৃতীয় স্তর - ১২২

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির চতুর্থ স্তর - ১২৪

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির পঞ্চম স্তর - ১২৫

৪র্থ অধ্যায়

কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামের গতিশীলতার রক্ষাকবচ ইজতিহাদ - ১২৯

যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানে ইজতিহাদ - ১২৯

ভ্রান্তির কবল থেকে বাঁচাতে পারে ইজতিহাদ - ১৩০

ফিকহী চিন্তাধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ - ১৩০

ফিকহ সংকলনের গোড়ার কথা - ১৩১

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে আজকের প্রয়োজন - ১৩২

ইসলামী আইনের আধুনিক সংকলনের প্রয়োজনীয়তা - ১৩৩

প্যারিস সম্মেলনের অভিজ্ঞতা - ১৩৫

পূর্বেকার যুগের তাকলীদ ও তার ধরন - ১৩৭

তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া - ১৩৯

ইজতিহাদ ও তাক্বলীদের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি - ১৪২

তাক্বলীদের জায়েয ও স্বাভাবিক ধরন - ১৪৩

চার মাযহাবের বৈশিষ্ট্য - ১৪৫

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক যুগে - ১৪৭

ফিকহশাস্ত্র

ফিকহের আলোচ্য বিষয় - ১৪৭

ফিকহের উদ্দেশ্য - ১৪৯

ফিকহের ক্রমবিকাশ - ১৫০

প্রথম বা প্রাচীন যুগ (হিজরী ১৩০-৪০০) - ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যযুগ (হিজরী ৪০০-৭০০) - ১৫২
তৃতীয় যুগ (হিজরী ৭৫০-আজ অবধি) - ১৫৩
প্রথম যুগে ফিকহী মাসায়েল সম্পাদনার পদ্ধতি - ১৫৩
তবাকাতুল ফুকাহা (ফকীহদের স্তর) - ১৫৫
প্রথম স্তর - ১৫৫
দ্বিতীয় স্তর - ১৫৫
তৃতীয় স্তর - ১৫৫
চতুর্থ স্তর - ১৫৫
পঞ্চম স্তর - ১৫৬
ষষ্ঠ স্তর - ১৫৬
সপ্তম স্তর - ১৫৬
মুতাকাদ্দিমীনের পরিচয় - ১৫৬
মুতাআখ্খেরীনের পরিচয় - ১৫৭

চার মাযহাবের ইমামগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. হানাফী মাযহাব–ইমাম আবু হানিফা (র)

জন্ম - ১৫৮
বংশধর - ১৫৮
বাল্যকাল - ১৫৯
শিক্ষাজীবন - ১৫৯
গুণাবলি - ১৫৯
ইমাম আজম সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি - ১৬০
সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত ও সাহচর্য লাভ - ১৬১
ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার অবদান - ১৬১
হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান - ১৬২
বিচারকের দায়িত্ব পালনে অনীহা - ১৬২
শিক্ষকবৃন্দ - ১৬২
ছাত্রবৃন্দ - ১৬২
রচনাবলি - ১৬২
ইন্তিকাল - ১৬২
জানাযা ও অন্তীম শয়ন - ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

২. মালিকী মাযহাব– ইমাম মালিক (র)

নাম - ১৬৩

বংশধারা - ১৬৩

জন্ম - ১৬৩

শিক্ষাজীবন - ১৬৩

অধ্যাপনা - ১৬৩

শিক্ষকবৃন্দ - ১৬৪

ছাত্রবৃন্দ - ১৬৪

ব্যক্তিগত গুণাবলি -১৬৪

নির্যাতন ভোগ - ১৬৪

ফিকহের ইতিহাসে ইমাম মালেক (র) এর স্থান - ১৬৫

রচনাবলি - ১৬৫

ইন্তিকাল - ১৬৫

৩. শাফেঈ মাযহাব– ইমাম শাফেঈ (র)

নাম - ১৬৬

বংশধারা - ১৬৬

জন্ম - ১৬৬

বাল্যকাল - ১৬৬

শিক্ষাজীবন - ১৬৬

অধ্যাপনা - ১৬৭

রচনাবলি - ১৬৭

গভর্নরের দায়িত্ব পালন - ১৬৭

গুণাবলি - ১৬৭

শিক্ষকবৃন্দ - ১৬৮

ছাত্রবৃন্দ - ১৬৮

ইন্তিকাল - ১৬৮

৪. হাম্বলী মাযহাব–ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)

Dhaka University Institutional Repository

নাম - ১৬৯

বংশধারা - ১৬৯

জন্ম - ১৬৯

বাল্যকাল - ১৬৯

শিক্ষাজীবন - ১৬৯

শিক্ষকবৃন্দ - ১৬৯

ছাত্রবৃন্দ - ১৭০

স্মৃতিশক্তি - ১৭০

গুণাবলি - ১৭১

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য - ১৭১

নির্যাতনের শিকার - ১৭১

রচনাবলি - ১৭১

হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান - ১৭২

তার সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি - ১৭২

ইন্তিকাল - ১৭৩

ফিকহী পরিভাষার উপর রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব - ১৭৩

কতিপয় প্রাজ্ঞ ফিকহবিদ ও তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর - ১৭৪

ফিকহশাস্ত্রে ভারতবর্ষের উলামায়ে কেরামের অবদান - ১৭৬

মাযহাবের গুরুত্ব

কুরআ'ন এর মর্ম উদঘাটনে মাযহাবের গুরুত্ব - ১৭৮

হাদীস এর মর্ম উদঘাটনে মাযহাবের গুরুত্ব - ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

মাযহাব অস্বীকারকারীদের অভিযোগ ও তার জবাব -

তাকলীদ কখন প্রয়োজন, কখন প্রয়োজন নেই - ১৮৬

শরী'আর আহকাম এর প্রকারভেদ - ১৮৬

মুজতাহিদ ইমাম কি স্বতন্ত্র আইন প্রণেতা? - ১৮৮

তাকলীদের দু'টি ধরন - ১৮৯

হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব -

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাকলীদ - ১৯৫

ইমামের পেছনে কেরাত পড়া না পড়ার প্রশ্নে তাকলীদ - ২০০

পানি পানে তাকলীদের উদাহরণ - ২০১

ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগে - ২০২

প্রথম উদাহরণ ঋতুবতী মহিলাদের তাওয়াফ প্রসঙ্গে - ২০২

ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদের উদাহরণ - ২০৪

ব্যক্তি তাকলীদের আরো একটি উদাহরণ - ২০৬

তাবেয়ীদের জীবন থেকে উদাহরণ - ২০৭

ব্যক্তি তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা - ২১০

মাযহাব চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার হেকমত - ২১৯

তাকলীদের স্তরভেদ

প্রথম স্তর: আমজনতা এর তাকলীদ - ২২৫

দ্বিতীয় স্তর: মুতাবাহহার ফিল মাযহাব এর তাকলীদ - ২২৯

তৃতীয় স্তর: মুজতাহিদ ফিল মাযহাব এর তাকলীদ - ২৩৮

চতুর্থ স্তর: মুজতাহিদে মুতলাক এর তাকলীদ - ২৩৮

উপসংহার - ২৪১

গ্রন্থপঞ্জি - ২৪৫ - ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা

প্রস্তাবনা

যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি এখানে আমাদের প্রথম আগমন হয়েছে হযরত আদম (আ) এর মাধ্যমে। পৃথিবীর জীবনকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী সাজানোর অভিপ্রায়ে আল্লাহ পাক আদম (আ) কে তার খলিফা বা প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেন। এ উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে মানব বসতির বিস্তার সাধরেন জন্য আদম (আ) এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেন তার জীবন সঙ্গীনী বিবি হাওয়া (আ)-কে। তিনি আমাদের আদি মাতা। কুরআ'ন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমারা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[১]

কুরআ'ন মজীদে একই ভাবার্থের আরো কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে। ইরশাদ হয়েছে:

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه و فى لفظ مسلم استوصوا بالنساء خيرا

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা নারীদের ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ কর (তাদের প্রতি কোমল ব্যাবহার কর, সর্বদা তাদের কল্যাণকামী হও, কোনো অবস্থাতেই তাদের প্রতি রুষ্ট হইও না, এর কারণ) নিশ্চয়ই নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাঁড় থেকে। আর সবচেয়ে বাঁকা জিনিস হল পাঁজরের হাঁড়ের মধ্যে সবচে উপরেরটি। কাজেই তুমি যদি

১ আল কুরআ'ন - ৪ ঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

নারীদেরকে (তাদের স্বভাব আচরণ) একদম সোজা করতে চাও, তা তুমি ভেঙে ফেলবে। আর যদি তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকা অবস্থায় থাকবে।[২]

আদম ও হাওয়া (আ.) প্রথমে ছিলেন বেহেশতে। সেখানে শয়তানের প্ররোচণায় আল্লাহর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার কারণে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হয় পৃথিবীর মাটিতে। আল্লাহ পাকের পরিকল্পনা ছিল পৃথিবীতে আদম ও হাওয়ার দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়ে সমাজবদ্ধ মানব জীবনের সূচনা হবে। তাদের ঘরে সন্তান এবং সন্তানের সন্তান জন্মলাভ করবে। পরস্পর আত্মীয়তার বলয় ও বৃহত্তর মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটবে। তখন পারস্পরিক শৃঙ্খলা বিধান, বিরোধ নিষ্পত্তি, পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব ও অধিকার নির্ণয় এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন দেখা দেবে নির্দিষ্ট নীতিমালার। তাই তিনি বলে দিলেন,

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'আমি বললাম, তোমরা সবাই এই স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ (হুদা) অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[৩]

বস্তুত পৃথিবীতে মানব জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে আল্লাহ পাক তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন আসমানী গ্রন্থ বা ওহী যোগে জীবন যাপনের নীতিমালা, পরিভাষায় 'হুদা' বা হেদায়ত। আল্লাহর মনোনীত মহাপুরুষ নবী-রাসূল (আ)-গণ আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়তকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য যে পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন তার নাম শরী'আ। আল-কুরআনের পরিভাষায় 'শির'আতাওঁ ওয়ামিনহা–জা–'।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

'আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আ ও স্পষ্ট পথনির্দেশ নির্ধারণ করেছি।'[৪]

জীবন ও সমাজ পরিচালনার নীতিমালা-মানুষ নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার নিরিখে নির্ণয় করতে পারলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে এমন নীতিমালার প্রয়োজন ছিল, যা মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। কারণ, মানুষের নিজের তৈরি আইন নিজের বা নিজের গোত্রীয় লোকদের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, স্বজনপ্রীতি মানুষের সহজাত স্বভাব। তাই আল্লাহ পাক যুগে যুগে মানুষকে জীবনের সুন্দর ও সঠিক পথটি বাৎলানোর জন্য আসমানী পথনির্দেশিকা দিয়ে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) ছিলেন এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ রাসূল। তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী বা রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না। আসার প্রয়োজন নেই। কারণ তার মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা বিধান করা হয়।

---

২ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং ৩৩৩১; আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম* ৬০/১৪৬৮; মুসলিমের বর্ণনায় খাইরান অর্থাৎ কল্যাণকামী হও উক্তিটি অতিরিক্ত আছে।

৩ আল-কুরআ'ন - ২ : ৩৮

৪ আল-কুরআ'ন - ৫ : ৪৮

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত কললাম।'[৫]

এই দ্বীনের লিখিত রূপ হল কুরআ'ন মাজীদ। আর নবী করিম (সা) কুরআ'ন মজীদের বিধিবিধান বাস্তবায়নের যে কর্মপন্থা অনুসরণ ও নির্দেশ করেছেন তা হাদীস বা সুন্নাহ হিসেবে পরিচিত। এ দুইয়ের সমন্বয় হল ইসলাম। নবীজি বলেন,

عن مالك بن انس مرسلا قال قال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

'আমি তোমদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দুটিকে আঁকড়ে ধরবে ততদিন তোমরা পথহারা হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ।'[৬]

সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও এই হাদীস মুসলিম উম্মাহর সর্বত্র প্রসিদ্ধ ও বাস্তবতার সাথে পূর্ণ সঙ্গতিশীল। তবে এর ব্যাখ্যায় একটি শ্রেণি এমন বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেন যে, কুরআ'ন ও হাদীস ব্যতীত অন্যকিছু চর্চা করা বুঝি ইসলাম সম্মত নয়। অথচ নবী করিম (সা) এর সময়েই কোনো কোনো আরব গোত্র যখন তাদের কবিদের দিয়ে গোত্রীয় প্রশংসাকীর্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে ইসলামের মোকাবিলা করে বা জাহেলী যুগের কোনো কোনো কবি নবী করিম (সা) কে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করে তার জবাব দানের জন্য নবী করিম (সা) হযরত হাসসান ইবনে সাবেতকে নির্দেশ দেন। তাতে প্রমাণিত হয় কুরআ'ন হাদীসের বাইরে সাহিত্য চর্চার জন্য নবী করিম (সা) নিজেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অনুরূপভাবে কুরআ'ন হাদীসের নির্দেশাবলীকে জীবন যাত্রায় বাস্তবায়নের জন্য ফিকহশাস্ত্র ও মাযহাবের শরণাপন্ন হওয়াকেও এই শ্রেণীটি ইসলাম বহির্ভূত তৎপরতা বলে নানা সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ ইসলামের ঐতিহ্যে লালিত ফিকহশাস্ত্র বাদ দিলে কুরআ'ন হাদীসের বিধি-বিধান পালন করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো জীবনের সাথে সম্পর্কহীন নিছক ধর্মকর্মে পরিণত হয়ে পড়বে।

নবী করিম (সা) যতদিন দুনিয়ার জীবনে ছিলেন সাহাবাগণ তার কাছ থেকে শুনে বা যাপিত জীবন দেখে নিজের জীবন পরিচালনা করতেন। কিন্তু তিনি বিদায় হওয়ার পর এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে সম্মিলিত সিদ্ধান্তের আলোকে পদক্ষেপ নিতে হয়। সাহাবায়ে কেরামের এই সম্মিলিত মত ইজমা হিসেবে কুরআ'ন হাদীসের পর ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎসের মর্যাদা লাভ করে। এর দুটি উদাহরণ হল, নবীজির ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হওয়া এবং

---

৫ আল-কুরআ'ন - ৫ : ৪

৬. ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, *মুয়াত্তা ইমাম মালেক হাদীস নং ৩৩৩৮ এর বরাতে* ***মিশকাতুল মাসাবীহ,*** আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খ্রি., বাবুল এ'তেসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর আমলে কুরআ'ন মজীদের একক সংকলন আর হযরত উসমান (রা) এর উদ্যোগে কুরআনের একটিমাত্র কপি রেখে বাকী কপিগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

কুরআ'ন, হাদীস, ইজমার পর ইসলামী আইনের চতুর্থ মূলনীতির নাম কিয়াস। এই কিয়াসের অনুমতিও দিয়েছেন স্বয়ং নবী করিম (সা)। ইয়ামেনে গভর্ণর করে পাঠানোর সময় হযরত মু'আয ইবনে জাবল (রা)-কে নবী করিম (সা) যে নির্দেশনা দেন তার মধ্যে কিয়াস এর মূলনীতি নিহিত রয়েছে। আমরা এখানে হাদীসের ভাষ্যটি সামনে আনতে চাই।

'হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) যখন মু'আয বিন জাবাল (রা) কে ইয়ামেনে গভর্ণরের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন তখন মু'আয (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন-'যখন তোমার কাছে বিচারের ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সাল করবে? তখন তিনি বললেন-আমি ফায়সালা করব কিতাবুল্লাহ (কুরআ'ন) দ্বারা। রাসূল (সা) বললেন-যদি কিতাবুল্লাহতে সমাধান না পাও? তিনি বললেন-তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব। রাসূল (সা) বললেন-যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতেও না পাও? তখন তিনি বললেন-তাহলে আমি ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত দেয়ার চেষ্টা করব এবং এ ব্যাপারে কোনো অলসতা করব না। মু'আয বলেন, তখন রাসূল (সা) তাঁর বুকে চাপড় মেরে বললেন-যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট।'[৭]

প্রকৃত বাস্তবতা হল ইসলাম আরবের বাইরে বিশ্বের নতুন নতুন সমাজে বিস্তার লাভ করলে এসব বিষয়ে সমাধান তথা ধর্মীয়, সামাজিক, ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রিক নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে উঠে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধীর শাস্তি, উত্তরাধিকারী সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা যে কোনো সমাজ ও সভ্যতার অনিবার্য অনুষঙ্গ। এর অভাবে সমাজ জীবনে যে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে জীবন ও সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের জন্য শরী'আর সিদ্ধান্ত জানা ও সুবিন্যস্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ইসলামের পুরোধা ব্যক্তিবর্গ বা ইমামগণ। কুরআ'ন ও হাদীসের শিক্ষা ও বিধান চয়ন করে জীবন ও সমাজ পরিচালনার যে নীতিমালা তারা নির্দেশ করেন তা ফিকহশাস্ত্র নামে খ্যাতি লাভ করে। যুগশ্রেষ্ঠ ফিকহশাস্ত্রবিদদের মধ্যে যাদের অনুসিদ্ধান্ত, মতামত ও পথ নির্দেশিকা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির দ্বারা আচরিত হয় তা পরবর্তীতে মাযহাব বা পথচলার নির্দেশিকা নামে আখ্যায়িত হয়। কালক্রমে চারজন ইমামের প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও অনুসিদ্ধান্তসমূহ ইসলাম সম্মত বলে গোটা উম্মাহর মাঝে সমাদৃত হয়। চারজন ইমাম হলেন ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ও ইমাম মালেক (র)।

প্রশ্ন হল, কুরআ'ন ও হাদীসের অনুসরণ বা সামগ্রিক অর্থে ইসলামী শরীয়াহ পরিপালনের জন্য উল্লেখিত মাযহাবসমূহ মেনে চলা আবশ্যক কিনা? আবশ্যক হলে তার গুরুত্ব কতখানি? ইদানিং মাযহাব অস্বীকারের একটি মতবাদ জোরেশোরে প্রচারিত হচ্ছে। অথচ ইতিহাসের বাস্তবতা ও জীবন বৈচিত্রকে সামনে রাখলে মুসলিম জাতির ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে পরিচালনার সুষ্ঠু ও সুন্দর নীতিমালার জন্য মাযহাব ছাড়া বিকল্প

---

৭ সূনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৫৯৪, সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-১৩২৭, সুনানে দারেমী, হাদিস নং-১৬৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২২০৬১।

পথ নেই। মাযহাবের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করা হলে আমাদের নামায দু'আয়ও নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকবে না। কুরআ'ন হাদীসের ব্যাখ্যায় স্বেচ্ছাচরিতা দেখা দেবে। পরিণতিতে ধর্মীয় উগ্রবাদ সৃষ্টি হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ও সারা বিশ্বে যে ধর্মীয় উগ্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে তার বিচিত্র প্রকাশ আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। ইসলামে জিহাদ বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লড়াই করা মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। কুরআ'ন ও হাদীসে জিহাদ ও জিহাদে আত্মত্যাগ করে শহীদ হওয়ার অতুলনীয় মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। তবে এই জিহাদ কখন পরিচালনা করতে হবে, কীভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং জিহাদের ময়দানে ও পরবর্তীতে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে, তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বিভিন্ন মাযহাবে। কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী এসব বিষয়ে মাযহাবী ব্যাখ্যা বা শৃঙ্খলা মানতে রাজি নয়, তারা মাযহাবী ব্যাখ্যার বাইরে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যা পরিণামে মুসলিম সমাজে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থার বিস্তার করছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে যতগুলো সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে অধিকাংশের পেছনে এমন একটি গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে, যারা মাযহাব মানে না। নিজেদেরকে হাদীস-ওয়ালা, কুরআ'ন -ওয়ালা হিসেবে দাবি করে।

এই সমস্যা আমাদের দেশে যেমন আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তেমনি সমগ্র বিশ্বে এর ভয়াবহ বিস্তার ঘটেছে। এর মূলে রয়েছে মাযহাবকে অস্বীকার করা এবং কুরআ'ন হাদীস ও ধর্মীয় বিধানের মনগড়া ব্যাখ্যা। তারা নিজের মতের বিরুদ্ধে হলে যে কাউকে গোমরাহ বা বিভ্রান্ত আখ্যা দেয়; এমনকি হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কোনো হাদীসের বাণী তাদের মতের পরিপন্থী মনে হলে ঐ হাদীসকে দুর্বল, জাল প্রভৃতি আখ্যা দেয়; কিংবা নিজস্ব মতের সমর্থনসূচক কুরআ'ন -হাদীসের উক্তিসমূহের উগ্রবাদী অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের বক্তব্য হল, ধর্মের মৌল শিক্ষার মধ্যে সবাইকে ফিরে আসতে হবে। কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয়া যাবে না। মাযহাব ধর্মের মৌলিকত্ব থেকে দূরে নিয়ে যায়। বক্তব্যটি আপাত আকর্ষণীয় বিধায় তরুণ সমাজ সেদিকে ঝুঁকছে। এর পরিণতিতে আমাদের ধর্মীয় জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এতকাল যে নিয়মে মনের আবেগ ও আকুতি মিশিয়ে ইবাদত বন্দেগী করত তাতে সন্দেহ সংশয় প্রবেশ করতে শুরু করেছে।

বিষয়টির গুরুত্ব ও ভয়াবহতা নিরূপণের সুবিধার্থে একটি বাস্তব ঘটনা উপস্থাপন করতে চাই। আমাদের বাসায় আমেরিকা প্রবাসী আমার ভাইয়ের এক বন্ধু আসেন। তিনি আমার আব্বার কাছে জানতে চান, চাচাজান! আমি তো জীবনে অনেক নামায কাযা করেছি। এই নামাযের তো কাফফারা নেই এবং আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কেন কীভাবে আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তিনি একটি সংগঠনের ধর্মীয় দর্শনের কথা বললেন। আমেরিকায় একটি মুসলিম সংস্থার নাম নর্থ আমেরিকা মুসলিম স্যোসাইটি। বছরে একবার সম্মেলন হয়। সোসাইটির নেতারা বলেছেন যে, কেউ যদি নামায তরক করে সে কাফের হয়ে যাবে। আমরা যে মাঝেমধ্যে ইচ্ছাকৃত নামায পড়িনি; তাতে আমাদের ঈমান চলে গেছে। সোসাইটিতে এসে আবার যখন ইমান ও আমল শুরু করেছি। তাতে যেন আমরা নতুন করে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। তিনি আরো জানালেন, নামায না পড়লে ঈমান চলে যাওয়ার পক্ষে দলিল হল হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করল সে কুফরি করল। অর্থাৎ কাফের হয়ে গেল। তাকে বলা হল, কুফরি করা আর কাফের হয়ে যাওয়ার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। এতদিনকার পাপ মোচন হওয়ার ব্যাপারে তিনি বললেন, হাদীসে নাকি আছে, কেউ ইসলাম গ্রহণের পর তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাকে বলা হল, যারা ইচ্ছাকৃত

কুফরি করে সে তো মুরতাদ হয়ে যায়। মুরতাদের শাস্তি কী হবে তা কি তথাকথিত ঐসব মুসলিম নেতারা বলেছেন? এই ঘটনা থেকে বুঝা গেল, যারা মাযহাব মানে না, নিজেদেরকে কুরআ'ন হাদীসের পণ্ডিত মনে করে ফতোয়া দেয় তারা এভাবে সমাজকে বিভ্রান্ত করে এবং করছে।

কাজেই পবিত্র ইসলামের মৌলিকত্ব রক্ষা এবং ধর্মীয় অরাজকতা থেকে মুসলিম ইম্মাহর আত্মরক্ষা ও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনে চিন্তা ও আদর্শের হাতিয়ার দিয়ে উগ্রবাদের মোকাবিলা করতে হলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত ধর্ম ইসলামের শতশত বছরের ঐতিহ্যকে লালন করতে হবে। মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নতুনভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। কুরআ'ন হাদীসের উগ্রবাদী ব্যাখ্যা রোধ করতে হবে। নচেত শান্তি ও সম্প্রীতির ছায়াতলে সভ্যতার বিকাশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে আমি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছি এবং একটি যৌক্তিক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য সমাধান পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি।

আমার প্রত্যাশা আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে দেশ, জাতি ও উম্মাহর কল্যাণ সাধনের পক্ষে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা দান করবেন।

১ম অধ্যায়

মানব সভ্যতায় শরী'আ ও মাযহাব

মানব সমাজে আসমানী নির্দেশনার গুরুত্ব

পৃথিবী নামক এই গ্রহে মানব জাতির বসতি গড়ে উঠেছে একজন মানব ও একজন মানবীকে কেন্দ্র করে। তারা হলেন আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ)। সৃষ্টির পর তারা উভয়ে চিরশান্তির চিরন্তন কানন জান্নাতে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে উভয়ে পৃথিবীতে চলে আসতে বাধ্য হন। এরপর তাদের বংশ বিস্তার হলে মানব জাতির বসতি গড়ে উঠে। সমাজ ও সভ্যতার গোড়া পত্তন হয়। পৃথিবীতে মানুষ যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য যুগে যুগে পথের দিশারী মহাপুরুষ নবী-রাসূল (আ)-ও পথের দিশা হেদায়ত বা শরী'আ প্রেরণ করা হয়। কুরআ'ন মজীদে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান (জান্নাত) হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে (সৎপথের কোনো নির্দেশ) আসবে তখন যারা আমার হেদায়ত অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[৮]

কুরআ'ন মজীদের এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীই মানব জাতির বসতির স্থান। এখানে বসবাস করতে হলে হেদায়ত বা সৎপথের চলার নির্দেশনা থাকতে হবে। আর এই হেদায়ত আসতে হবে আল্লাহর পক্ষ হতে। যারা এই হেদায়ত অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। এর কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব।

সমাজবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ বসবাসের জন্য একে অপরের মুখাপেক্ষী। জীবন যাপনের জন্য যাকিছু দরকার তার সবকিছু মানুষের একার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। পরিধানের কাপড়ের জন্য যারা কাপড় বুনে বা সিলাই করে তাদের মুখাপেক্ষী আমরা প্রত্যেকে। আবার পরনের জুতা স্যান্ডলের জন্য মুচির কাছে অবশ্যই যেতে হবে। চুলদাড়ি কাটার জন্য নাপিতের শরণাপন্ন না হয়ে কেউ পারবে না। অনুরূপ খাদ্যের জন্য চাষীদের কাছে আমরা ঋণী। অসুখ হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কারো উপায় নেই। বস্তুত সমাজে একত্রে বসবাস করতে গিয়ে আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। এই মুখাপেক্ষিতাই আমাদেরকে পারস্পরিক মিলমিশ, লেনদেন, অধিকার, দায়দায়িত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে বাধ্য করে। এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও ন্যায় ইনসাফ বহাল রাখার জন্য যেভাবে কোনো দিশারীর প্রয়োজন ছিল সেভাবে পথের দিশা বা হেদায়াতেরও প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়াতে

৮ আল-কুরআ'ন - ২ : ৩৮

পাঠানোর শুরুতে সেই 'হুদা' বা হেদায়াত তথা নির্দেশনার ঘোষনা দিয়েছেন। বলেছেন, আমি তোমাদেরকে যে পথচলার নির্দেশনা দিচ্ছি তা যদি মেনে চল তাহলে পথহারা হবে না, তোমোদের ইহ জীবন পরিচলানায় কোনো জটিলতা থাকবে না, ভয় পেতে হবে না এবং এই পথ অনুসরণ করে তোমাদের অনুতাপ অনুশোচনা করতে হবে না।

সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষায় যুগে যুগে আসমানী পথনির্দেশ

উল্লেখিত আসমানী হেদায়ত শুধু আদিমানব হযরত আদম (আ)-এর জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দিন যত অতিবাহিত হয়েছে ও অবস্থা উত্তরোত্তর জটিল হয়েছে আসমানী হেদায়তের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রতর হয়েছে। স্থান কাল ও অবস্থা ভেদে এই হেদায়তের ধরনও ভিন্নভিন্ন ছিল। এগুলো তখন শিরআতাওঁ বা শরী'আ এবং মিনহাজা নামে পরিচিত হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

'আমি তো আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যবূর দিয়েছিলাম।'[৯]

আসমানী পথনির্দেশের বিষয়বস্তু

যুগে যুগে যে শরী'আ ও পথনির্দেশ আল্লাহর পক্ষ হতে মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তার মূল প্রতিপাদ্য ছিল কয়েকটি (১) আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বে বিশ্বাস ও একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। (২) তাগুত বা আল্লাহদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার করা। (৩) সৎকর্ম সম্পাদন ও তাতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা। (৪) আল্লাহর বিধিবিধান বা দ্বীনকে কায়েম করা এবং (৫) ঐক্যবদ্ধ থাকা ও অনৈক্য পরিহার করা।

নিম্নোক্ত দুটি আয়াতে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে[১০] বর্জন কর।[১১]

---

৯ আল-কুরআ'ন - ৪ : ১৬৩

১০ তাগূতের আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী, দুস্কৃতির মূল বস্তু, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান, কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ 'তাগূত' এর অন্তর্ভুক্ত। (দ্রষ্টব্য সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৬ এর টীকা, *আল কুরআ'নুল কারীম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১১ আল-কুরআ'ন - ১৬ : ৩৬

সৎকাজ সম্পাদন এবং সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করাও মানব সমাজে নবী-রাসূল (আ) ও শরী'আপ্রেরণের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আ (বিধিবিধান) ও সরলপথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে একজাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তদ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।'[১২]

দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, অনৈক্য পরিহারের নির্দেশনা

প্রত্যেক যুগের পয়গাম্বরদের জন্য সে যুগের মানুষ, স্থান ও কালের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন শরী'আ বা পথচলার নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়। এ কারণে তাদের শরী'আর মূলনীতি অভিন্ন হলেও শাখা ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে পরস্পর থেকে ভিন্ন ছিল। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি শরী'আর অন্যতম মূলনীতি বা প্রতিপাদ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে কায়েম করা এবং অনৈক্য ও হানাহানি বর্জন করা। ইরশাদ হয়েছে-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনকে বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে কায়েম কর এবং তাতে মতভেদ করো না।'[১৩]

হযরত নূহ (আ)-এর শরী'আ

আদম (আ)-এর পর নূহ (আ)-এর শরী'আ ছিল অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ। তার শরী'আর মূল বিষয় সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে হযরত ইমাম বাকের সূত্রে। তিনি বলেন,

كانت شريعة نوح عليه السّلام ان يعبد الله بالتوحيد والاخلاص وخلع الانداد وهى الفطره التى فطر الناس عليها واخذ الله ميثاقه على نوح وعلى النبيين عليه السّلام ان يعبدوا الله تبارک و تعالى ولا يشركوا به شيئا وامر بالصلاه والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والحلال والحرام ولم يفرض عليه احكام حدود ولا فرض مواريث فهذه شريعته...

---

১২ আল-কুরআ'ন - ৫ : ৪৮

১৩ আল-কুরআ'ন - ৪২ : ১৩

নূহ (আ)-এর শরী'আ ছিল আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহরই ইবাদত করা। তার প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া। তার সাথে কোনোরূপ শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকা। এটিই হল প্রকৃতির ধর্ম, এর উপরই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ নূহ (আ) ও অন্যান্য নবীগণের (আ) কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। তাকে নামাযের নির্দেশ দেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের হুকুম নাযিল করেন। আর হালাল ও হারাম স্পষ্ট করে দেন। তার উপর দন্ডবিধি জাতীয় কোনো হুকুম নাযিল করেন নি। উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের কোনো বিধানও দেয়া হয়নি। এটিই ছিল নূহ (আ)-এর শরী'আ।[১৪]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরী'আ

ইবরাহীম (আ)-এর শরী'আ সম্পর্কেও বেশি কিছু জানা যায় না। যতদূর জানা যায়, ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি প্রেরিত কিতাব বা সহিফা ছিল ২০টি। বর্তমান সময়ে সেগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত। কুরআ'ন মজীদে এসব সহিফার কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ আছে। (সূরা 'আলা, আয়াত-১৯) এগুলোর অধিকাংশই নানা উপমা ও উপদেশমূলক। হযরত আবু যর (রা) সূত্রে একটি রেওয়ায়াতে জানা যায়, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের কাছে প্রেরিত কিতাবের সংখ্যা একশ চব্বিশটি। আবু যর (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর কাছে সুহুফে ইবরাহীম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে নবীজি বলেন, পুরোটাই হচ্ছে নানা উপমা ও উপদেশমালা।[১৫]

কুরআ'ন মজীদে ইরশাদ হয়েছে-

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

'তাকে কি অবগত করা হয় নাই, যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। তা এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। আর এই যে, মানুষ তাহাই পায়, যা সে চেষ্টা করে, আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে– অতপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান, আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট।[১৬]

একইভাবে সূরা আ'লার শেষাংশে বলা হয়েছে, পরকালই যে উত্তম ও স্থায়ী তা ইবরাহীম ও মূসার সহিফার মধ্যে লেখা আছে।

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

১৪ আব্দুর রহমান খাযেনী, *মীযানুল হিকমত*, মাতবা দায়েরাতুল মাআরিফুল উসমানিয়া, হায়দারবাদ, ভারত, ১৯৩৯ ৪খ. পৃ. ৪০৫

১৫ সৈয়দ আব্দুল হুসাইন আত তাইয়্যেব, *আতয়াবুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআ'ন* , মুদ্রণে, বুনিযাদে ফারহাঙ্গে ইসলামী, তেহরান, ইরান, ১৪১৭ হিজরি, ১খ, পৃ-২৫০

১৬ আল-কুরআ'ন - ৩৬-৪২

'এটি তো লিপিবদ্ধ আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে–ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।'[১৭]

কুরআ'ন মজীদের বর্ণনা ও রেওয়ায়াতসূত্রে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানব ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ই সমাজ পরিচালনার বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ব্যতিরেকে ছিল না। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর যমানাও এই নিয়মের বাইরে ছিল না। প্রত্যেক যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের বিষয়টি সামনে রেখে আল্লাহ পাক সে যুগের উপযোগী শরী'আ বা পথচলার নির্দেশিকা প্রদান করেন।

হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আ

হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কুরআ'ন মজীদে বিশদ বিবরণ রয়েছে। যেমন মূসা (আ)-এর নাম কুরআ'ন মজীদে ১২৯ বার এবং তার স্বজাতি বনি ইসরাঈল পরিভাষাটি ৪১ বার উল্লেখিত হয়েছে। এসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদের জন্য প্রেরিত ইঞ্জিল কিতাব এবং আল্লাহর বিধানসমূহ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। মূসা (আ) ও বনি ইসরাঈল জাতির যে ঘটনাবলীর বর্ণনা কুরআ'ন মজীদে পাওয়া যায়, তাতে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের খেসারত কত নির্মমভাবে দিতে হয়েছে তার বিবরণ বিদ্যমান। তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব প্রেরণ এবং নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের বিবরণ সম্বলিত একটি আয়াত হচ্ছে–

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

'আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর। আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দ্বীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করেছিল। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন।'[১৮]

আল্লাহর নির্দেশিত শরী'আলঙ্ঘনের কারণে মূসা (আ)-এর জাতি তথা বনী ইসরাঈল কীভাবে আল্লাহর গযবের কোপানলে পড়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে কুরআ'ন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

---

১৭ আল-কুরআ'ন - ৮৭ : ১৮-১৯। গ্রন্থ মানে সুহুফ। সুহুফ এর একবচন সহিফা। এর শাব্দিক অর্থ লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠাসমূহ, গ্রন্থ অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়। লিসানুল আরাব। (সূত্র, আল কুরআ'নুল করিম, ইফা, সূরা ৮০ এর আয়াত ১৩ এর টীকা।)

১৮ আল-কুরআ'ন - ৪৫ : ১৬-১৭

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

'তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্রগ্রস্ত হল এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াত (বিধান ও নিদর্শন)–কে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করবার জন্য তাদের এই পরিণতি হয়েছিল।'[১৯]

হযরত ঈসা (আ)-এর যমানায় শরী'আ

হযরত মূসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কাছে নবী হিসেবে প্রেরিত হন হযরত ঈসা (আ)। কুরআ'ন মজীদে বহু স্থানে ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ সম্মানের সাথে আলোচিত হয়েছে। বনী ইসরাঈল বংশের হেদায়তের জন্য তার উপর ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয়। ইঞ্জিল কিতাবের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'মুক্তির একমাত্র পথ ভালোবাসা। কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নয়।' তবে বর্তমান যুগে মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের অস্তিত্ব নেই। এ দুটি কিতাব বাইবেল হিসেবে সংকলিত। বাইবেলের দুটি অংশের প্রথম অংশ ওল্ড-টেস্টামেন্ট বা পুরাতন নিয়মে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তাওরাত ও আগেকার নবীদের প্রতি প্রেরিত বাণী। দ্বিতীয় অংশে নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়মে রয়েছে ইঞ্জিল বা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে প্রেরিত বাণী। একথাও সত্য যে, মানব জীবনের প্রতিটি পর্বের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান বাইবেলে অনুপস্থিত। তাছাড়া এই দুটি গ্রন্থই বর্তমানে পুরোপুরি বিকৃতির শিকার, যে কারণে বাইবেলকে হুবহু ইশ্বরের বাণী রূপে দাবি করলে তা যুক্তিতে প্রমাণিত হবে না।

বিশ্বনবী (সা)-এর শরী'আ

সৃষ্টির শুরু থেকে যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়ত বা সঠিক পথে পরিচালনার নির্দেশিকার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ এসেছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর শরী'আ। যার অপর নাম ইসলাম। এই মর্মে কুরআ'ন মজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং আপনি তার অনুসরণ করুন, অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না।'[২০]

মহানবী (সা)-কে যে শরী'আ দেয়া হয় তা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলগণকে দেয়া শরী'আর সর্বশেষ সংস্করণ। অন্যদিকে মানব জীবনের সকল দিক-বিভাগ পরিচালনার যাবতীয় দিক- নির্দেশনা ও হেদায়ত দেয়া হয়েছে নবীজিকে দেয়া শরী'আর মধ্যে। ইরশাদ হয়েছে-

---

১৯ আল-কুরআ'ন - ২ : ৬১

২০ আল-কুরআ'ন - ৪৫ : ২০

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।'

পূর্বেকার নবী-রাসূলগণ এসছিলেন একেকটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠি বা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য; কিন্তু নবীজিকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

'আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।'[২১]

নবী করিম (সা)-এর শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল ছাড়াও ৪০ বছর বয়সে নবুয়াত লাভের পর ১৩ বছর মক্কী ও ১০ বছর মাদানী জীবনের সামগ্রিক চিত্র সামনে রাখলে যে কোনো সমাজতাত্ত্বিকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই শরী'আ মক্কা মদীনা কিংবা আরব আজম অথবা নির্দিষ্ট শতাব্দি বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানের সব মানুষের জন্য সর্বোন্নত পথের দিশা। তাতে রয়েছে মানব জগতের অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের কর্মপন্থা ও ভবিষ্যতের সুন্দর জীবনচিত্রের রূপরেখা। হযরত আলী (রা)-এর একটি হাদীস থেকে নবীজিকে দেয়া শরী'আর এই চিত্রটি অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে ফুটে ওঠে।

عن الحارث قال مررت فى المسجد فإذا الناس يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا فى الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حَبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم

'তাবেয়ী হারেস আওয়ার (র) বলেন, আমি কুফার মসজিদে পৌঁছে দেখলাম, লোকেরা বাজে কথায় মশগুল। অতঃপর আমি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি

২১ আল-কুরআ'ন - ২১ : ১০৭

জানেন না, লোকেরা গল্পগুজবে মশগুল হয়েছে। তিনি বললেন, তারা কি এরূপ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শোনো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! শীঘ্রই দুনিয়াতে ফ্যাসাদ (বিপর্যয়) আরম্ভ হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ তা থেকে বাঁচবার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব। তাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের খবরাখবর রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যকার বিতর্কের মীমাংসা। তা সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী এবং নিরর্থক নয়। যে অহংকারী একে ত্যাগ করবে আল্লাহ তার অহংকার চূর্ণ করবেন; যে এর বাইরে হেদায়ত তালাশ করবে আল্লাহ তাকে গোমরাহ করবেন। এটি হচ্ছে আল্লাহর মজবুত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় জিকির এবং সত্য সরল পথ...।' [২২]

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে যে শরী'আ বা জীবন চলার পথ নির্দেশিকা দেয়া হয় তার মূল গ্রন্থ হচ্ছে আল কুরআ'ন । আল কুরআ'ন মানব জাতির পথ চলার চূড়ান্ত সংবিধান। এই মহাগ্রন্থ থেকে জীবন চলার দিক নির্দেশনা পেতে হলে কুরআ'ন গবেষণার কেন প্রয়োজন এবং তা একটি শৃঙ্খলার মধ্যে মাযহাবের আঙ্গিকে কেন হতে হবে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

২২ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, *তিরমিযির বরাতে* ***মিশকাতুল মাসাবীহ***, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫, হাদীস নং ২০৩৫।

২য় অধ্যায়

কুরআ'ন মাজীদ মানব জাতির হেদায়তের আলোকবর্তিকা

সভ্যতা নির্মাণে কুরআ'ন মাজীদ

পবিত্র কুরআ'ন মাজীদ নিঃসন্দেহে আল্লাহর তা'আলার কথা বা পবিত্র বাণী। তার ভাবার্থ ও ভাষা দু'টোই মহামহিম আল্লাহ তা'আলার। কুরআনের আগাগোড়া, শুরু থেকে শেষ, 'বিসমিল্লাহ'র 'বা' থেকে 'ওয়ান্নাস'-এর 'সিন' পর্যন্ত প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও অক্ষর আল্লাহর সম্মানিত ফেরেশতা নিয়ে এসেছেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর কাছে। আজ দেড় হাজার বছর পরও সেই অবিকল কুরআ'ন মাজীদ আমাদের মাঝে বিরাজমান। এটি আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শন। কুরআ'ন মাজীদ লওহে মাহফুয থেকে কীভাবে নাযিল হল সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

'কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে। অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।'[২৩]

এই আয়াতে আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভের তিনটি ধরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হল, ওহীর মাধ্যমে, দ্বিতীয়টি পর্দার অন্তরাল থেকে; তৃতীয় হল, কোনো রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে।

প্রথম ধরন অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত নবী কারীম (সা)-এর খেদমতে যেভাবে ওহী নিয়ে আসতেন তার কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নরূপ-

ঘন্টার আওয়াজের মত একটানা

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِيْنِى مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيُفْصَمُ عَنِّى وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ .

'হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার হযরত হারিস ইবনে হিশাম হযরত নবী কারীম (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট ওহী কীভাবে আসে? হুযুর (সা) জবাব দিলেন কোনো কোনো

২৩ আল-কুরআ'ন - ৪২ : ৫১-৫২

সময় আমি ঘন্টার আওয়াজের মত শুনি। ওহী নাযিলের এ অবস্থাটা আমার কাছে খুব কঠিন প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমাকে যা কিছু বলা হয়, সে সবই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়।'[২৪]

আওয়াজ সহকারে ওহী নাযিল হওয়ার সময় তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অত্যন্ত কঠিন অনুভূত হত। উক্ত হাদীসের শেষভাগে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, শীতের দিনেও আমি হুযুর (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলে পর প্রচন্ড শীতের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ললাটদেশ সম্পূর্ণরূপে ঘর্মাক্ত হয়ে যেত।

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

'হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তীব্র শীতের দিন তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ওহী নাযিল হতে দেখেছি। যখন নাযিল শেষ হত, তখন কঠিন শীতের সময়ও তাঁর পবিত্র ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে যেত।'[২৫]

একবার হুযুর (সা) সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর কোলে মাথা মোবারক রেখে একটু আরাম করছিলেন। এ অবস্থায়ই ওহী নাযিল শুরু হল। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, তখন তার উরুদেশে এমন চাপ অনুভূত হচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল তার উরুর হাড় বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।[২৬]

মানুষের বেশে ফেরেশতার আগমন

ওহী নাযিল হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল, ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ) মানুষের বেশে আগমন করে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পয়গাম পৌঁছে দিতেন। এ অবস্থায় হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে সাধারণত প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দেহিয়া ক্বালবী (রা)-র আকৃতিতে দেখা যেত। কোনো কোনো সময় তিনি অন্য লোকের আকৃতি ধারণ করেও আসতেন। ওহী ছাড়াও দ্বীনের অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ বিধান জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজনেও ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ) অন্য মানুষের বেশ ধারন করে আসতেন। হাদীসে জিবরাঈল নামে প্রসিদ্ধ হাদীসটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ .

'আর কখনো কখনো ফেরেশতা আমার সামনে মানুষের আকৃতিতে হাযির হন। অতঃপর আমাকে যে ওহী বলেন তা সাথে সাথেই আয়ত্ত করে ফেলি।'

---

২৪ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, বদউল ওয়াহী, হাদীস নং ২

২৫ প্রাগুক্ত

২৬ মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে কাইয়েম জাওযিয়া, *যাদুল মাআদ ফী হাদয়ে খাইরিল ইবাদ,* মুআসসেসা আর রিসালা, ১৯৯৮, ১খ. পৃ. ১৮, ১৯

মানুষের বেশে হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর আগমন এবং ওহী পৌঁছে দেয়ার এ পদ্ধতিটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা সহজ মনে হত বলে তিনি ইরশাদ করেছেন।[২৭]

সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলা

ওহী নাযিলের চতুর্থ পদ্ধতি ছিল কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপ। এই বিশেষ মর্যাদা হুযুর (সা) জাগ্রত অবস্থায় মাত্র একবার মি'রাজের রাতে লাভ করেছিলেন।[২৮]

ওহীর বাণী সরাসরি অন্তরে ঢেলে দেয়া

ওহী নাযিলের পঞ্চম পদ্ধতি ছিল হযরত জিব্রাঈল (আ) হুযুর (সা)-কে দেখা না দিয়ে হুযুর (সা)-এর পবিত্র অন্তরের মধ্যে কোনো কথা দিয়ে দিতেন। পরিভাষায় এ নিয়মটিকে 'নাফাস ফির রূহ' বলা হয়।[২৯]

স্বপ্নযোগে

ওহী নাযিলের আরেকটি ধরন স্বপ্নযোগে। ওহী নাযিলের প্রথম দিক থেকে এ পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে। এমনিতে নবী-রাসূলগণের স্বপ্নও ওহী। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর অনেক প্রত্যাদেশ বা ওহী লাভ করেছেন স্বপ্নের মাধ্যমে। এই স্বপ্নকে বলা হয় সত্য বা বাস্তব স্বপ্ন। তা এমনই স্বপ্ন যা অবাস্তব হয় না বা বিফলে যায় না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স)-এর উপর ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে।[৩০]

কুরআ'ন নাযিলের পর্যায়ক্রম

কুরআ'ন কারীম আল্লাহর কালাম বা কথা। তাই সৃষ্টির সূচনা থেকেই তা 'লওহে মাহফুয' এ সুরক্ষিত আছে।

ঊর্ধ্বজগতের সেই সুরক্ষিত ফলক 'লওহে মাহফুয' হতে দু' পর্যায়ে কুরআ'ন মাজীদ পৃথিবীতে নাযিল হয়।

প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআ'ন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে বাইতুল ইজ্জতে নাযিল করা হয়। বায়তুল ইজ্জতের অপর নাম বাইতুল মা'মূর। এটি কাবা শরীফের বরাবর উপরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে ফেরেশতাদের ইবাদতের স্থান। এখানে পবিত্র কুরআ'ন লাইলাতুল ক্বদর রাতে একইসঙ্গে নাযিল করা হয়েছিল।

---

২৭ জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআ'ন* , ওয়াযারাতুশ শূউনিল ইসলামিয়া ওয়াল ইরশাদিস সাউদিয়া, সৌদী আরব, ২০০৮, ১খ. পৃ. ৮৬

২৮ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৪৬

২৯ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৪৩

৩০ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, বদউল ওয়াহী, হাদীস নং ৩

দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূল (সা)-এর প্রতি ধীরে ধীরে প্রয়োজন মত অল্প অল্প অংশ নাযিল হয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কুরআ'ন নাযিলের এ দু'টি পর্যায়ের কথা খোদ কুরআনের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়।

এ ছাড়া নাসায়ী, বায়হাকী, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এমন কতগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ হচ্ছে, কুরআ'ন মাজীদ একসাথে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এবং পরে ধীরে ধীরে দীর্ঘ ২৩ বছরে হুযুর (সা)-এর উপর নাযিল হয়েছে।[৩১]

মক্কী ও মাদানী সূরা

কুরআ'ন মজীদের সূরাগুলোর মধ্যে কোনোটিতে মক্কী এবং কোনোটিতে মাদানী লেখা রয়েছে। তা দ্বারা কোন কোন সূরা রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় থাকাকালীন এবং কোন কোন সূরা তার মাদানী জীবনে নাযিল হয়েছে তা বুঝানো হয়। আরো স্পষ্ট করে বললে, রাসূল (সা) মক্কা থেকে হিজরতের পূর্বে তেরো বছরের মধ্যে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলো মক্কী। তখন তায়েফ, মেরাজের সফরে বা অন্য কোথাও নাযিল হলেও মক্কী হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর হিজরতের পর দশ বছরের মেয়াদে নাযিল হওয়া সূরাগুলো-মাদানী হিসেবে গণ্য। কাজেই কেউ কেউ যে মক্কী বলতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মাদানী বলতে মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বুঝে থাকেন, সে ধারণা সঠিক নয়।

শানে নুযুল

কুরআ'ন মজীদের আয়াত ও সূরাসমূহ নাযিলের দু'ধরনের প্রেক্ষাপট রয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রেক্ষাপট হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দেশ বা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা উপলক্ষে কোনো কোনো সূরা বা আয়াত নাযিল করেছেন। যেগুলো কোনো বিশেষ ঘটনা বা কারো কোনো প্রশ্নের জবাব প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়নি।

আরেক ধরনের আয়াত ও সূরা আছে, যেগুলো কোনো ঘটনা উপলক্ষে বা কারো কোনো প্রশ্নের জবাব হিসেবে নাযিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা প্রশ্নগুলোকে সেসব আয়াত বা সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট বা তাফসীরের পরিভাষায় 'শানে নুযূল' বা 'আসবাবে নুযূল' বলা হয়।

ওহী ও হাদীসে কুদসি

ওহীর অপর দু'টি প্রকরণকে পরিভাষায় বলা হয় ওহী মাতলূ ও ওহী গাইরে মাতলূ বা ওহীয়ে মারভী। মাতলু মানে তেলাওয়াতকৃত অর্থাৎ কুরআ'ন । এই প্রকারের ওহীর ভাবার্থ ও ভাষা আল্লাহর। দ্বিতীয় প্রকার ওহীর ভাবার্থ বা বক্তব্য আল্লাহর; তবে নবী কারীম (সা) নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। তাকে বলা হয় হাদীসে কুদসী।[৩২]

---

৩১ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৪১

৩২ শায়খ মুহাম্মদ মাদানী, *আল-আহাদীসুল কুদসিয়া*, লাজনাতুল কুরআ'ন ওয়াস সুন্নাহ, মিসর, ২০০১, পৃ. ২১

কুরআ'ন মাজীদ সংকলনের ইতিহাস

কুরআ'ন পাক আল্লাহর নিকট লওহে মাহফুজে এক নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো রয়েছে। সেখান থেকে দীর্ঘ তেইশ বছরে হযরত (সা)-এর উপর প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। যখনই যে আয়াত বা আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, তখন জিব্রাঈল (আ) তা লওহে মাহফুজের ক্রম অনুসারে কোন সূরায় কোন আয়াতের আগে বা পরে বসবে, বলে দিয়েছেন। সে অনুসারে নবী কারীম (সা) তা মুখস্থ করে নিয়েছেন এবং কাতেবানে ওহী (ওহী লেখক) সাহাবীদের দ্বারা হাড়, চামড়া, খেজুরের ঢাল প্রভৃতির ওপর লিখিয়ে নিয়েছেন। তাছাড়া তিনি তা সর্বদা নামাযে পাঠ করেছেন এবং প্রত্যেক রমযানে সে পর্যন্ত কুরআনের যতটুকু নাযিল হয়েছে, তা জিব্রাঈল (আ)-কে পড়ে শোনাতেন। আবার জিব্রাঈল (আ)-ও নবীজিকে পড়ে শুনাতেন। সাহাবীগণও নামাজে পড়ার এবং আল্লাহর কালামকে বুকে ধারণ করে সংরক্ষণ করার জন্য কেউ আংশিক আর কেউ পূর্ণ কুরআ'ন সাথে সাথে হেফয করে নিতেন।

যেভাবে ওহী লিপিবদ্ধ করা হত

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন, আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তাঁর (নবীজির) প্রতি ওহী নাযিল হত তখন তার সারা শরীরে মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চওড়া হাড় অথবা লিখন উপযোগী অন্যকিছু নিয়ে হাযির হতাম। লেখা শেষ করার পর কুরআনের ওজন আমার শরীর পর্যন্ত এমনভাবে অনুভূত হত যে, আমার পা ভেঙ্গে পড়ত। মনে হত আমি যেন চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। লেখা শেষ হলে হুযুর (সা) বলতেন যা লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও। আমি লিখিত অংশ পড়ে শোনাতাম। কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষনাৎ তা শুদ্ধ করে দিতেন। এরপর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অন্যদের সামনে তেলাওয়াত করতেন।[৩৩]

সে যুগে আরবে যেহেতু কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল, এ জন্যে কুরআনের আয়াত প্রধানত পাথর-শিলা, শুকনো চামড়া, খেজুর গাছের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হত। কোনো কোনো সময় কেউ কেউ কাগজের টুকরা ব্যবহার করেছেন বলেও জানা যায়।[৩৪]

আয়াতগুলো যেভাবে সাজানো হত

হযরত উসমান (রা) বলেন, হুযুর (সা) তাঁর প্রতি কোনো আয়াত নাযিল হওয়ার পরপরই ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতটি কোন সূরায় কোন আয়াতের পর বসবে তা বলে দিতেন এবং সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ করা হত।[৩৫]

---

৩৩ হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বকর আল-হায়সামী, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ*, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪/১৯৯৪, ১খ. পৃ. ১৫৮

৩৪ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, দারুল কুতুবিস সালাফিয়া, কায়রো ২০১৫, ১খ. পৃ.১১

৩৫ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল কুতুবিস সালাফিয়া, কায়রো ২০১৫, ১খ. পৃ.১৮

মোটকথা, নবী কারীম (সা) আপন জীবনকালেই সমস্ত কুরআ'ন লিখিয়ে নিয়েছেন এবং কোনো কোনো সাহাবীও নিজস্বভাবে তা লিখে রেখেছেন। তবে হযরতের জীবনকালে অব্যাহতভাবে নাযিল হতে থাকায় সমগ্র কুরআ'ন একত্রিত করে কিতাব আকারে সাজানো সম্ভবপর হয়নি।

একত্রে সংকলনের প্রথম উদ্যোগ

নবী কারীম (সা)-এর ওফাতের পরপরই ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কুরআনের বহু আলেম ও হাফেজ সাহাবী শহীদ হন। অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে হযরত উমর (রা) খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে কুরআ'ন পাকের আয়াতসমূহ 'মাসহাফ' বা কিতাবরূপে সাজাতে অনুরোধ করেন। প্রথম দিকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র) সে প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিলেন না; তিনি ভাবছিলেন, যে কাজ নবী কারীম (সা) নিজে করে যাননি, তা আমি কীভাবে করতে পারি? কিন্তু হযরত উমর (রা)-এর পীড়াপীড়িতে তার শরহে সদর হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ হতে তার হৃদয়ে প্রসারতা আসে এবং বিষয়টির গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেন। সে অনুযায়ী খলিফা আবু বকর (রা) কুরআনের হাফেজ ও ক্বারী সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারীকে তা সাজানোর দায়িত্ব প্রদান করেন।

সংকলিত প্রথম কুরআ'ন যার কাছে সংরক্ষিত ছিল

হযরত যায়েদ (রা) হাড়গোড়ে লিখিত আয়াতকে অন্তত দুইজন সাহাবীর সাক্ষাতে পাঠ ও তাদের সাক্ষাতে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন এবং সাহাবীদের মধ্যে যাদের নিকট যা হেফয বা লিখিত ছিল তার সাথেও মিলিয়ে দেখেন। এভাবে কুরআ'ন পাক লিখিত হওয়ার পর তার খন্ডসমূহ বা সূরাসমূহ পৃথক পৃথক আকারে খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও তারপরে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত থাকে। হযরত ওমরের (রা) শাহাদাত বরণের পর হযরত উমর (রা)-এর কন্যা ও রাসূল (সা)-এর সহধর্মীনী হযরত হাফসার (রা) কাছে রক্ষিত থাকে। সেখান থেকে জনসাধারণ আপন আপন পাঠের জন্য অনুলিপি করতে থাকে। কিন্তু অনুলিপিকালে কেউ কেউ কোনো কোনো শব্দে আপন আপন গোত্রীয় রীতির অনুসরণ করে। অবশ্য এভাবে গোত্রীয় রীতিতে কুরআ'ন পাঠের অনুমতি তাদেরকে হুযুর (সা)-এর যমানায় দেয়া হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন গোত্রে কুরআ'ন পাকের বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত হয়ে পড়ে।

অভিন্ন কুরআ'ন সংকলন

খলিফা হযরত উসমান গণী (রা)–এর খেলাফতের প্রথম দিকে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান যুদ্ধ চলাকালে হেজায ও শামের (সিরিয়া) বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের মধ্যে কুরআ'ন মজীদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখে এবং তার ভবিষ্যত পরিণাম চিন্তা করে দূরদর্শী সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান চিন্তিত হয়ে পড়েন। মদীনায় এসে তিনি কুরআ'ন পাকের একক পাঠে সবাইকে বাধ্য করার জন্য খলিফাকে অনুরোধ করেন। খলিফা উসমান (রা) পঞ্চাশ হাজার সাহাবীকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

অতপর হযরত হাফসার কাছ থেকে কুরআ'ন পাকের সেই আসল কপি তলব করেন এবং তিনজন কুরাইশী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আব্দুর রহমান ইবনে হারেসসহ তার বিভিন্ন অনুলিপি প্রস্তুত

করার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারীকে (রা) দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি কুরাইশী তিনজনকে বলে দেন যে, যখন আপনাদের এবং যায়েদের মধ্যে কোনো শব্দের উচ্চারণ বা বানানে মতভেদ দেখা দিবে তখন আপনারা তা কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা, কুরআ'ন কুরাইশদের ভাষায়, তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে।

মাসহাফে উসমানীর বিবরণ

উপরোক্ত নিয়মে কুরআ'ন পাকের ছয়, কারো মতে সাত কপি অনুলিপি প্রস্তুত হয়। খলিফা এর এক কপি মদীনায় রেখে বাকী কপিসমূহ একটি করে মক্কায়, সিরিয়ায়, ইয়ামেনে, বসরায়, কুফায় আর কারো মতে সপ্তম কপি বাহরাইনে প্রেরণ করেন।[৩৬] এবং এর হুবহু অনুকরণ করতে লোকদের বাধ্য করেন। এ ছাড়া পূর্বের লেখা কুরআনের যে কপি যার নিকট ছিল জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আর হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে নেয়া কপিটি তাকে ফেরত দেন। এভাবে তিনি উম্মতে মুহাম্মদী (স.)- কে কুরআ'ন পাঠে মতভেদ হতে চিরতরে রক্ষা করেন। এ ঘটনা ২৫ হিজরী অর্থাৎ হযরত উসমানের খেলাফত লাভের তৃতীয় ও হুযুর আকরাম (সা)-এর ওফাত লাভের ১৫তম বছরে সংঘটিত হয়।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে কুরআ'ন বিদ্যমান আছে তা সেই মাসহাফে উসমানীরই অবিকল নকল। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উপর যে কুরআ'ন নাযিল হয়েছে অবিকল তা-ই। একটি অক্ষরেরও বেশকম নেই। কুরআ'ন মজীদের অভিন্ন সংকলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বুখারী শরীফের রেওয়াতটি এখানে প্রণিধানযোগ্য।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, হুজাইফা ইবনে ইয়ামান খলীফা হযরত উসমান গণী (রা)-এর নিকট মদীনায় আগমন করলেন। আর তখন তিনি ইরাকীদের সাথী হয়ে আর্মেনিয়া ও আজরবাইজান বিজয় অভিযানে সিরীয় বাহিনীর মধ্যে থেকে যুদ্ধ করছিলেন। তখন সেনাবাহিনীর (সিরীয় ও ইরাকী) লোকদের ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কুরআ'ন পাঠ হযরত হুযাইফাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। হুযাইফা (মদীনায় ফিরে) হযরত উসমানকে বললেন,

হে আমীরুল মু'মেনীন! ইহুদী ও নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বে আপনি এ জাতিকে রক্ষা করুন। সুতরাং হযরত উসমান উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসার নিকট বলে পাঠালেন যে, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের সহীফাসমূহ (খন্ডসমূহ) আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন। আমরা তা বিভিন্ন মাসহাফে (কিতাবে) অনুলিপি করে পুনরায় তা আপনাকে ফিরিয়ে দেব। বিবি হাফসা তা হযরত ওসমানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন আর হযরত উসমান সাহাবী জায়েদ ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে হিশামকে তা লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তারা বিভিন্ন মাসহাফে তার অনুলিপি করলেন। সে সময় হযরত উসমান কুরাইশী তিনজনকে বলে দিলেন, যখন কুরআনের কোনো স্থানে যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হবে তখন আপনারা তা কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা, কুরআ'ন মূলত তাদের বাচন রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তারা সে মতে কাজ করলেন।

---

৩৬ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, দারুল কুতুবিস সালাফিয়া, কায়রো ২০১, ১খ. প্র, ১৭

অবশেষে যখন তারা সমস্ত সহীফা বিভিন্ন মাসহাফে অনুলিপি করলেন তখন হযরত উসমান উক্ত সহীফাসমূহ বিবি হাফসার নিকট ফেরত পাঠালেন এবং তারা যা অনুলিপি করেছিলেন তার এক এক কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। এছাড়া বাদবাকী যে কোনো সহীফায় বা মাসহাফে লেখা কুরআ'নকে জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।[৩৭]

কুরআ'ন হাকীমের লেখকগণ

আল্লাহর নবী (সা) ছিলেন উম্মী। উম্মীর সরল অর্থ নিরক্ষর। প্রচলিত লেখাপড়া তিনি জানতেন না। এর পেছনে আল্লাহর হেকমত ছিল, যিনি জগতবাসীর শিক্ষক হবেন, অন্য মানুষ তার শিক্ষক হতে পারে না। তার শিক্ষক ছিলেন মহান আল্লাহ তা'আলা। তার মাধ্যম ছিল ওহী। হযরতের উপর যখন ওহী নাযিল হত তখন লেখকদের ডেকে সাথে সাথে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। নবীজি (সা)-এর চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র ইত্যাদি লেখানোর জন্যেও শিক্ষিত লোকেরা নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া যাদেরকে বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দূত করে পাঠিয়েছিলেন তারা ঐ সব দেশের ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আল্লামা নোবাইরী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লেখকদের একটি তালিকা দিয়েছেন এভাবে-

আবু বকর সিদ্দিক (রা)

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)

উসমান ইবনে আফফান (রা)

আলী ইবনে আবি তালেব (রা)

আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা)

উবাই ইবনে কা'ব (রা)

সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শামমার (রা)

খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা)

হানযালা ইবনে রাবী' আসাদী (রা)

যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)

শরাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা)।

---

৩৭ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, বুখারীর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ -২১১৭

ইমাম কুরতুবী তার 'আল-'আলাম' কিতাবে লিখেছেন যে, আলা ইবনে হাযরামীও ওহী লেখক ছিলেন। তিনি বলেন, বলা হয়েছে যে, মুয়াবিয়া (রা) ওহী লেখক ছিলেন না। বরং বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত রাসূল (সা)-এর চিঠিগুলো তিনি লিখতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাহও কিছুদিন রাসূল (সা)-এর লেখক ছিলেন। পরে মুরতাদ হয়ে যায়। পুনরায় মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিসেবে জীবন যাপন করেন।

কাযায়ী বলেন, যুবাইর ইবনে আওয়াম ও জাহাম ইবনে সাদও যাকাত ও সাদকার মালামালের তালিকা ও হিসাব তৈরি করতেন। হুযাইফা ইবনে ইয়ামান খেজুর বাগানসমূহের আয়ের হিসাব রাখতেন। মুগীরা ইবনে শোবা ও হুসাইন ইবনে নোমাইর (রা) লেনদেন ও ঋণ ইত্যাদি সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ লিখতেন। হাফেয আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া বলেন, রাসূল (সা)-এর লেখকদের সংখ্যা ২৬ জন পর্যন্ত হতে পারে।'[৩৮]

হযরত উসমান (রা) সংকলিত কুরআ'ন মজীদের মূল মাসহাফে প্রাচীন আরবদের রীতি অনুযায়ী নোকতা (বিন্দু) ও যের-যবর-পেশ ছিল না। সে জন্য অনারবদের পক্ষে এ মাসহাফের তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর ছিল। তাই ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উসমানী মাসহাফে নোকতা ও যের-যবর-পেশ সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করে এবং সময়ের প্রয়োজনে সে পদক্ষেপ নেয়া হয়।

নোকতার প্রচলন

কুরআ'ন করীমের হরফসমূহে সর্ব প্রথম নোকতার প্রচলন কে করেছিলেন সে সম্পর্কিত বর্ণনায় মতভেদ দেখা যায়। কারো কারো মতে এ কাজ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দোয়ালী (রা) আঞ্জাম দেন।[৩৯] অনেকের মতে, আবুল আসওয়াদ দোয়ালী এ কাজ হযরত আলী (রা)-এর নির্দেশে আঞ্জাম দিয়েছিলেন।[৪০]

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত হাসান বসরী (র), হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামা (র) ও হযরত নসর ইবনে আসেম লাইসী (র) -এর দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন।[৪১]

---

৩৮ আন-নুবাইরী, শাহাব উদ্দীন আহমদ, (১২৭৯–১৩৩৩ খ্রি.), **নাহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদব,** ফারসি তরজমা: ড. মাহমূদ মাহদাবী দামেগানী, আমীর কবির প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৬খ্রি. পৃ. ২১০

৩৯ ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ যারকাশী, *আল-বোরহান ফী উলুমিল কুরআ'ন*, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবিয়া, বৈরুত, ১৯৫৭১খ. পৃ. ২৫০

৪০ আবল আব্বাস আহমদ আল কালকাশান্দী, *সুবহুল আশা ফী সানআতিল আশা*, আলকুতুবুল ইসলমিয়া, বৈরুত ২০১২, ৩খ. পৃ. ১৫৫

৪১ *তাফসীর* আল-কুরতুবী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী শামসুদ্দীন আল কুরতুবী (মৃ. ৬৭১) **আল-জামে লি আহকামিল কুরআ'ন ,** দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি. ১খ. পৃ.৩৬

হরকত

হরকত বলা হয় যের-যবর-পেশকে। নোকতার ন্যায় প্রথম অবস্থায় কুরআ'ন শরীফে হরকত বা যের যবর পেশ ইত্যাদি যতিচিহ্ন ছিল না। সর্ব প্রথম কে হরকত-এর প্রবর্তন করলেন–এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে আবুল আসওয়াদ দোয়ালী সর্ব প্রথম হরকত প্রবর্তন করেন। আবার অনেকের অভিমত হচ্ছে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার ও নসর ইবনে 'আসেম লাইসীর দ্বারা এ কাজ করিয়েছিলেন।[৪২]

মনযিল

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের অনেকেই সপ্তাহে অন্তত এক খতম কুরআ'ন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। এ জন্যে তারা দৈনিক তেলাওয়াতের একটি পরিমাণ র্নিধারণ করে নিয়েছিলেন। সে পরিমাণকেই হেযব বা মনযিল বলা হত। এ কারণেই কুরআ'ন শরীফ সাত মনযিলে বিভক্ত হয়েছে।[৪৩]

পারা

কুরআ'ন শরীফ সমান ত্রিশটি খন্ডে বিভক্ত। এ খন্ডগুলোকে পারা বলা হয়। পারা ফারসি শব্দ। এর অর্থ খন্ড বা টুকরা। পারার এ বিভক্তি অর্থ বা বিষয়ববস্তুর ভিত্তিতে নয়। বরং পাঠ করার সুবিধার্থে সমান ত্রিশটি খন্ড করে দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা প্রসঙ্গের মাঝখানেই পারা শেষ হয়ে নতুন পারা আরম্ভ হয়ে গেছে। ত্রিশ পারার বিভক্তি কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল তা নিশ্চিত নয়।[৪৪]

মূলত মাসে একবার কুরআ'ন খতম করার সুবিধার্থে এ ত্রিশ পারার রেওয়াজ চলে আসছে।

রুকু

কুরআনে করীমে রুকু-এর চিহ্ন দ্বারা এতখানি পরিমাণ র্নিদেশ করা হয়েছে যেটুকু সাধারণত নামাযের এক রাকাতে তেলাওয়াত করা যেতে পারে। নামাযে এটুকু তেলাওয়াত করে রুকু করা যেতে পারে এমন বিবেচনা থেকেই বোধ'হয় একে রুকু বলা হয়।[৪৫]

সমগ্র কুরআ'ন শরীফে ৫৪০ টি রুকু রয়েছে। যদি ২০ রাকাত তারাবীহ নামাযে প্রতি রাকাতে এক রুকু করে পাঠ করা হয়, তবে সাতাশে রমযান রাতে কুরআ'ন খতম হয়ে যায়।[৪৬]

এর দ্বারা এই তথ্যের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হয় যে, শুরু থেকে তারাবিহ নামায বিশ রাকাত ছিল।

---

৪২ প্রাগুক্ত

৪৩ ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ যারকাশী, *আল-বোরহান ফী উলুমিল কুরআ'ন* , দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবিয়া, বৈরুত, ১৯৫৭, ১খ. পৃ. ২৫০

৪৪ মুহাম্মদ আব্দুল আযিম যুরকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলুমিল কুরআ'ন আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া*, কায়রো, ২০০৩, ১খ. পৃ. ৪০২

৪৫ আল-উসামানী, মুফতি মুহাম্মদ শফী ইবনে মুহাম্মদ ইয়াসীন আল-উসামানী (১৮৯৭–১৯৭৬), তাফসীরে মাারেফুল কুরআ'ন , বাংলা অনুবাদ: মওলানা মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১খ. পৃ. ৩৫

৪৬ আলমগীরি, ইমাম নিজামুদ্দীন আল বালখী ও একদল শীর্ষস্থানীয় আলেম সম্পাদিত ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি, মাকতাবাতুল কুবরা আল আমিরিয়া, মিশর, ১৩১০ হিজরি, ১খ. পৃ. ৯৪

রুমুযে আওকাফ বা যতিচিহ্ন

শুদ্ধ তেলাওয়াতের সুবিধার্থে আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের যতিচিহ্নের প্রচলন করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া যাবে প্রভৃতি সম্পর্কিত নির্দেশনা জানা যায়। এ চিহ্নগুলোর অধিকাংশ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল।[৪৭]

আয়াত সংখ্যা

কুফীদের গণনা অনুসারে কুরআ'ন মজীদের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। বলা হয় যে, এই হিসাব হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা)-এর দেয়া। বসরী বিশেষজ্ঞদের গণনা অনুযায়ী এই সংখ্যা ৬২৩৪।[৪৮] তবে প্রচলিত একটি মত হচ্ছে কুরআ'ন মজীদের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। এই মতটি কোনো হিসেবেই সঠিক নয় এবং তা কেন প্রচলিত হয়েছিল অনুমাণ করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ হওয়ার মতটিই অগ্রগণ্য।

আয়াতের নাম্বার

কুরআ'ন মজীদের প্রত্যেক আয়াতের শেষে যে ক্রমিক নং মুদ্রণ করা হয় তা অতি সাম্প্রতিককালে প্রচলিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অতি সাম্প্রতিককালেও আয়াতের মাঝখানে নম্বর ছাপা হত না। এ কাজটি কে করেছেন বা কখন থেকে এই নম্বরের প্রচলন হয়েছে, তা এখনো গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি।

কুরআ'ন মজীদের আত্মপরিচয়

পবিত্র কুরআ'ন মজীদের বিভিন্ন আয়াত সামনে আনলে নিজস্ব ভাষাতেই আমরা কুরআনের পরিচয় জানতে পারি। দেখা যাবে, কুরআ'ন নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলছে। অবশ্য এখানে সরাসরি কথা না বললেও আখেরাতে কুরআ'ন সবাক হবে, কথা বলবে। বান্দার পক্ষে আল্লাহর আদালতে সুপারিশ করবে, কিংবা বিপক্ষে নালিশ করবে। আমরা এখানে কুরআনের ভাষায় কুরআনের পরিচয় জানার চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনাবিল আনন্দ আছে।

---

৪৭ ইবনে আল জাযারী, আবুল খায়র মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আদ দেমাশকী আল-জাযারী, (৭৫১–৮৩৩ হিজরি) আন নাশরু ফী কিরাআতিল আশর, আল মাতবাআতুত তিজারিয়া আল কুবরা, কায়রো মিশর, ২০১০, ১খ. পৃ. ২৫৫

৪৮ আবুল ফযল রশীদউদ্দীন মাইবেদী, **তাফসীরে** কাশফুল আসরার, আমীর কবীর প্রকাশনী, তেহরান, ইরান। প্রকাশকাল ১৯৭৮-১৯৮২, ১০খ. পৃ৬৮২

কুরআ'ন মাজীদ নিজের নাম এভাবে ব্যক্ত করেছে:

قٓ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ

'ক্বাফ। শপথ সম্মানিত কুরআনের।'[৪৯]

আরবি ভাষায় কুরআ'ন শব্দের অর্থ পাঠ, পান। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা তার (জিব্‌রাঈলের পাঠের) সাথে সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর তার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।'[৫০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِۚ

'কাজেই কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু পাঠ কর।'[৫১]

উল্লেখ্য যে, কুরআ'ন শব্দটি নামায অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِۖ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

'আপনি সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং কায়েম করুন ফজরের নামায। নিশ্চয়ই ফজরের নামায ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময়।'[৫২]

উপরোক্ত আয়াতে কুরআ'নাল ফাজর বলতে ফজরের নামায বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের অন্তত ৪৩ টি নাম সরাসরি বা ইঙ্গিতে কুরআ'ন মজীদে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ৪টি নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। যেমন কুরআ'ন, কিতাব, ফুরক্বান ও যিকর।

কুরআ'ন নামটি কুরআ'ন মজীদের তেতাল্লিশ জায়গায় উল্লেখ আছে। যেমন সূরা আর-রহমান-এ,

اَلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْءَانَ

'দয়াময় আল্লাহ। তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআ'ন ।'[৫৩]

---

৪৯ আল-কুরআ'ন - ৫০ : ১

৫০ আল-কুরআ'ন - ৭৫ : ১৬-১৯

৫১ আল-কুরআ'ন - ৭৩ : ২০

৫২ আল-কুরআ'ন - ১৭: ৭৮

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৫৪]

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ اخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

'তবে কি তারা কুরআ'ন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে আসত, তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেত।'[৫৫]

এ আয়াতে কুরআ'ন মজীদের সত্যতার পক্ষে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, যদি এই কুরআ'ন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে আসত বা অন্য কারো রচনা হত, তাহলে এর মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি, গরমিল ও অসঙ্গতি পাওয়া যেত; অথচ শতাব্দির পর শতাব্দি চলে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি হচ্ছে; কিন্তু কুরআনের ভাষা, বর্ণনা বা তথ্যে সামান্যতম কোনো অসঙ্গতি কেউ চিহ্নিত করতে পারেনি। কারণ, এই কুরআ'ন মানবজাতির হেদায়তের জন্য আল্লাহর চিরন্তন বাণী। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ

'এ কুরআ'ন আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে এটি তার সর্মথন এবং এটি বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।'[৫৬]

কুরআ'ন মাজীদকে কিতাব নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। এটি কুরআ'ন মজীদের দ্বিতীয় নাম। কিতাব মানে গ্রন্থ, মহাগ্রন্থ। নামটি বিভিন্ন আঙ্গিকে কুরআ'ন মজীদের ৩০৯ স্থানে এসেছে। যেমন–

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ

'অতপর আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি তাদেরকে কিতাবের অধিকারী করলাম।'[৫৭]

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

৫৩ আল-কুরআ'ন - ৫৫: ১-২

৫৪ আল-কুরআ'ন - ৩৯ : ২৭

৫৫ আল-কুরআ'ন - ৪: ৮২

৫৬ আল-কুরআ'ন - ১০: ৩৭

৫৭ আল-কুরআ'ন - ৩৫: ৩২

‘এ কিতাব আমি নাযিল করেছি, যা কল্যাণময়। সুতরাং তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।’[৫৮]

أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

‘ওদের জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কুরআ’ন অবতীর্ণ করেছি, যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়। তাতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সেই কওমের জন্য, যারা ঈমান আনে।’[৫৯]

কুরআ’ন মজীদের আরেকটি নাম হচ্ছে ফুরক্বান। ফুরক্বান শব্দের উৎপত্তি ফারাক থেকে। মানে ফারাক করা, পার্থক্য করা। কুরআ’ন মজীদে ফুরকান (পার্থক্যকারী) শব্দের উল্লেখ ৬ স্থানে এসেছে। যেমন,

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

‘কত মহান তিনি, যিনি তার বান্দার প্রতি ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।’[৬০] কুরআ’ন মাজীদকে যিকির নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ

‘আর এটি কল্যাণময় যিকর (উপদেশ), যা আমি নাযিল করেছি। তবু কি তোমরা তাকে অস্বীকার করবে?”[৬১]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

‘আমিই যিকর (কুরআ’ন) অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি তার হেফাযতকারী।’[৬২]

কুরআ’ন মাজীদ এ কথাও বলছে যে, আমি কার কাছ থেকে নাযিল হয়েছি।

تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

‘এই কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।’[৬৩]

---

৫৮ আল-কুরআ’ন - ৬: ১৫৫

৫৯ আল-কুরআ’ন - ২৯: ৫১

৬০ আল-কুরআ’ন - ২৫: ১

৬১ আল-কুরআ’ন - ২১ : ৫০

৬২ আল-কুরআ’ন - ১৫ : ৯

৬৩ আল-কুরআ’ন - ৩৯ : ১

এ আয়াত বলে দিচ্ছে যে, এ কুরআ'ন সাধারণ কোন গ্রন্থ নয়; বরং এটি এমন একজন পরম সত্তার পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। নিম্নের আয়াতে আরো ব্যক্ত হয়েছে যে, এ কুরআ'ন দেয়া হয়েছে মহানবী (সা)-কে আল্লাহর একান্ত সন্নিধান হতে।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

'নিশ্চয় আপনি আল-কুরআ'ন গ্রহণ করেন প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানীর সন্নিধান হতে।'[৬৪]

الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا اللَّهَۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

'আলিফ লাম রা। এই কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত; এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করো না, অবশ্যই আমি তার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।'[৬৫]

পৃথিবীতে নাযিল হওয়ার আগে কুরআ'ন কোথায় সংরক্ষিত ছিল তারও বর্ণনা আছে কুরআ'ন মজীদে।

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

'বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআ'ন , সংরক্ষিত ফলক (লওহে মাহফুয)-এ লিপিবদ্ধ।'[৬৬]

এ আয়াতে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যে, দুনিয়াতে পাঠানোর আগে কুরআ'ন মাজীদ কোথায় ছিল? কুরআ'ন বলছে, এই সম্মানিত কুরআ'ন সংরক্ষিত আছে জমিন ও আসমান ছেড়ে যে অলৌকিক উর্ধ্বজগত সেখানকার একটি ফলকে। যার নাম 'লওহে মাহফুয'। আমরা জানি বর্তমানে কম্পিউটারের মেমোরিতে সব ডাটা সংরক্ষিত থাকে অতি সূক্ষ্মভাবে। লওহে মাহফুযও সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা হতে পারে সৃষ্টিজগতের সকল ডাটা সুরক্ষিত রাখার জন্যে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

'আর আল্লাহর নিকট আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভান্ডার, আল্লাহ ভিন্ন অপর কেউ তা অবগত নয় এবং তিনি সমস্তই অবগত আছেন, যাকিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রয়েছে এবং তার জ্ঞাতসার ব্যতীত কোনো পাতা ঝরে

৬৪ আল-কুরআ'ন - ২৭ : ৬

৬৫ আল-কুরআ'ন - ১১ : ১-২

৬৬ আল-কুরআ'ন - ৮৫ : ২১-২২

না, আর কোনো বীজ যমীনের অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র এবং শুষ্ক বস্তুও পতিত হয় না, কিন্তু এই সমস্তই উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।'[৬৭]

কুরআ'ন মজীদে এ কথাও বিবৃত হয়েছে যে, তা কার দায়িত্বে নাযিল হয়েছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ تَنزِيلًا

'নিশ্চয়ই আমিই আপনার উপর কুরআ'ন নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে।'[৬৮]

এ আয়াত হতে জানা যায়, এত বড় মহাগ্রন্থ লওহে মাহফুয হতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে দুনিয়াতে অবতারিত হয়েছে এবং তা একত্রে বা একদফায় নয়; বরং পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে।

وَاتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا

'এবং আপনার নিকট আপনার রবের যে কিতাব ওহীযোগে এসেছে তা পড়ে শোনান। তার বাণীসমূহ কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আর আপনি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন আশ্রয়ই পাবেন না।'[৬৯]

কুরআ'ন কার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছে সে বর্ণনাও পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে-

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

'জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন।'[৭০]

পৃথিবী থেকে আকাশ, তারপর সাত আসমান, আরো উর্ধ্বে লওহে মাহফুয সেখান থেকে কুরআ'ন মাজীদ এই জগতে কার মাধ্যমে পাঠানো হল, তার জবাব রয়েছে এ আয়াতে। নিচের আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অবতারণ হয়েছে সত্যসহ অর্থাৎ ঠিকভাবে।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

'বলুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে রূহুল-কুদুস (জিব্‌রাঈল) সত্যসহ কুরআ'ন অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ।'[৭১]

প্রথম আয়াতে জিব্‌রাঈল (আ) এর নাম রুহুল আমীন আর দ্বিতীয় আয়াতে রুহুল কুদুস। এ আয়াতে কুরআনে হাকীম কার পক্ষ হতে, কে নিয়ে এসেছেন, তার বৈশিষ্ট্য কি, কী উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে খুব সংক্ষেপে

---

৬৭ আল-কুরআ'ন - ৬: ৫৯

৬৮ আল-কুরআ'ন - ৭৬ : ২৩

৬৯ আল-কুরআ'ন - ১৮: ২৭

৭০ আল-কুরআ'ন - ২৬ : ১৯৩

৭১ আল-কুরআ'ন - ১৬ : ১০২

সবকথা বলে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, এটি হেদায়তস্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ। অর্থাৎ এর মধ্যে মানবজাতির জন্য পথের দিশা রয়েছে। আর যারা মু'মিন, কুরআনের অনুসারী তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যে, তারা যদি কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলে তাহলে তাদের জীবন দুনিয়া ও আখেরাতে সফল্যমন্ডিত হবে।

কুরআ'ন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবীর নাম মোবারকও উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই কুরআ'ন মুহাম্মদ এর উপর নাযিল হয়েছে:

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

'যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে–আর তাও তাদের প্রতিপালক হতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।'[৭২]

কুরআ'ন কোন মাসে নাযিল হয়েছে তার বর্ণনাও আছে:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

'রমযান মাস, তাতে মানুষের দিশারী এবং পথের স্পষ্টনিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআ'ন অবতীর্ণ হয়েছে।'[৭৩]

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআ'ন মাজীদ প্রবিত্র মাহে রমযানে নাযিল হয়েছে। এ কথার অর্থ হল, কুরআ'ন মাজীদ নাযিলের সূচনা হয়েছে এই পবিত্র মাসে। কেননা, কুরআ'ন একত্রে নাযিল হয়নি; বরং নবী কারীম (সা)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন কুরআ'ন নাযিলের সূচনা হয় আর তারপর থেকে মক্কার ১৩ বছর ও মদীনার ১০ বছর মোট ২৩ বছরের জীবনব্যাপি অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ কুরআ'ন নাযিল হয়েছিল।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুরআ'ন মাজীদ কি রাতের বেলা নাযিল হয়েছিল, নাকি দিনের বেলা? কুরআ'ন মাজীদ তার জবাব দিয়ে বলছে যে, রাতের বেলা নাযিল হয়েছে আর সেই রাতটিও ছিল মহিমান্বিত রজনী পবিত্র লাইলাতুল কদর।

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

'নিশ্চয় আমি কুরআ'ন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে।'[৭৪]

---

৭২ আল-কুরআ'ন - ৪৭ : ২

৭৩ আল-কুরআ'ন - ২ : ১৮৫

কুরআ'ন মাজীদ আরবি ভাষায় কেন নাযিল হল তার উত্তরও আমরা কুরআ'ন মাজীদ থেকে পাই।

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'এটা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় কুরআ'ন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।'[৭৫]

পৃথিবীর সবচে সমৃদ্ধ, প্রাচীন ও জীবন্ত ভাষা আরবি। পৃথিবীতে অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। অনেক ভাষা কোনভাবে বেঁচে থাকলেও মানুষ সে ভাষায় কথা বলে না, যেমন সংস্কৃত ভাষা। তাছাড়া অধিকাংশ ভাষা কালের বিবর্তনে এমনভাবে বদলে গেছে যে, সেই ভাষাভাষীরাও আগের ভাষা এখন বুঝে না। যেমন ল্যাটিন ভাষা, যা ইংরেজিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর প্রাচীন সংস্কৃত বাংলা থেকে উৎসারিত হয়েছে আধুনিক বাংলাভাষা। কিন্তু আরবি ভাষা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কুরআ'ন মাজীদ নাযিল হওয়া আর হাদীসের ভাষা হওয়ার সুবাদে এ ভাষা চির জীবন্ত এবং ভাষা ও সাহিত্যের জগতে তার বসন্ত চিরঅম্লান।

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ

'এভাবে আমি আপনার প্রতি কুরআ'ন অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৭৬]

পৃথিবীর বুকে এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যা ভুলত্রুটি সম্পূর্ণ উর্ধ্বে বা লেখক দাবি করতে পারে যে, আমার বইতে কোনো ভুলত্রুটি নাই। কিন্তু কুরআ'ন তার ব্যতিক্রম।

ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

'এটা সে কিতাব যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটা পথনির্দেশ।"[৭৭]

পৃথিবীর বুকে এমন কোন কিতাব বা গ্রন্থ নেই, যার প্রতিটি কথা ও বাক্য অকাট্য বলে বা তাতে কোন প্রকার ভুল কিংবা সন্দেহের অবকাশ নেই বলে লেখক দাবি করতে পারে। একমাত্র কুরআ'ন ই দাবি করতে পেরেছে যে, এই গ্রন্থের কোথাও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ তা আল্লাহ তা'আলার বাণী ও কালাম।

تَنزِيلُ الْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ

'এ কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।'[৭৮]

---

৭৪ আল-কুরআ'ন - ৯৭ : ১

৭৫ আল-কুরআ'ন - ১২ : ২

৭৬ আল-কুরআ'ন - ৪২ : ৭

৭৭ আল-কুরআ'ন - ২ : ২

এ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যে, এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে আসেনি বা আল্লাহর কালাম নয়। কিন্তু আফসোস যে, অবাধ্য মানুষ এই সত্যটি মানতে রাজি নয়।

কুরআ'ন মাজীদ তাই নিজের সত্যতার পক্ষে বিশ্ববাসির সামনে চিরকালের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

'বলুন, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআ'ন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদি তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে, তবুও তারা এটার অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।"[৭৯]

সম্পূর্ণ কুরআনের মত রচনা করতে হবে এমন নয়; বরং কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার মত বাক্য রচনার চ্যালেঞ্জও দেয়া হয়েছে।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এটার অনুরূপ কোন ছোট্ট সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে (এ কাজে) আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।'[৮০]

কুরআ'ন মজীদের এই চ্যালেঞ্জ দীর্ঘ দেড় হাজার বছর যাবত বলবৎ রয়েছে। আরব বিশ্বসহ সারা দুনিয়ায় এত কবি সাহিত্যিক জ্ঞানীগুণী এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারেনি, পারবেও না। কেননা, কুরআ'ন আল্লাহর প্রেরিত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ পাক যে ওহী প্রেরণ করেছেন তার জ্বলন্ত সাক্ষী কুরআ'ন মাজীদ। এ ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বাক্ষ্য দিয়েছেন আরো বলিষ্ঠ ভাষায়, যাতে মানুষ সর্তক হয় এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মর্যাদা আল্লাহর নিকট কত উচ্চে। এই সাক্ষ্যকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদেরও সাক্ষীরূপে পেশ করেছেন।

لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَالْمَلَٰئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

'উপরন্তু আল্লাহ, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী দেয়। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।'[৮১]

---

৭৮ আল-কুরআ'ন - ৩২ : ২

৭৯ আল-কুরআ'ন - ১৭: ৮৮

৮০ আল-কুরআ'ন - ২ : ২৩

এর চেয়ে বড় ও মর্যাদাপূর্ণ সাক্ষ্য আর কী হতে পারে?

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

'আপনি বলুন, সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী? বলুন, আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআ'ন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছাবে তাদেরকে আমি সর্তক করি। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে। আপনি বলুন যে, আমি এমন সাক্ষ্য দেই না। বলুন, তিনি তো এক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।'[৮২]

কুরআ'ন মাজীদ থেকে আমরা আরো জানতে পারি, এটি কবির কল্পনাবিলাস নয়।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

'এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।'[৮৩]

এই গ্রন্থ কোন কবির কল্পনা প্রসূত রচনা নয়। তবে তা বুঝতে পারার পরও তোমরা যে বিশ্বাস করা না, তার মূলে রয়েছে তোমাদের স্বভাবের দোষ। অর্থাৎ তোমরা সত্যকে খুব কমই বিশ্বাস কর। নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু চিন্তা করতে তোমরা প্রস্তুত নও।

কুরআ'ন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলছে যে, এটি গণকের জাদুমন্ত্রও নয়

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

'এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।'[৮৪]

কুরআ'ন নাযিল হয়েছিল আরব সমাজে। কুরআনের আবেদন সম্মোহনী শক্তির মত মনকে আকৃষ্ট করত। ফলে স্বার্থবাদীরা ভাবত যে, এই কুরআ'ন হয়ত গণক ও জাদুকরদের জাদুমন্ত্র। কুরআ'ন এমন অপবাদ বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রত্যাখান করে বলেছে যে, জীবন চলার পথে দিক নির্দেশনা পাওয়া ও উপদেশ লাভের যে ব্যাপারটি আছে, তা নিয়ে চিন্তা করলেই তোমরা কুরআনের সত্যতা বুঝতে পারতে। কারণ, কুরআ'ন হচ্ছে হেদায়াত, উপদেশ ও জীবন চলার দিক নির্দেশনা কোন জাদুমন্ত্র বা বুজরুকি নয়। জাদুমন্ত্র হয় সাময়িক সম্মোহন ও তেলেস্মাতি দেখানের জন্যে। কুরআ'ন কী উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তা ভেবে দেখ।

---

৮১ আল-কুরআ'ন - ৪: ১৬৬

৮২ আল-কুরআ'ন - ৬: ১৯

৮৩ আল-কুরআ'ন - ৬৯: ৪১

৮৪ আল-কুরআ'ন - ৬৯ : ৪২

আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, কুরআ'ন হল উপদেশ গ্রহণের সহজ সরল পথ।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

'কুরআ'ন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি।'[৮৫]

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'আমি তো আপনার ভাষায় কুরআ'ন কে সহজ করে দিয়েছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৮৬]

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

'আমি তো আপনার ভাষায় কুরআ'ন কে সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারেন।'[৮৭]

বস্তুত কুরআ'ন মাজীদ নাযিল হয়েছে উপদেশ স্বরূপ, যা মু'মিনদেরকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায় আর কাফের সম্প্রদায়কে জীবনের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে। কুরআনের মধ্যে রয়েছে সমাজ নির্মাণের নির্দেশনা। এটিই কুরআ'ন মজীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

'নিশ্চয়ই এই কুরআ'ন হিদায়াত করে সেই পথের দিকে, যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।'[৮৮]

কুরআ'ন হচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশারী

الٓرٰ ۚ كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَـٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

'আলিফ লাম রা। এ হচ্ছে এক মহাগ্রন্থ। এটি আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার হতে আলোর দিকে তারই পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ।'[৮৯]

---

৮৫ আল-কুরআ'ন - ৫৪ : ১৭

৮৬ আল-কুরআ'ন - ৪৪: ৫৮

৮৭ আল-কুরআ'ন - ১৯ : ৯৭

৮৮ আল-কুরআ'ন - ১৭ : ৯

৮৯ আল-কুরআ'ন - ১৪ : ১

কবির কবিতায় এমন বৈশিষ্ট্য মিলবে না; গণক ঠাকুরের জাদুমন্ত্রেও অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার পাথেয় খুঁজে পাবে না। কুরআ'ন আসলে অন্য জিনিষ। কুরআ'ন হচ্ছে মানুষ জীবন চলার পথে অন্ধকার থেকে উদ্ধার পাওয়ার আলোকবর্তিকা।

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

'হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।'[৯০]

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

'এ হচ্ছে মানবজাতির জন্যে স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।[৯১]

দুনিয়ার কোনো গ্রন্থ স্পর্শ করার জন্য পবিত্রাবস্থায় থাকার শর্ত নেই। এ ক্ষেত্রে কুরআ'ন ব্যতিক্রম। পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে কুরআ'ন অপবিত্ররা স্পর্শ করতে পারবে না

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ

'নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআ'ন, যা সুরক্ষিত আছে কিতাবে। যারা পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।'[৯২]

শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা নয়, অন্তকরণকেও পবিত্র পরিশুদ্ধ করতে হবে তেলাওয়াতের আগে।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ

'যখন কুরআ'ন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর শরণ নিবে।'[৯৩]

তেলাওয়াতের আগে মানসিক প্রস্তুতি চাই। মন ও চিন্তাকে শুদ্ধ করে নিতে হবে। মনের উপর শয়তান যে সারাক্ষণ কুমন্ত্রণা দেয় তা থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য শুরুতেই আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং বলতে হবে 'আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্ব–নির্ রজীম' (আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

কী নিয়মে তেলাওয়াত করতে হবে তাও বাৎলে দেয়া হয়েছে।

---

৯০ আল-কুরআ'ন - ৪: ১৭৪

৯১ আল-কুরআ'ন - ৩ : ১৩৮

৯২ আল-কুরআ'ন - ৫৬ : ৭৭-৭৯

৯৩ আল-কুরআ'ন - ১৬ : ৯৮

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا

'আমি কুরআ'ন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে, যাতে আপনি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পারেন থেমে থেমে এবং আমি তা পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।'[৯৪]

তেলাওয়াতকালে মনের অবস্থা কেমন হওয়া চাই তার বিবরণ দেয়া হয়েছে দু'টি আয়াতে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'মু'মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাদের নিকট আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।'[৯৫]

اَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

'আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসমঞ্জস এবং যা পুনপুন আবৃত্তি করা হয়। এর ফলে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গায়ের চামড়া শিউরে উঠে, অতঃপর তাদের চামড়া ও অন্তর বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি এর মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।'[৯৬]

কুরআ'ন তেলওয়াতের সময় দেহমনে যে শিহরণ জাগা উচিত, তার বিবরণ রয়েছে এ আয়াতে। আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে, হেদায়ত একমাত্র আল্লাহর হাতে। কাজেই কুরআ'ন শিখল-পড়ল বলেই সবাই হেদায়ত পাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তাই সবসময় আল্লাহর রহমত পাওয়ার জন্য মনকে রুজু করে রাখতে হবে। নচেত মনে বক্রতা থাকলে ফল হবে উল্টা।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

'আমি অবতীর্ণ করি কুরআ'ন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ; তবে তা যালিমদের জন্য ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'[৯৭]

---

৯৪ আল-কুরআ'ন - ১৭ : ১০৬

৯৫ আল-কুরআ'ন - ৮ : ২

৯৬ আল-কুরআ'ন - ৩৯ : ২৩

৯৭ আল-কুরআ'ন - ১৭: ৮২

কুরআ'ন মজীদের হেদায়ত লাভ করে আল্লাহর দয়ার মধ্যে শামিল হওয়ার একটি পথ আছে। তা হচ্ছে একাগ্র মনে নীরবে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করা। তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করার আশা করা যায়। কারণ, এতে কুরআনের প্রতি মনের ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই ভক্তি ঈমাণের নিদর্শন।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'যখন কুরআ'ন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।'[৯৮]

যারা আল্লাহর কালাম নিয়মিত তেলাওয়াত করে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার। আর যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর অকাট্য, প্রামাণ্য মহান বাণী দুনিয়াতে থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি আগ্রহ দেখায় না, এমনকি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাদের এ আচরণ কুফরির শামিল। আর যারা আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তাদের জীবন ষোলআনাই মিছে। ইরশাদ হয়েছে:

الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَـٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ الْخَـٰسِرُونَ

'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে এটা তেলাওয়াত করে তারাই এতে বিশ্বাস করে, আর যারা এটা প্রত্যাখ্যান করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।'[৯৯]

দুনিয়াতে মানুষ লাভজনক ব্যবসার জন্য খুবই লালায়িত। আল্লাহ পাক বলছেন যে, ইহ পরকালের জন্য সত্যিকার লাভজনক একটি ব্যবসা আছে। তা হচ্ছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ اللهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ

'যারা আল্লাহর কিতাব (কুরআ'ন) তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে জীবিকারূপে যা দান করেছি তা থেকে দান করে–গোপনে- প্রকাশ্যে, নিশ্চয়ই তারা এমন এক বাণিজ্য করছে, যা কখনো লোকসান হবে না।'[১০০]

কুরআনের হাকিকত অতি মহান। তার দায়িত্বভার অতিশয় কঠিন। যদি এই কুরআ'ন পাহাড়ের উপর নাযিল করা হত, কুরআ'ন কে ধারণ, বরণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাহাড় বহন করতে পারত না। সে ভয়ে বিনীত হয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যেত পাহাড়। অথচ সেই মহাগ্রন্থ তোমরা পাওয়ার পরও তার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা কর না।

---

৯৮ আল-কুরআ'ন - ৭ : ২০৪

৯৯ আল-কুরআ'ন - ২ : ১২১

১০০ আল-কুরআ'ন - ৩৫ : ২৯

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'যদি আমি এ কুরআ'ন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে আপনি তাকে দেখতেন যে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।'[১০১]

আল-কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

'আর যে দিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের মধ্যকার এক একজন সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে খাড়া করব এবং এদের সকলের মোকাবিলায় আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব; আর আপনার প্রতি এই কুরআ'ন নাযিল করেছি–যা (সুন্দর জীবন পরিচালনার) সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী, (বিশেষত) মুসলমানদের জন্য বড় হেদায়াত ও বড় রহমত এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক।'[১০২]

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

'আর যত প্রকার প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এবং যত প্রকার পাখি স্বীয় ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড়ে তন্মধ্যে কোন প্রকারই এরূপ নেই, যারা (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের ন্যায় (সমবেত) দল হবে না। আমি কিতাবে (লওহে মাহফুয বা কুরআ'ন) কোন কিছুই ছাড়ি নাই, অতঃপর সকলকে স্বীয় পরওয়ারদেগারের সমীপে সমবেত করা হবে।'[১০৩]

যাদের বিরুদ্ধে কুরআ'ন নালিশ করবে

আল্লাহর পক্ষ হতে এত মহানগ্রন্থ আসার পরও যারা তার হেদায়ত লাভ করেনি, তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং রাসূল (সা) কিয়ামতের দিন নালিশ করবেন।

وَقَالَ الرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا۟ هَٰذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا

'রাসূল বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআ'নকে পরিত্যাজ্য মনে করে।'[১০৪]

---

১০১ আল-কুরআ'ন - ৫৯ : ২১

১০২ আল-কুরআ'ন - ১৬: ৮৯

১০৩ আল-কুরআ'ন - ৬ : ৩৮

১০৪ আল-কুরআ'ন - ২৫ : ৩০

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَبٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

'নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট কুরআ'ন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, এটি অবশ্যই এক মহিমান্বিত গ্রন্থ। কোন মিথ্যা তাতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। সম্মুখ হতেও না, পেছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।'[১০৫]

يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ السَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক বিষয় তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করে থাকেন। আল্লাহর নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এর দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।'[১০৬]

সত্যিই কুরআ'ন আল্লাহর পবিত্র কালাম। মানব জাতির জন্য সৌভাগ্যের পরশমনি। দুনিয়ার কল্যাণ, আখেরাতের সুখময় জীবনের পথর্নিদেশিকা। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, শান্তিময় জীবনের প্রত্যাশী তাদের জন্য আলোর দিশা। কুরআ'ন নাযিল হয়েছে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে সৃষ্টির সেরা আল্লাহর পেয়ারা পূতঃপবিত্র প্রশংসিত চরিত্রে বিভূষিত প্রিয় রাসূলের উপর। সত্য মিথ্যার মানদন্ড, ন্যায়-অন্যায়ের নিক্তি এই কুরআ'ন নিয়ে গবেষণা হয়েছে, এখনো হচ্ছে দুনিয়ার সর্বত্র। এমন কোন দিন নাই, যেদিন কুরআ'ন নিয়ে গবেষণার একটি না একটি পুস্তক দুনিয়ার বাজারে আসছে না। এর প্রতিটি সূরার বিষয়বস্তু, এমন কি প্রত্যেকটি বাক্য, শব্দ ও অক্ষর নিয়ে গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে। মুসলমানরা যেমন তেমনি অমুসলমানরাও কুরআ'ন গবেষণায় পিছিয়ে নেই। কুরআনের বাক্য বিন্যাস, পরিবেশিত তথ্য, বর্ণিত ইতিহাস, অনাগত ভবিষ্যতবাণীর মাঝ থেকে খুঁত বের করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহর অলৌকিক গ্রন্থের সামনে মানুষের জ্ঞান অসহায়। বিরোধীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ। বিরোধীরা স্বীকার করুক আর না করুক, দুনিয়ার সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সূত্র কুরআ'ন । মানব সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় নীতি নৈতিকতার উৎস আল্লাহর এই কালাম। এর মহিমা গুণাবলী ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা দিতে সাত সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার সব গাছ-গাছালী যদি কলমও হয়, আল্লাহর কালামের মহিমা লিখে শেষ করতে পারবে না।

وَلَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

১০৫ আল-কুরআ'ন - ৪১ : ৪১-৪২

১০৬ আল-কুরআ'ন - ৫: ১৫-১৬

‘যদি পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং তার সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’[১০৭]

কালের প্রবাহে পৃথিবীর অনেক কিছু বদলে যায়। কিন্তু, আল্লাহ পাক যেমন অবিনশ্বর, তার পবিত্র কালামও অবিনশ্বর। তাই তার পরিবর্তন নাই। তার প্রতিটি বাক্য, শব্দ, ও অক্ষর অক্ষত, সুরক্ষিত। দেড় হাজার বছরের ইতিহাস তার সাক্ষী। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ পাকই এই কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। চূড়ান্ত কথা হচ্ছে–

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۖ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِۦ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

‘সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’[১০৮]

---

১০৭ আল-কুরআ'ন - ৩১ : ২৭

১০৮ আল-কুরআ'ন - ৬: ১১৫

৩য় অধ্যায়

ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদীসশাস্ত্র

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি জ্ঞান। জ্ঞান বলতে ওহীলব্ধ জ্ঞান, যে জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ হতে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান দান করেছেন তা দুই প্রকার। এক প্রকার জ্ঞান মৌল। এর নাম কিতাবুল্লাহ বা আল কুরআ'ন । এর ভাব ও ভাষা উভয়ই স্বয়ং আল্লাহর। একে ওহীয়ে মাতলু বলা হয়। নবী কারীম (সা) এই জ্ঞানকে সরাসরি আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান প্রথম প্রকার জ্ঞানের ভাষ্য। এর নাম সুন্নাহ বা আল হাদীস।

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবীর প্রতি যে ওহী নাযিল করেছেন সেটিই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। আল্লাহ প্রদত্ত ওহী মূলত দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের ওহীকে বলা হয় ওহীয়্যে মাতলু–সাধারণ পঠিতব্য ওহী; একে ওহীয়্যে জ্বলীও বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের ওহী 'ওহীয়ে গাইরে মাতলু বা অপঠিতব্য ওহী হিসেবে পরিচিত। কারণ, সাধারণত তা তেলাওয়াত করা হয় না। এর অপর এক নাম ওহীয়্যে খফী বা প্রচ্ছন্ন ওহী।এর ভাব আল্লাহর, যা নবী কারীম (সা) আপন কথা, কাজ ও সম্মতি অর্থাৎ আপন জীবন দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এটিও প্রথমটির ন্যায় শরীয়তে মুহাম্মদীর উৎস। অতএব উম্মতে মুহাম্মদী প্রথম প্রকার ওহী সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে এই দ্বিতীয় প্রকার ওহীর সংরক্ষণের জন্যও ঠিক সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ শিক্ষণ, হেফয (মুখস্থকরণ) অন্যদের শিক্ষাদান, কিতাবে লিপিবদ্ধ করণ এবং বাস্তবে তা কার্যকরী করা। এসব ব্যবস্থা সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে এ পর্যন্ত বরাবর অব্যাহত রয়েছে। কোনো যুগেই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শিথিলতা প্রদর্শিত হয়নি। তবে সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগে লিখন অপেক্ষা মুখস্থকরণই প্রধান ছিল।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কুরআ'ন মাজীদ ও হাদীসের ভূমিকার মূল্যায়ন হল, কুরআ'ন মাজীদ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি আর হাদীস হল সেই মূলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তার বাস্তবায়নের কর্মপন্থা। কুরআ'ন মাজীদকে যদি ইসলামের বিরাট বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড বলা হয় তাহলে হাদীস তার শাখা-প্রশাখা। অন্যকথায় কুরআ'ন মাজীদ ইসলামের জীবন প্রাসাদের পরিকল্পিত চিত্র বা ব্লু-প্রিন্ট। সেই ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদ হল হাদীস। জীবন প্রাসাদ রচনার পরিকল্পনাসহ ইঞ্জিনিয়ার তথা রাসূল প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে। এটি সৃষ্টিলোকের শাশ্বত বিধান। ইতিহাসের যে কোনো স্তরে পরিবর্তিত অবস্থার যে কোনো পর্যায়ে ব্লু-প্রিন্ট বা পূর্ব নকশা অনুযায়ী প্রাসাদ রচনায় ইঞ্জিনিয়ার বা রাসূলের ব্যাখা-বিশ্লেষণ, বাস্তব কর্মের নির্দেশনা, পরামর্শ ও উপদেশকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআ'ন যেন হৃদপিণ্ড আর হাদীস সেই হৃদপিণ্ডের সাথে যুক্ত ধমনী। ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এ ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা-তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে।

হাদীস একদিকে যেমন কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা কুরআনের বাহক বিশ্বনবী (সা) এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ এবং তার কথা ও কাজ, হেদায়ত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবররণ। এ

কারণে ইসলামী জীবন বিধানে কুরআ'ন মজীদের পরেই; বরং কুরআনের একই সঙ্গে হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা যেমন রাসূলের আনুগত্য ও বাস্তব অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআ'ন অনুযায়ী আমল করাও অসম্ভব।

কুরআনের সাথে সাথে হাদীসও দ্বীনের মূল স্তম্ভ

আল্লাহর হেদায়ত ও নির্ভুল নির্ভরযোগ্য সত্যজ্ঞানের যে উৎস হতে কুরআ'ন মাজীদ অবতীর্ণ, হাদীসও ঠিক সেই উৎস হতেই নিঃসৃত। কুরআ'ন মজীদের ঘোষণা হতেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ

'হে নবী আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।'[১০৯]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন:

وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ هُوَ الْقُرْآنُ وَالْحِكْمَةُ وَهِيَ السُّنَّةُ

আয়াতে উল্লিখিত আল কিতাব অর্থ কুরআ'ন মাজীদ এবং হিকমত অর্থ সুন্নাত বা হাদীসে রাসূল। (আর উভয় জিনিসই আল্লাহর নিকট হতে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ।[১১০]

নবী কারীম (সা) এর নিম্নোক্ত বাণীও প্রমাণ করে যে, কুরআ'ন ও হাদীস উভয়ই একই স্থান ও একই সূত্র হতে প্রাপ্ত। তিনি বলেছেন:

إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

আমাকে কুরআ'ন দেয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এর মত আরেকটি জিনিস।[১১১]

'এর মত আরেকটি জিনিস' কথাটির অর্থ হাদীস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কেননা, দুনিয়ার মানুষ রাসূলে কারীম (সা) এর নিকট হতে এই দুটি জিনিসই লাভ করেছে।

---

১০৯ আল-কুরআ'ন - ৪: ১১৩

১১০ ইসমাঈল ইবনে উমর আল কাসীর আদ দেমাশকী, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ২০০৮

১১১ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি., হাদীস নং ৪০৫১; মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, কায়রো, মিসর, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫, হাদীস নং ২৬৬৪

হযরত হাসসান ইবনে সাবিত বলেছেন:

كَانَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَ يُعَلِّمُهُ اِيَّاهُ كَمَا يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ

জিব্‌রাঈল (আ) হযরতের নিকট সুন্নাত বা হাদীস নিয়ে নাযিল হতেন যেভাবে কুরআ'ন নিয়ে নাযিল হতেন এবং তাকে সুন্নাতও শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষা দিতেন কুরআ'ন ।[112]

হাসসান ইবনে আতিয়াতা বলেন,

كَانَ الْوَحْىُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ يَحْضُرُهُ جِبْرِيْلُ بِالسُّنَّةِ الَّتِىْ تُفَسِّرُ ذَالِكَ

রাসূলে কারীম (সা) এর প্রতি ওহী নাযিল হত এবং হযরত জিব্‌রাঈল তাঁর নিকট সুন্নাত নিয়ে হাযির হতেন, যা প্রথম প্রকার ওহী কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে।[১১৩]

কুরাআনের আয়াত ছাড়া শুধু হাদীস নিয়েও হযরত জিবরাঈল নবী করীমের নিকট উপস্থিত হতেন। একথা মুসলিম শরীফের একটি হাদীস হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কিতাবুর জিহাদ-এ উল্লেখিত بَابُ بَيَانِ مَا اَعَدَّهُ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ হাদীসে আত্মনিবেদিত নিষ্ঠাবান মুজাহিদের গুনাহ মাফ হওয়া সম্পর্কে এক লম্বা কথা বর্ণনা করার পর রাসূলে কারীম (সা) বললেন:

فإن جبريل عليه السلام قال لى

'জিবরাঈল (আ) নিজেই আমাকে এ কথা বলে গেলেন।'[১১৪]

এ কথাটি এ পর্যায়ে খুবই স্পষ্ট ও অকাট্য।

বস্তুত নবী কারীম (সা) দ্বীন সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর নিকট হতে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার পরই কথা বলতেন। দ্বীন সম্পর্কিত কোনো কথা তিনি নিজস্ব আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে বলতেন না। এর বাস্তব প্রমাণ হল, তাঁর নিকট দ্বীন-ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে এবং সে বিষয়ে তাঁর পূর্ব জ্ঞান না থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার কোনো জবাব দিতেন না; বরং জিবরাঈল মারফতে আল্লাহর নিকট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভের অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি এ্ উপায়ে যখন জানতে পারতেন, তখনই সেই জিজ্ঞাসার জবাব দান করতেন। এর দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়।

---

১১২ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান দারেমী, *সুনানে দারেমী*, মদীনা মুনাওয়ারায় মুদ্রিত, ১৩৮৬ হিজরি, বাবু সুন্নাতিন কাযিয়াতিন আলা কিতাবিল্লাহ; মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু যাহও, *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, ইদারাতুল বুহূস আল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াত ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ১১

১১৩ জামাল উদ্দীন ইবনে আল হাল্লাক আল কাসেমী, *তাফসীরে মাহাসিনুত তা'বীল*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৩৩২ হিজরি, ১খ. পৃ-১৯১

১১৪ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরাইশী আন- নিকাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, , দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, লেবনান ১৯৮৭, ২খ. পৃ. ১৩৫

এক ইহুদী পণ্ডিত নবী কারীম (সা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, পৃথিবীতে উত্তম স্থান কোনটি? এর সঠিক জবাব উপস্থিতভাবে নবী কারীম (সা) এর জানা ছিল না। সে কারণে তিনি এই প্রশ্নের জওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন না। পরে জিবরাঈলের আগমন হলে তিনি তাঁর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জিব্‌রাঈল প্রথমত বললেন: 'এ বিষয়ে প্রশ্নকারী ও যার নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে উভয়ই অজ্ঞ। এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট হতে জেনে জবাব দেয়া যাবে।' দ্বিতীয়বারে জিবরাঈল এসে বললেন, হে নবী! আমি এবার আল্লাহর এতই নিকটবর্তী হয়েছি, যতটা আর কখনো হই নি। আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

شَرُّ الْمَوَاضِعِ أَسْوَاقُهَا وَ خَيْرُالْمَوَاضِعِ مَسَاجِدُهَا

'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান হচ্ছে হাট-বাজার-মেলা এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান হচ্ছে মসজিদসমূহ।'[১১৫]

হযরত আবু ইয়ালা নামক একজন সাহাবী 'ওহী' কীভাবে নাযিল হয় এবং ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলে করীমের অবস্থাটা কীরূপ হয় তা প্রত্যক্ষভাবে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিদায় হজ্জের সফরে তা প্রত্যক্ষ করার অপূর্ব সুযোগ ঘটে। নবী কারীম (সা) এ সময় 'জে'রানা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন একজন সাহাবী রাসূলে করীমের নিকট জিজ্ঞাসা করেন: সুগন্ধি মেখে উমরা পালনের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয কিনা?[১১৬] নবী কারীম (সা) সঙ্গে সঙ্গেই এর জবাব প্রদান করেন নি। তিনি অনেক্ষণ চুপ করে থাকেন। অতপর রাসূলে আকরম (সা) এর প্রতি ওহী নাযিল হয়। বুখারী শরীফে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَ الْوَحِىْ

'তখন নবী কারীম (সা) কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হল...।'

এ সময় নবী কারীম (সা) এর উপর কাপড় দ্বারা ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। তখন ইয়ালা এর মধ্যে মাথা প্রবেশ করিয়ে দেখলেন।

فَإِذاً رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ وَهُوَيَغِطُّ

'রাসূলের সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে, এবং তিনি বিকট শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন।'

বস্তুত কুরআ'ন মাজীদ জিবরাঈলের মাধ্যমে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ সত্য বিধান। কিন্তু এই ওহীর মাধ্যমে যত সত্য ও নির্ভুল তত্ত্বই লাভ হচ্ছে তা সবই কুরআ'ন মজীদে সন্নিবেশিত নয়। দ্বীন-ইসলামে এ ধরনের সত্য জ্ঞানের গুরুত্ব কুরআনের অব্যাবহিত পরেই। এই কারণে তা কুরআনে সন্নিবেশিত না হয়ে 'হাদীসে রাসূল' হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে। নবী জীবনের ইতিহাসে এমন অসংখ্য ওহী নাযিল হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়, যা ত্রিশপারা কুরআ'ন মজীদের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। প্রশ্ন হল তাহলে কি তা বিনষ্ট বা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। তা কী অপ্রয়োজনীয় ছিল? নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। বাস্তবিকই তা বিনষ্ট হয়নি। মানব জীবনের জন্য তা

---

১১৫ ইবনে হিব্বান, *সহীহ ইবনে হিব্বান*, দারুল মাআরিফ, ১৯৫২/ ১৩৭২; ১খ. পৃ-৭১,

১১৬ আল্লামা শরকাবী লিখেছেন, প্রশ্নকারী ছিলেন আতা ইবনে মুনিয়া, হযরত ইয়ালার ভাই; আব্দুল্লাহ ইবনে হিজাযী ইবনে ইবরাহীম আশ শরকাভী, *ফাতহুল মুবদি বিশারহে মুখতাসারুয যুবাইদী*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত লেবানন, ১৯১৯; ২খ.পৃ. ৮৯

একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল বলে তা চিরদিনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম জাতির জন্য তা এক চিরন্তন সম্পদ।

মুসলিম সমাজে শুরু থেকেই আল্লাহর কালাম কুরআ'ন মজীদের প্রতি যেমন ঈমান ও গুরুত্ববোধ ছিল, ওহীর কুরআ'ন বহির্ভূত অংশ–হাদীসের প্রতিও ছিল অনুরূপ আগ্রহ ও গুরুত্ববোধ। এমনকি রাসূলে করিমের (সা) ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের নিকট কুরআ'ন মাজীদ সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ ও সংকলিত অবস্থায় ছিল বিধায় তার জন্য কোনো অনুসন্ধান-তৎপরতা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয় নি। কিন্তু রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে এই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এ জন্যে তাদের চেষ্টা ও সাধনার কোনো অন্ত ছিল না। তাঁরা রাসূলের অধিক নিকটবর্তী লোকদের নিকট এই পর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) একদিন হযরত আলী (রা)- কে জিজ্ঞাসা করলেন:

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ اِلاَّ مَا فِى كِتَابِ اللهِ

'কুরআনে সংকলিত ওহী ছাড়া ওহীর অপর কোনো অংশ আপনার নিকট রক্ষিত আছে কি?'[১১৭]

এর জবাবে হযরত আলী কয়েকটি হাদীস পেশ করেন। এর থেকে প্রমাণিত হয়-

(ক) কুরআ'ন ছাড়াও ওহী সূত্রে পাওয়া জ্ঞানের আরো অস্তিত্ব আছে।

(খ) সব ওহীই কুরআ'ন মজীদে সংকলিত বা কুরআনের মধ্যে সংকলিত হয়নি। ওহীর আরো এমন অংশ রয়েছে, যা কুরআনের বাইরে রয়েছে। তা আল্লাহর কালাম নামে অভিহিত না হলেও আল্লাহর নিকট হতে জেনে নেওয়া জ্ঞান।

(গ) কুরআ'ন বহির্ভূত ওহী রাসূলে করীমের মৌখিক কথা বাস্তবে করা কাজের বিবরণ হতে জানা যায় এবং তাও ওহী –ওহীলব্ধ জ্ঞান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হযরত আবু হুরায়রাা একেও ওহীর মধ্যে গণ্য করলেন; কিন্তু আলী (রা) তাতে কোনোরূপ আপত্তি করেননি। তিনি বলেন নি যে, সব ওহী–ওহীর মাধ্যমে পাওয়া সব জ্ঞানই, কুরআ'ন মজীদে সংকলিত হয়েছে বা এর বাইরে ওহীর কোনো অংশ নেই।

কুরআ'ন ও হাদীস বাহ্যত দুই জিনিস হলেও মূলত ওহীর উৎস হতে উৎসারিত। এ কারণে মৌলিকতা, যুক্তিভিত্তিকতা, প্রামাণিকতা এবং অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই হাদীসের প্রতি কোনো উপেক্ষা প্রদর্শন করা এবং 'তা রাসূলের কথা–আল্লাহর কথা নয়; অতএব তা না মানলেও চলবে' বলে এর গুরুত্ব হ্রাস করা কোনো মুসলমানেরই নীতি হতে পারে না।

এ পর্যায়ে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, নবী কারীম (সা) অনেক সময় তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের ভিত্তিতে ইজতিহাদও করেছেন। কুরআনের মৌলিক ও ইজমালী নীতির দৃষ্টিতে দ্বীনের বিস্তারিত রূপ সম্পর্কে স্বীয় চিন্তা ও বিবেচনার ভিত্তিতে জনগণকে তিনি অনেক আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন। শরী'আর দৃষ্টিতে তাও হাদীস, সুন্নাতে রাসূল এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (র) বলেছেন:

---

১১৭ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ১খ. কিতাবুল জিহাদ, পৃ-৪২৮

كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَهُوَ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْقُرْأنِ ثُمَّ اَخْرَجَ مَا يُؤَيِّدُهُ

'রাসূলে কারীম (সা) যা কিছু হুকুম দিয়েছেন তা সবই সেই জ্ঞান, যা তিনি কুরআ'ন হতে বুঝতে পেরেছেন। পরে কুরআ'ন হতে তার সমর্থন বের করেছেন।'[১১৮]

মোল্লা আলী কারী মিরকাত শরহে মিশকাতে লিখেছেন, হাদীসকে নবী করিম (সা) এর কথারূপে পরিচয় দেয়া হয় এ জন্য যে, তিনি তা কুরআ'ন থেকে বুঝে নিয়েছিলেন।

لِكَوْنِهِ الَّذِىْ اِسْتَنْبَطَهُ وَاسْتَخْرَجَهُ مِنَ القرآن

'এ জন্যই যে, তিনি তা কুরআ'ন হতেই বুঝে পেয়েঝেন এবং কুরআনের ভাবধারা হতেই তা বের করেছেন।'[১১৯]

আল কুরআনে রাসূল (সা) এর গুরুত্ব

বস্তুত ইসলামী শরীয়তের অন্যতম অপরিহার্য উৎস হাদীস। হাদীসকে অস্বীকার করে ইসলামী জীবনধারার চিন্তা অকল্পনীয়। হাদীসের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য কুরআ'ন মজীদের দৃষ্টিতে স্বয়ং রাসূলে কারীম (সা) এর গুরুত্ব কতখানি তা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। রাসূলে আকরমের আদেশ-নিষেধ, তার যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা বা মুখনিঃসৃত বাণী ও গোটা কর্মময় জীবন ইসলামী উম্মাহর জন্য একান্ত অনুসরণীয় এক মহান আদর্শ। রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল উম্মত তাঁকে পূর্ণ মাত্রায় অনুসরণ করে চলবে। তাঁর প্রদত্ত হুকুম আহকাম পুরোপুরি পালন করবে এবং তাঁর বাস্তব জীবনধারাকে অনুসরণ করে চলবে। কুরআ'ন মাজীদ স্পষ্ট ভাষায় রাসূল প্রেরণের এই উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছে এভাবে:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ

আমি একমাত্র এ উদ্দেশ্যে রাসূল পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাকে অনুসরণ করা হবে, তাঁকে মেনে চলা হবে।'[১২০]

অপর এক আয়াতে রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ

১১৮শায়খ মুহাম্মদ মাদানী, *আল-আহাদীসুল কুদসিয়া*, লাজনাতুল কুরআ'ন ওয়াস সুন্নাহ, মিসর, ২০০১,পৃ-১৮৮

১১৯ আলী ইবনে মুহাম্মদ নূরুদ্দীন মোল্লা আল হারাভী আল কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ*, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০১০, ভূমিকা

১২০ আল-কুরআ'ন - ৪ : ৬৪

‘হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তাঁদের আদেশ শ্রবণের পর তা অমান্য করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না। তোমরা ঐসব লোকদের মতো হইও না, যারা বলে, আমরা শুনেছি; কিন্তু কার্যত তারা শোনে না।’[১২১]

এখানে ঈমানদার লোকদের প্রতি প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে একই আদেশমূলক শব্দ ব্যবহার করে। তা হচ্ছে اطيعوا ‘আনুগত্য কর’। তাতে আল্লাহ এবং রাসূল উভয়কে মেনে চলা মুসলমানদের কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে এবং এ কর্তব্যের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তাতে বাহ্যত এটুকুই ফারাক করা যেতে পারে যে, আল্লাহর নাম প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব তাঁর আনুগত্য করতে হবে মূলত এবং প্রথমত, আর তার পরই আনুগত্য করতে হবে রাসূল (সা) এর।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা যায় আল্লাহর কিতাব কুরআ’ন মজীদের আদেশ-নিষেধ মান্য করে। আর রাসূলের আনুগত্য করতে হয় রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও অনুসৃত রীতিনীতি পালন করে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ ত্রিশপারা কুরআ’ন মজীদে বর্তমান; কিন্তু রাসূলের আদেশ নিষেধ কোথায় পাওয়া যাবে। তা পাওয়া যাবে রাসূলের কথা-কাজ, সমর্থন সম্বলিত মহান সম্পদ হাদীসের মাধ্যমে।

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

‘বলুন হে নবী! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করে চল। তা হলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকরী, দয়াশীল।[১২২]

অর্থাৎ আল্লাহকে ভালোবাসর অনিবার্য দাবি ও বাস্তব শর্ত হচ্ছে রাসূলকে কার্যত অনুসরণ করে চলা; আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর নিকট হতে গুনাহের মার্জনা লাভের একমাত্র পথ ও উপায় হচ্ছে রাসূলকে অনুসরণ করা। রাসূলকে অনুসরণ না করলে আল্লাহর ভালোবাসা ও তার নিকট গুনাহ মার্জনা লাভ সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়, রাসূলকে অনুসরণ করে না চললে মানুষ ঈমানদারই হতে পারবে না, মুসলমান থাকতে পারবে না; কাফের হয়ে যাবে। এই অনুসরণের জন্য তো হাদীস ও সুন্নাহকে মানার বিকল্প নেই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ

---

১২১ আল-কুরআ’ন - ৮ : ২০- ২১

১২২ আল-কুরআ’ন - ৩ : ৩১

'বলুন হে নবী! আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চল; যদি তা না কর তবে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফেরদের ভালোবাসেন না।[১২৩]

এই আয়াতেও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরে ও সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ফলে কেবল আল্লাহর আনুগত্য করলেই চলবে না, রাসূলেরও আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য অস্বীকার করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, রাসূলের আনুগত্য অস্বীকার করলেও মানুষ অনুরূপভাবে কাফের হয়ে যাবে। আয়াতের শেষাংশে এ কথাই পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের কাফেরদের আল্লাহ কিছুতেই ভালোবাসেন না।

মুসলিম হওয়ার জন্য আল্লাহর আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে এমন তাকীদ করার বিশেষ কারণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কালাম বা বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়াই রাসূলের একমাত্র কাজ নয়। আল্লাহর কালাম ব্যাপক প্রচার করা, লোকদেরক তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া, তার ভিত্তিতে মানুষের মন মগজ চরিত্র ও জীবন গঠন করা এবং সে অনুযায়ী সমাজ গঠন করাও রাসূলের কাজ। তাতে কোনো রকম সন্দেহ নেই।

কুরআ'ন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

'সেই মহান আল্লাহই উম্মি লোকদের প্রতি তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। রাসূল আল্লাহর আয়াতসমূহ তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করে শোনান। তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।[১২৪]

আয়াতে নবী কারীম (সা) এর জন্য তিনটি সুস্পষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রথমত কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা, পাঠ করে লোকদেরকে শোনানো।

দ্বিতীয়: জনমনকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধকরণ, তাদের চরিত্র সংশোধন এবং শিরক ও চরিত্রহীনতার পঙ্কিলতা হতে তাদের পরিশুদ্ধকরণ।

তৃতীয়, আল্লাহর কিতাব ও জরুরী জ্ঞান শিক্ষাদান, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ সাধন ও সুন্নাত শিক্ষা দান।

এখানে আয়াতের তিলাওয়াত, কিতাবের তালিম দেয়া ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি সাধন নিশ্চয়ই এক কাজ নয়। এগুলোর বর্ণনার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই অর্থের তারতম্য অনুসারে এই দুটি স্বতন্ত্র কাজ হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ আয়াত তেলাওয়াত ও কিতাবের তালিম আর তাযকিয়া দুটি আলাদ কাজ, স্বত্রন্ত্র দায়িত্ব।

---

১২৩ আল-কুরআ'ন - ৩ : ৩২

১২৪ আল-কুরআ'ন - ৬২ : ২

সুতরাং কুরআ'ন তেলাওয়াতের সাথে সাথে এর কঠিন পারিভাষিক শব্দসমূহের, নির্দেশিত বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ, সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোর বিস্তৃত রূপদান এবং স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে এর বাস্তব রূপায়ন ও প্রতিষ্ঠা–সবই রাসূলে করীমের দায়িত্ব ও কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে 'কিতাব' ও 'হিকমাত' শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। আল কিতাব অর্থ কুরআ'ন মাজীদ। কিন্তু হিকমত অর্থ কী?

কুরআ'ন মজীদের বহুস্থানে 'হিকমত' শব্দটি 'আল-কিতাব' এর সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। সকল রাসূলকে যেভাবে কিতাব দেয়া হয়েছে সেভাবে হিকমতও দেয়া হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের কথা। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ

'স্মরণ কর, আল্লাহ নবীদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি। ...[১২৫]

আয়াতে উল্লিখিত কিতাব অর্থ যে, আল্লাহর কালাম সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ তাতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। কিন্তু হিকমত শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই কুরআনের চেয়ে ভিন্ন কিছু জিনিস।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী লিখেছেন

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَنَا فِى الْحِكْمَةِ أَنَّهَا الْعِلْمُ بِاَحْكَامِ اللهِ تَعَالىَ لاَ يُدْرِكُ عِلْمُهَا اِلاَّ بِبَيَانِ رَسُوْلِ اللهِ صِلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ الْمَعْرِفَةُ بِهَا وِمَا دَلَّ عَلىَ ذَالِكَ مِنْ نَظَايِرِهِ وَهُوَعِنْدِىْ مِأْخُوْذَةٌ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِىْ بِمَعْنىَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

'হিকমত সম্বন্ধে আমার সঠিক কথা হল, হিকমত হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত ইলম, যা রাসূলের বর্ননা ছাড়া কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয় এবং এর সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম পরিচিতি লাভ করাও হিকমত। এর সাথে সামঞ্জস্যশীল আর যেসব জিনিস দ্বারা তা লাভ করা যায় তাও এর অন্তর্ভুক্ত। আমার মতে হিকমত শব্দটি হাকাম হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকরণ।'[১২৬]

ইমাম শাফেঈ লিখেছেন:

وَسَمِعْتُ مِنْ اَرْضَى مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُوْلُ اَلْحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

১২৫ আল-কুরআ'ন - ৩ : ৮১

১২৬ মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী, *তাফসীরে জামেউল বয়ান আন তা'বীলে আয়িল কুরআ'ন* , মাকতাবা দারুল হিজর লিত তাবাআ ওয়ান নাশর, সৌদী আরব, ২০১০, আল-কুরআ'ন - ৩ : ৮১ এর তাফসীর প্রসঙ্গ।

কুরআ'ন সম্পর্কিত জ্ঞানে সর্বাধিক পারদর্শী অস্থাভাজন বিশিষ্ট লোকদের নিকট আমি শুনেছি, তারা বলেছেন, হিকমত হচ্ছে রাসূলে কারীম (সা) এর সুন্নাত।[১২৭]

অতপর তিনি লিখেছেন;

وَسُنَّةُ الْحِكْمَةِ اُلْقِىَ فِىْ رَوْعِهِ عَنِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

'রাসূলের সুন্নাত হচ্ছে সেই হিকমত যা হযরতের দিল মুবারকে আল্লাহর নিকট হতে উদ্রেক করা হয়েছে।[১২৮]

বস্তুত কুরআ'ন মজীদের যেসব স্থানে 'আল-কিতাব–এর সঙ্গে 'আল-হিকমত' এর উল্লেখ করা হয়েছে সেসব স্থানেই কিতাব অর্থ আল্লাহর নিজস্ব কালাম, যা রাসূল কারীম (সা) এর প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যাতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ-নসীহত বর্ণিত হয়েছে। আর আল-হিকমত অর্থ সেসবের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান এবং সে নির্ভুল জ্ঞান অনুযায়ী সঠিক কাজ। বস্তুত এই নির্ভুল জ্ঞান ও তদনুযায়ী সঠিক কাজ করার যথেষ্ট বুদ্ধি প্রত্যেক রাসূলকেই দেয়া হয়েছে। নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে এটি আল্লাহর স্থায়ী ও নির্বিশেষ নিয়ম।

এই নিয়ম অনুযায়ী সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেও আল-কিতাব কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে 'আল হিকমত'ও দেয়া হয়েছে। কুরআ'ন মজীদের বহু সংখ্যক আয়াতে এটি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের একটি আয়াত হচ্ছে।

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

'হে নবী! আল্লাহ আপনার প্রতি আল কিতাব ও আল হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যেসব কথা জানতেন না, তার শিক্ষা আপনাকে দান করেছেন। আর এটি আপনার প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ।[১২৯]

কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দেয়া এই আল-হিকমত নিশ্চিতরূপে কুরআ'ন হতে এক স্বতন্ত্র জিনিস। এর বিস্তৃত বিবরণ হাদীস সম্পদেই পুঞ্জিভূত রয়েছে। হাদীসকে হিকমত বলার তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি লিখেছেন:

وَاَمَّا السُّنَّةُ فَحِكْمَةٌ فُصِّلَ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

'সুন্নাত বা হাদীসকে হিকমত বলার তাৎপর্য হচ্ছে এর দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। وَبُيِّنَ بِهَا مُجْمَلُ الْقُرْآنِ এবং এর দ্বারা কুরআনের সামষ্টিক কথার বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩০]

---

১২৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আশ-শাফেয়ী, *কিতাবুর রিসালা*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৩৫৮/ ১৯৪০ পৃ-২৮

১২৮ প্রাগুক্ত, পৃ-২৮

১২৯ আল-কুরআ'ন - ৪ : ১১৩

১৩০ আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি, *উমদাতুল কারী শারহে সহীহিল বুখারী*, ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ২০১০, ২খ. পৃ-৬৭

বস্তুত আল হিকমত বা সুন্নাতও যে আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ তা পূর্বোক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বমানবতার পথ-নির্দেশের জন্য এবং হেদায়তের পথে পরিচালনার উরেদ্দশ্যে কেবলমাত্র আল কিতাব নাযিল করাই যথেষ্ট মনে করেন নাই; বরং সেই সঙ্গে রাসূল ও রাসূলের সুন্নাতকেও আল্লাহর তরফ হতে প্রেরণের প্রয়োজন মনে করেছেন। অন্যথায় শুধুমাত্র আল-কিতাব মানুষের প্রকৃত কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারত না।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআ'ন মজীদের -বিশ্লেষণ করাও রাসূলেরই অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নোক্ত আয়াত সুন্নাত বা হাদীসের গুরুত্ব ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'হে নবী! আপনার প্রতি এই কিতাব এই উদ্দেশ্যে নাযিল করেছি যে, আপনি লোকদের জন্য অবতীর্ণ এই কিতাব তাদের সম্মুখে বয়ান করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করবে।[১৩১]

বয়ান করার তাৎপর্য প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে আব্দুল বর বলেছেন: নবী কারীম (সা) এর পক্ষ হতে কুরআনের বয়ান দুই প্রকারে হয়েছে:

প্রথম হচ্ছে, কুরআনের সামষ্টিক কথার। যেমন পাঁচবারের নামায ও সময়। নামাযের সিজদা রুকু ও অন্যান্য হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা। যাকাতের সংজ্ঞা ও আদায়ের সময় বর্ণনা করা, কত পরিমাণ মাল হতে তা গ্রহণ করা হবে তা বলা এবং হজ্জের নিয়ম-প্রণালী বর্ণনা করা। নবী কারীম (সা) যখন হজ্জ করেছিলেন তখন বলেছিলেন: خذوا عنى مناسككم 'আমার নিকট হতে তোমরা হজ্জের নিয়ম কানুন গ্রহণ কর।' এর কারণ হচ্ছে, কুরআ'ন মজীদে তো কেবল, নামায, যাকাত ও হজ্জের মোটামুটি ও সামষ্টিক আদেশ দেয়া হয়েছে। এসবের কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি বা কোনো বিস্তৃত রূপ দাঁড় করানো হয়নি। হাদীসই এই ও বিশ্লেষণ পেশ করে।[১৩২]

আলোচ্য আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য কথা এই যে, জনগণের সম্মুখে কুরআনের বিস্তারিত ও বিশ্লেষণ করাই রাসূলের প্রতি কুরআ'ন নাযিল করার আসল উদ্দেশ্য। কারণ কোনো বিষয়কে সঠিক রূপ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য তিনটি কাজ একান্তই অপহির্য।

প্রথমত, মুখের কথার দ্বারা এর ও বিশ্লেষণ করা, আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপ উদ্ঘাটিত করা।

দ্বিতীয়, নিজ জীবনের কাজকর্ম ও বাস্তব জীবনধারার সাহায্যে তার ব্যবহারিক মূল্য ও গুরুত্ব উজ্জ্বল করে তোলা।

---

১৩১ আল-কুরআ'ন - ১৬ : ৪৪

১৩২ ইবনে আবদুল বর, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*, দারু ইবনুল জাউযী, কায়রো, ২০০৮, ২খ. পৃ-১৯০

তৃতীয়, লোকদের দ্বারা তাকে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা করা। সঠিকরূপে তারা তার মর্মার্থ অনুধাবন ও অনুসরণ করছে কিনা, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা; যাচাই ও পরীক্ষা কার্যে আত্মনিয়োগ করা এবং সঠিকরূপে কার্যকর হতে দেখলে তাকে সমর্থন ও অনুমোদন দান আর কোনোরূপ ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার সংশোধন করা।

নবী কারীম (সা) এর প্রতি কুরআ'ন নাযিল হওয়ার এই উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে যে, তিনি কুরআ'নকে এই তিন তিনটি দিক দিয়ে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জীবদ্দশায় এই দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় ও যথাযথরূপে পালন করেছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন বা করেছেন, তারা নির্ভরযোগ্য রেকর্ডই হচ্ছে হাদীস। অতএব হাদীস যে কুরআ'ন সমর্থিত এবং কুরআ'ন সমর্থন করে না এমন কোনো জিনিস যে হাদীসে পাওয়া যায় না, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। ইমাম শাতেবী লিখেছেন:

فَلاَ تَجِدُ فِيْ السُّنَّةِ اَمْراً اِلاَّ وَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَىَ مَعْنَاهُ

'সুন্নাতে বা হাদীসে এমন জিনিসই পাওয়া যাবে, কুরআ'ন যার পূর্ণ সমর্থন করে। কুরআ'ন সমর্থন করে না এমন কোনো জিনিসই হাদীসে পাবে না।[১৩৩]

রাসূলে কারীম যে কুরআ'ন মজীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের ও বিশ্লেষণ করেছেন তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে হাদীস শরীফের তাফসীর অধ্যায়সমূহ। যেসব আয়াতের সঠিক অর্থ সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারেন নি এবং সে কারণে তারা কাতর হয়ে পড়েছেন। রাসূলে কারীম (সা) সেসবেরও বিশ্লেষণ করে সাহাবাগণের উদ্বেগ দূরিভূত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটির উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোনো প্রকার জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি---'

এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন তা সাহাবাদের পক্ষে বড়ই উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়ে। তাঁরা এর সঠিক তাৎপর্য জানবার জন্য রাসূলের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيُّنَا لَمْ يَلْبَسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি?'

এই প্রশ্ন শুনে রাসূলে খোদা (সা) বুঝতে পারলেন যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট এই আয়াতটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য অনুভূত হয়েছে। তখন নবী কারীম (সা) বললেন:

---

১৩৩ ইবরাহীম ইবনে মূসা আল লাখমী আশ মাতেবী, আল মুওয়াফেকাত ফী উসুলিস শরী'আ, দারুল কুতু আল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৪, ৪খ. পৃ. ১২

لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّوْنَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا قَوْلَ لُقْمَانَ لِاِبْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

'তোমরা যেরূপ ধারণা করেছ আয়াতের অর্থ তা নয়। এখানে জুলুম অর্থ শিরক ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা কী শোন নাই, লোকমান তার পুত্রকে বলেপণন: হে প্রিয় পুত্র, আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয়ই শিরক এক বিরাট জুলুম সন্দেহ নেই।[১৩৪]

রাসূল (সা) এর নিকট এর জানতে পেরেই সাহাবায়ে কেরাম সান্তনা লাভ করেন। এ কারণে কুরআ'ন মজীদের তাত্ত্বিক জানবার জন্যও বিশ্বমুসলিম রাসূলের হাদীসের মুখাপেক্ষী। রাসূলের ব্যতীত কুরআনের সঠিক তাৎপর্য জানবার জন্য নির্ভরযোগ্য অপর কোনো উপায়ই থাকতে পারে না।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ

'হে নবী! আমি আপনার প্রতি এই কিতাব সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহর প্রদর্শিত নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী আপনি লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবেন।[১৩৫]

আল্লাহ তা'আলা কুরআ'ন নাযিল করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, রাসূল কারীম (সা) লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবেন; কিন্তু কোন পদ্ধতিতে তা করবেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে: بما اراك الله যে পদ্ধতি আল্লাহ আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাহলে মূল কিতাবও যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী বিচার ইনসাফ কায়েম করার পদ্ধতিও ওহীর মাধ্যমেই প্রাপ্ত।[১৩৬]এবং এর বিবরণ হাদীসের মারফতই লাভ করা যেতে পারে।

হালাল হারাম নির্ধারণের ভার রাসূল (সা) এর উপর ন্যস্ত

উম্মতের জন্য হালাল হারাম নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে রাসূলে আকরম (সা) এর উপর। রাসূল (সা) এ কাজটি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই আনজাম দিয়েছেন। কুরআ'ন মজীদে বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে:

يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ

'রাসূল ভালো কাজের আদেশ করেন; খারাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখেন; লোকদের জন্য ভালো ও উৎকৃষ্ট জিনিস হালাল করে দেন এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট জিনিস হারাম ঘোষণা করেন।[১৩৭]

---

১৩৪ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, কিতাবুত তাফসীর, পৃ-৮০৮

১৩৫ আল-কুরআ'ন - ৪ : ১০৫

১৩৬ আল্লামা আলুসী বাগদাদী, *তাফসীরে রূহুল মাআনী*, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫, ৫খ. পৃ-১৪০; তাফসীর বায়যাভী, ১খ. পৃ. ২০৫

১৩৭ আল-কুরআ'ন - ৭ : ১৫৭

একই সঙ্গে রাসূল (সা) ঝগড়া বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা) কে মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের চূড়ান্ত মীমাংসাকারী করে পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

'আপনার আল্লাহর শপথ, লোকেরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না যদি না তারা– হে নবী! আপনাকে তাদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারে বিচারক ও সিদ্ধান্তকারীরূপে মেনে নেয়, আপনার ফায়সালা সম্বন্ধে মনে কুণ্ঠাহীনতা বোধ করে এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।[১৩৮]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বুখারী শরীফে যে ঘটনাটির উল্লেখ আছে তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তাতে রয়েছে: হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফুফাতো ভাই হযরত জুবাইর ইবনে আওয়াম এবং জনৈক মদীনাবাসীর মধ্যে পানি সেচ নিয়ে এক মতবিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য তা নবী কারীম (সা) এর কাছে রুজু করা হয়। নবী কারীম (সা) বললেন, তোমার জমিন সেচ করার পর তা তোমার প্রতিবেশির জমির দিকে ছেড়ে দিও। এ কথা শুনে প্রতিবেশী লোকটি বলে উঠল: আপনার ফুফাতো ভাই তো? এ কথা শোনার পর রাগে নবী কারীম (সা) এর চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, জুবায়ের! আইল উপচে ভেসে যাওয়া পর্যন্ত তুমি পানি বন্ধ রাখবে।' (সে কি মনে করেছে যে, আমি পক্ষপাতিত্ব করেছি? হযরত জুবায়ের (রা) বলেন, আমি মনে করি, আয়াতটি এ ঘটনা উপলক্ষেই নাযিল হয়েছে।)[১৩৯]

এ ধরনের আরো একটি ঘটনার উল্লেখ আছে কুরআ'ন মজীদে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

'যখন আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেন, তখন সে ব্যাপারে কোনো মুমিন নর বা নারীর নিজস্ব কোনো এখতিয়ার থাকে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে। সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হয়।'[১৪০]

এ আয়াতখানি নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, রাসূল (সা) জুলাইবিব নামক এক সাহাবীর জন্য এক আনসারী মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করলে মেয়ের পিতামাতা তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন এ

---

১৩৮ আল-কুরআ'ন - ৪ : ৬৫

১৩৯ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, বুখারী তাফসীরে সূরা নিসা

১৪০ আল-কুরআ'ন - ৩৩ : ৩৬

আয়াত নাযিল হয় এবং বলা হয় যে, রাসূল (সা) এর ফয়সালার পর এ বিষয়ে তোমাদের আর কিছু করার নেই।[১৪১]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, বিবাহের প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত করলেন আল্লাহর রাসূল (স্বয়ং আল্লাহ নন) অথচ আল্লাহ বিষয়টিকে নিজের সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করছেন এবং বলছেন যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত করেন। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই সিদ্ধান্ত। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝা গেল যে, নিছক দ্বীনের ব্যাপার কেন অন্য কোনো মোবাহ জাগতিক ব্যাপারেও যদি আল্লাহর রাসূল কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন উম্মত তা মানতে বাধ্য।

রাসূলের আনুগত্যের তাৎপর্য

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলের আনুগত্য মুসলমানদের উপর ফরয হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য হতে দায়িত্বশীল লোকদেরও.....। কোনো বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরাও।[১৪২]

এই আয়াতে তিনটি বিভিন্ন সত্তার আনুগত্য করার স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য, দ্বিতীয় রাসূলের আনুগত্য এবং তৃতীয় মুসলিম দায়িত্বশীল লোকদের আনুগত্য। আল্লাহ ও রাসূলের প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় দু'বারاطيعوا 'আনুগত্য কর' বলার কারণে উভয় আনুগত্যই মৌলিক ও স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্দেশ অনুসারে কুরআ'ন মাজীদ মেনে চললেই আল্লাহর আনুগত্য কার্যকর হতে পারে। কিন্তু 'রাসূলের আনুগত্য কর' এ আদেশ কার্যকর করার কি পথ আছে? এ জন্যে হাদীসকে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় হতে পারে না। পক্ষান্তরে পারস্পরিক বিরোধী বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় আল্লাহর কিতাবের সাহায্য গ্রহণ করলে; কিন্তু রাসূলের অবর্তমানে রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কী উপায় হতে পারে? তার উপায় হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত বা হাদীসকে গ্রহণ করা। তা করা হলেই এই আদেশ পালন করা সম্ভব হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই উল্লিখিত আয়াতের মায়মুন ইবনে মাহরান বলেছেন:

اَلرَّدُّ اِلَى اللهِ وَ اِلَى كِتَابِهِ وَالرَّدَّ اِلَى الرَّسُوْلِ اِذَا كَانَ حَيًّا فَلَمَّا قَبَضَهُ اللهُ فَالرَّدُّ اَلَى سُنَّتِهِ

১৪১ ইমাম ইসমাঈল ইবনে উমর আল কাসীর আদদেমাশকী, *তাফসীরে ইবনে কাসীর (তাফসীরুল কুরআনিল আযীম)* দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ২০০৮; উল্লেখিত আযাতের তাফসীর প্রসঙ্গ

১৪২ আল-কুরআ'ন - ৪ : ৫৯

‘আল্লাহর দিকে ফিরানোর অর্থ আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরানো এবং রাসূলের প্রতি ফিরানোর অর্থ রাসূলে কারীম (সা) এর জীবদ্দশায় তাঁর নিজের নিকট পেশ করা। আর যখন আল্লাহ তাঁর জান কবজ করেন তখন তার বাস্তব অর্থ হয় তাঁর সুন্নাতের দিকে ফিরানো।[১৪৩]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এই আয়াতের প্রসঙ্গে লিখেছেন:

اَلنُّكْتَةُ فِيْ اِعَادَةِ الْعَامِلِ فِى الرَّسُوْلِ دُوْنَ اُوْلِى الْاَمْرِ مَعَ اَنَّ الْمُطَاعَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ هُوَ اللهُ تَعَالىَ كَوْنُ الَّذِىْ يُعْرَفُ بِهِ مَا يَقَعُ بِهِ التَّكْلِيْفُ هُمَا الْقُرْآنُ وْ السُّنَّةُ فَكَانَ التَّقْدِيْرُ اَطِيْعُوا اللهَ فِيْمَا قُضِىَ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فِيْمَا بُيِّنَ لَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا يَنُصُّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ السُّنَّةِ وَالْمَعْنىَ أَطِيْعُوا اللهَ فِيْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ الْمُتَعَبِّدِ بِتِلاَوَتِهِ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فِيْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الْوَحْيِ الَّذِىْ لَيْسَ بِقُرْآنٍ.

‘যদিও একমাত্র আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ তা‘আলা; কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ নতুন করে দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী উলিল আমর اولى الامر এর আনুগত্যের আদেশ দানের পূর্বে আলাদাভাবে اطيعوا ‘আনুগত্য কর’ বলা হয়নি। এর কারণ হল, মানুষ কেবল দু’টি জিনিসই মানতে বাধ্য। তা হল ‘কুরআ’ন ’ ও ‘সুন্নাহ’। কাজেই এখানে অর্থ হবে, যেসব বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে তাতে আল্লাহর আনুগত্য কর আর যা কুরআ’ন হতে জানতে পেরে তোমাদের বলে দেয় হয়েছে এবং যা সুন্নাতের দলীল দিয়ে তোমাদের সামনে প্রমাণ করা হয়েছে তাতে রাসূলের আনুগত্য কর। ফলে আয়াতের মোট অর্থ দাঁড়াল এইরূপ: তেলাওয়াত করা হয় যে ওহী, তাতে তোমাদের যে হুকুম দেয়া হবে তা পলন করে আল্লাহর আনুগত্য কর। আর যে ওহী কুরআ’ন নয়, তা হতে তোমাদের যে হুকুম করা হবে তা পালন করে তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর।’[১৪৪]

আল্লামা তাইয়্যেবী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

اَعَادَ الْفِعْلَ فِيْ قَوْلِهِ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ اِشَارَةٌ اِلىَ اِسْتِقْلاَلِ الرَّسُوْلِ بِالطَّاعَةِ وَلَمْ يَعِدْهُ فِى اُوْلِى الْاَمْرِ اِشَارَةٌ اِلىَ اَنَّهُ يُوْجَدُ فِيْهِمْ مَنْ لاَتَجِبُ طَاعَتُهُ

‘আল্লাহর হুকুম ‘রাসূলের আনুগত্য কর’ কথায় আনুগত্যের আদেশ পুনরাবৃত্তি করার কারণে বুঝা গেল যে, রাসূলে কারীম (সা) স্বতন্ত্র স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী। আর ‘উলীল আমর’ -এর

১৪৩ জামাল উদ্দীন ইবনে আল হাল্লাক আল কাসেমী, *তাফসীরে মাহাসিনুত তা‘বীল*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৩৩২ হিজরি, ১খ. পৃ. ১২৭

১৪৪ প্রাগুক্ত এর বরাতে ফাতহুল ক্বাদীর, ৪খ. পৃ. ৫৩৪

ক্ষেত্রে এই শব্দটি পুনরুল্লেখ না হওয়ায় বুঝা গেল যে, 'উলীল আমর' এমনও হতে পারে, যার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়।'[১৪৫]

রাসূল (সা) এর অমান্যতার অপরাধ

রাসূল (সা) এর অমান্যতা করা হলে তাতে কতখানি অপরাধ হতে পারে সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত হতে অনেক তত্ত্বই জানতে পারা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيۡتُمۡ فَلَا تَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوۡاْ بِٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পর পরামর্শে মিলিত হও তখন গুনাহের কাজ, সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ ও রাসূলের নাফরমানী করার বিষয়ে পরামর্শ করো না; বরং পরমর্শ কর নেক কাজ ও আল্লাহ-ভীতিমূলক কাজ সম্পর্কে। আর আল্লাহক ভয় করে চল। যার নিকট তোমাদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।'[১৪৬]

এই আয়াতে রাসূলকে অমান্য করতে স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একদিকে পাপ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অনানুগত্য বা নাফরমানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অপর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে নেকী ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজের। এর অর্থ এই যে, রাসূলের অবাধ্যতা ও অনানুগত্য করলে যেমন গোনাহ ও সীমালঙ্ঘন করা হয়, অনুরূপভাবে সকল কল্যাণ, নেকী ও আল্লাহ-ভীতি হতেও বঞ্চিত হতে হয়। আয়াতের শেষাংশে পরকালের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, রাসূলকে অমান্য ও অনানুগত্য করলে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ মুসলিম জীবনের এক চিরন্তন কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ

'অতএব তোমরা আল্লাহ এবং তার উম্মী নবীর প্রতি ঈমান আন; যে নবী নিজে আল্লাহ এবং তাঁর বাণীর প্রতি ঈমানদার এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করে চল।'[১৪৭]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দান করে তা পূর্ণরূপে তোমরা গ্রহণ ও ধারণ কর; আর যা হতে নিষেধ করেন, তোমরা তা হতে বিরত থাক। রাসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[১৪৮]

---

১৪৫ প্রাগুক্ত, ৪খ. পৃ. ৩৪৪

১৪৬ আল-কুরআ'ন - ৫৮ : ৯

১৪৭ আল-কুরআ'ন - ৭ : ১৫৮

রাসূলের আদেশ নিষেধ অমান্য বা তাঁর বিরোধিতা করলে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দান করবেন। তিনি বলেছেন:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'রাসূলের আদেশের যারা বিরোধিতা করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর যেন কোনো কঠিন বিপদ অথবা কোনো পীড়াদায়ক আযাব এসে না পড়ে।[১৪৯]

এসব আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বীন সম্পর্কে যা বলেছেন, তা কুরআ'ন রূপে হোক বা সুন্নাহ রূপে হোক, সবই ওহী ও আল্লাহর কথা। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) এর উম্মাতের উপর তার ইতাআত বা আনুগত্য স্বীকার করা, তার সুন্নাতের অনুসরণ করা ফরজ, যেমন আল্লাহর কিতাব কুরআনের অনুসরণ করা ফরজ। বাস্তব জীবনে তাঁকে অনুসরণ করার উপরই মানুষের হিদায়াত ও কল্যাণ লাভ একান্তভাবে নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ

'তোমরা রাসূলের আনুগত্য করলেই হেদায়তপ্রাপ্ত হবে।'[১৫০]

আল্লাহর আনুগত্যও নির্ভর করে রাসূলের আনুগত্যের উপর। অন্য কথায় রাসূলের আনুগত্য না করলে আল্লাহর আনুগত্য সম্ভব হতে পারে না। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে।

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

'যে লোক রাসূলের আনুগত্য করবে সে-ই আল্লাহর আনুগত্য করল।'[১৫১]

আনুগত্যের তাত্ত্বিক কারণ

এই আয়াতে বর্ণিত কুরআনের মূলনীতি অর্থাৎ 'যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে-ই আল্লাহর আনুগত্য করল' এর পেছনে একটি তাত্ত্বিক যুক্তি আছে। আর তা হল, যে কোনো ভাষায় একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। একটি বাক্যও একাধিক ভাব বুঝাতে পারে। কিন্তু কোনো বক্তা বা লেখক তাঁর লেখায় বা বক্তৃতায় উদ্দেশ্যমূলক প্রয়োগ ব্যতিরেকে কখনো শব্দটি বা বাক্যটি দ্ব্যর্থরূপে ব্যবহার করেন না। শব্দ বা বাক্য প্রয়োগকালে তাঁর নিকট একটিমাত্র অর্থ বা ভাবই সুনির্দিষ্ট থাকে। বক্তার মুখভঙ্গি বা পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা শ্রোতা সহজেই তা উপলব্ধি করতে পারে। একইভাবে লেখার সাথে ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁর মতবাদ ও লেখার সাথে সাধারণভাবে যার যাতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে সে-ই ততখানি সহজে লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। বিশেষ করে যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে সে। পক্ষান্তরে এ সকল দিক দিয়ে বক্তা বা লেখকের সাথেও যার যত অধিক

---

১৪৮ আল-কুরআ'ন - ৫৯ : ৭

১৪৯ আল-কুরআ'ন - ২৪ : ৬৩

১৫০ আল-কুরআ'ন - ২৪ : ৫৪

১৫১ আল-কুরআ'ন - ৪ : ৮০

ব্যবধান থাকবে তার পক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য বুঝা ততই কঠিন হবে। তার কাছে লেখকের বাব ক্তার লেখা বা বক্তৃতা অনেক জায়গায় দ্ব্যর্থবোধক হয়ে দাঁড়াবে।

এই সত্য ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে বিচার করলে বলতে হবে যে, আল্লাহর কালামের অর্থ বা উদ্দেশ্য আল্লাহর রাসূলই অধিক বুঝেছিলেন। কেননা, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই তা বলা হয়েছে। অতপর তাঁর সাহাবীগণই তা অধিক বুঝেছিলেন। কারণ, তাঁরা তাঁর হাবভাব লক্ষ্য করেছিলেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কথার মর্মবানী উপলব্ধি করে সাহাবায়ে কেরামের সামনে বা সেই পরিবেশে কথা, কাজ ও সম্মতি দ্বারা অর্থাৎ নিজের বাস্তব জীবন দ্বারা তার উপস্থাপন করেছেন। আর এর নামই সুন্নাহ বা হাদীস। কাজেই সুন্নাহ হল কুরআনের প্রকৃত অর্থ-নির্দেশক বা তার বাস্তব নমুনা। এমতাবস্থায় কারো সুন্নাহ অস্বীকার করার অর্থই হল শরী'আর বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করা। যারা সুন্নাহ অস্বীকার করে কুরআনের অর্থ চর্চা করবে তারা কুরআনের যথেচ্ছ অর্থও করবে। তাদের ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে নানা যুক্তি হাতড়ে বেড়াবে। সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ার এটিই যৌক্তিক কারণ।

ইত্তিবা ও ইতাআতে রাসূলে তফাৎ

আমরা দেখেছি যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করার সাথে সাথে রাসূলেরও আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহর এই আদেশকে সঠিকরূপে অনুধাবন করার জন্য কুরআনে ব্যবহৃত ইত্তিবা ও ইতাআত শব্দদ্বয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ আবশ্যক। এখানে আমরা এই শব্দ দুটি নিয়ে আলোচনা করব।

আরবি ভাষায় ইত্তিবা اتباع বলা হয় কোনো ব্যক্তির পেছনে পেছনে চলাকে। ইবনে মনযুর তার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'লিসানুল আরব' এ বলেছেন

قَالَ الْفَرَا اَلاِتِّبَاعُ اَنْ يَسِيْرَ الرَّجُلُ وَاَنْتَ تُسِيْرُ وَرَاءَهُ وَ اِذَا قُلْتَ اِتَّبِعْتَهُ فَكَاَنَّكَ قَفَوْتَهُ

'ইমাম ফারা বলেছেন, ইত্তিবা বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তি আগে আগে চলে আর তুমি পেছনে পেছনে চল। এখন তুমি যদি বল, আমি তাঁর ইত্তিবা করি, তবে বুঝাবে যে, তুমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পেছনে পেছনে চলছ।[১৫২]

তাজুল আরুস গ্রন্থে বলা হয়েছে:

اَلتُّبَّعُ وَ كَذَالِكَ اَلتُّبَّعُ كَسُكَّرِ الظِّلِّ سُمِّيَ بِهِ لِاَنَّهُ يَتَّبِعُ الشَّمْسِ حَيْثُمَا زَالتْ وَمِنَ الْمَجَازِ اَلتُّبَّعُ ضَرْبٌ مِنَ الْيَعَاسِيْبِ اَعْظَمِهَا وَ اَحْسَنِهَا

১৫২ আল্লামা ইবনে মনযূর আল আফরিকী, *লিসানুল আরব*, দারুল মাআরিফ, বৈরুত, ২০০৭, ৮খ. পৃ-২৮

'তুব্বু বা তুব্বা এর উচ্চারণ সুক্কার এর মতো। এর অর্থ ছায়া। ছায়াকে ছায়া বলার কারণ হচ্ছে তা সবসময় সূর্যের অনুসরণ করে চলে। এ সম্পর্কের দৃষ্টিতে মধুমক্ষিকাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম (পুরুষ) মক্ষিকাকেও তুব্বা বলা হয়। কেননা, সমস্ত সাধারণ মক্ষিকা তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলে।'[১৫৩]

ইমাম আবুল হাসান আল আ মাদী এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন:

وَاَمَّا الْمُتَابِعَةُ فَقَدْ تَكُوْنُ فِى الْقَوْلِ وَقَدْ تَكُوْنُ فِى الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَاِتِّبَاعُ الْقَوْلِ هُوَ اِمْتِثَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ اِقْتَضَاهُ الْقَوْلُ وَالْاِتِّبَاعُ فِى الْفِعْلِ هُوَ التَّأَسِّى بِعَيْنِهِ وَالتَّأَسِّىْ اَنْ تَفْعَلَ مِثْلِ فِعْلِهِ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ اَجَلِهِ

'মুতাবেয়াত বা অনুসরণ কখনো কথার ব্যাপারে হয় কখনো কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে হয়। কথার ব্যাপারে ইত্তিবা' হচ্ছে কথার দাবি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করা। আর কাজের ক্ষেত্রে ইত্তিবা হচ্ছে কারো কাজ দেখে তা এমনভাবে করা যেভাবে সে করছে এবং সে করছে বলেই সে কাজ করা হবে।[১৫৪]

ইতাআত اطاعت শব্দটিও একইভাবে সাপেক্ষ। আরবি ভাষায় ইতাআত বলা হয় কারো সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করাকে বা কারো হুকুম আহকাম যথাযথরূপে পালন করাকে। লিসানুল আরব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَفِى التَّهْذِيْبِ وَ قَدْ طَاعَ لَهُ يَطُوْعُ اِذَا اِنْقَادَ لَهُ بِغَيْرِ اَلْفٍ فَاِذَا مَضَى لِاَمْرِهِ فَقَدْ اَطَاعَهُ

'তাহযীব নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে طاع له يطوع কথাটির অর্থ কারো সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক নত করে দেয়া। কেউ যদি অপর কারো আদেশ পালন করে, তখন বলা হয় قد اطاعه সে তার আনুগত্য করল।[১৫৫]

ইতাআত শব্দের পারিভাষিক অর্থের দিকে তাকালেও আমরা একই ভাবধারা লক্ষ্য করি। ইমাম আবুল হাসান আল 'আ-মাদী বলেছেন:

وَمَنْ اَتَىَ بِمِثْلِ فِعْلِ الْخَيْرِ عَلَى قَصْدِ اِعْظَامِهِ فَهُوَ مُطِيْعٌ لَهُ

'কাউকে বড় জেনে বা বড় হিসেবে তুলে ধরার উদ্দেশে যদি কেউ তার মত কাজ করে তবে সে তার 'অনুগত হল' বলে বলা হয়।

আমরা ইত্তিবা ও ইতাআত শব্দদ্বয় এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এখানে পর্যালোচনা করলাম। এই আলোচনা থেকে যেটি প্রতীয়মান হয় তা হল, রাসূল (সা) এর কথা ও কাজকে পুরোপুরি মেনে নেয়া এবং তার

---

১৫৩ প্রাগুক্ত

১৫৪ ইবনে হাযাম আল আন্দালুসী, *আল এহকামু ফী উসুলিল আহকাম*, দারু ইবনে হাযাম, বৈরুত, ১৪৩৭/২০১৬, ১খ. পৃ-৮৮, ৮৯

১৫৫ আল্লামা ইবনে মনযূর আল আফরিকী, *লিসানুল আরব*, দারুল মাআরিফ, বৈরুত, ২০০৭, ৮খ. পৃ-২৮

যথাযথ পরিপালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য। আর এর নামই হল রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন।

তারপরের কথা হল, রাসূলের যাবতীয় কথা, কাজ ও অনুমোদনের বিবরণ যেহেতু হাদীসের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে সেহেতু দ্বীন-ই-ইসলামে হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই অপরিহার্যতার বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য কুরআ'ন মজীদের একটি আয়াতের ভাষ্যই যথেষ্ট। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।[১৫৬]

হাদীস হল কুরআ'ন মজীদের ব্যাখ্যাতা

কুরআ'ন মাজীদ বুঝতে হলে হাদীসের সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় নেই। কুরআ'ন মজীদের যথাযথ ও অর্থ করা, এর সঠিক উদ্দেশ্য ও ভাবধারা নিরূপণ করা হাদীসের সহায়তা ছাড়া অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে হাদীসই হল কুরআ'ন মজীদের সঠিকতার মুফাসসির বা প্রমাণ। হাদীসের ব্যতিরেকে নিজে নিজে কুরআনের তাফসীর করতে গেলে অবশ্যই বিপথগামী হবে। এ জন্যে নবী কারীম (সা) ইচ্ছামত মনগড়া কুরআনের অর্থ করার ব্যাপারে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন:

مَنْ قَالَ فِيْ الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّءَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত কুরআনের ব্যাখ্যা করে সে যেন জাহান্নামে তার আসন তালাশ করে নেয়। তিরমিযী শরীফে হাদীসটি ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে।'[১৫৭]

হযরত জুন্দুব হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَايِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاءَ

'যে লোক নিজের ইচ্ছামত কুরআ'ন মজীদের অর্থ করে তার ব্যখ্যা নির্ভুল হলেও সে ভুল করে।'[১৫৮]

এর কারণ কী? আমরা জানি নবী কারীম (সা) কুরআ'ন মজীদের বাহক, কুরআ'ন তারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তিনি কুরআ'নকে কেবল মানুষের সামনে উপস্থাপান করেননি। বরং কুরআ'নকে ভিত্তি করে কীভাবে

---

১৫৬ আল-কুরআ'ন - ৩৩ : ৩৬

১৫৭ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, কায়রো, মিসর, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫, আবওয়াবুত তাফসীর

১৫৮ প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৯০৫

জীবনকে সাজানো যায়, অন্যকথায় কুরআ'নকে ভিত্তি করে ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন প্রণালী বাস্তব জীবনে দেখিয়ে গেছেন। এই বাস্তব উদাহরণের নামই হিকমত অন্যকথায় হাদীস। নবী কারীম (সা) নিজেই কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসের যে গুরুত্ব ও ভূমিকা তা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দি করব (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন।

أَلاَ اِنِّى اُوْتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَعْبَانٌ عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهَذاَ الْقُرْأنِ فَمَا وَجَدْتُمْفِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولِ الله كَمَا حَرَّمَ اللهُ.

'সাবধান! আমাকে কুরআ'ন দেয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার মতো আরেকটি জিনিস (দেয়া হয়েছে)। সাবধান সম্ভবত কোনো সুখী ব্যক্তি তার বড়লোকির আসনে বসে বলতে শুরু করবে যে, তোমরা কেবল এই কুরআ'নকেই গ্রহণ কর, তাতে যা হালাল দেখবে তাকেই হালাল এবং যাকে হারাম দেখবে তাকেই হারাম মনে করবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হল, রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষিত হারামের মতোই মাননীয়।'[১৫৯]

এই হাদীসটি সুনানে দারেমীতে ভিন্ন ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে-

لَيُوْشَكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى اَرِيْكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِىْ فَيَقُوْلُبَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ كِتَابَ اللهِ مَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ اِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ اَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ

'সম্ভবত এক ব্যক্তি তার গদীতে হেলান দিয়ে বসে আমার বলা কথার উল্লেখ করবে এবং বলবে: তোমাদের ও আমাদের মাঝে একমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে। তাতে যা হালাল পাব তাকে হালাল মনে করব। আর যা হারাম পাব তা হারাম মনে করব। রাসূল (সা) এরপর বললেন, সাবধান! আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহর নির্দেশিত হারামের মতোই।'[১৬০]

রাসূল (সা) যা কিছু হারাম বা হালাল ঘোষণা করেছেন তা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দিষ্ট হারাম বা হালাল এর মতোই এবং এতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এরপরও কল্পনা বিলাসী তথাকথিত এক শ্রেণির ধার্মিক লোক হাদীস শরীফের গুরুত্বকে অস্বীকার করার জন্য চেষ্টা চালাবে এবং কথায় কথায় এরা ধর্মীয় যুক্তির আশ্রয় নেবে– একথা নবী কারীম (সা) আগে থেকেই জানতেন। যা নবী হিসেবে তাঁর মুজিযার অংশ। তিনি বিষয়টিকে আরেকটি হাদীসে আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। হযরত ইবরাজ ইবনে সারিয়া বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئاً اِلاَّ مَا فِىْ هَذاَ الْقُرْآنِ اِلاَّ وَاِنِّىْ وَاللهِ قَدْ اَمَرْتُ وَ وَعَظْتُ وَ نَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءِ اَنَّهَا لَمِثْلِ الْقُرْآنِ اَوْ اَكْثَرَ.

---

১৫৯ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজা আল-কাযবিনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া, বৈরুত, ২০০৯ খ্রি. পৃ-৩; আবু দাউদ, *কিতাবুস সুন্নাহ*, বাবুন নাহ্য় আনিল জিদাল ফিল কুরআ'ন

১৬০ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান দারেমী, *সুনানে দারেমী*, মদীনা মুনাওয়ারায় মুদ্রিত, ১৩৮৬ হিজরি, পৃ-৭০

‘নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন: তোমাদের একজন তার আসনে বসে কি এ ধারণা করে যে, কুরআনে যার উল্লেখ আছে তা ব্যতীত আল্লাহ তা‘আলা আর কিছু হারাম করেননি? সাবধান! আল্লাহর কসম। আমিও কিন্তু অনেক আদেশ করেছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধ করেছি। আর তাও কুরআনের মতোই মাননীয় কিংবা তার চেয়েও অধিক কিছু।’[১৬১]

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে:

اَلاَ اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ اَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهَذاَ الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ اَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِي وَ لاَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ لاَ لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ اِلاَّ اَنْ يَسْتَغْنِىَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ اَنْ يَقْرَوْهُ فَاِنْ لَمْ يَقْرَوْهُ فَلَهُ اَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قَرَاهُ

‘জেনে রেখ, আমাকে কুরআ’ন দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে তার অনুরূপ (সুন্নাহ)-ও দেয়া হযেছে। আরো জেনে রেখ যে, এমন সময় এসে পৌঁছবে যখন কোনো উদরপূর্ণ বড়লোক তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে বলবে: তোমরা শুধু কুরআ’নকেই গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল জানবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকে হারাম মনে করবে। অথচ আল্লাহর রাসূল যা হারাম করেছেন (অর্থাৎ আমি যা হারাম করেছি) তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ স্বরূপ গৃহপালিত গাধা, শিকারি-দাঁতওয়ালা পশু ও চুক্তিতে আবদ্ধ অ-মুসলামান মুজাহিদদের হারানো বস্তু– তবে হারানো বস্তুর মালিকের তা প্রয়োজন না হলে ভিন্ন কথা, মুসলমানদের পক্ষে হালাল নয় এবং তিনি মুসাফিরের খাবারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক বলে উল্লেখ করেন। অথচ এসব কথা কুরআনে নেই।[১৬২]

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা) উম্মতককে সতর্ক করে বলেছেন:

لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئاً عَلى اَرِيْكَتِهِ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اِتَّبَعْنَاهُ

‘আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদীতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং তার নিকট আমার কোনো কথা পৌঁছবে– যাতে আমি কোনো বিষয়ে আদেশ করেছি বা নিষেধ করেছি, আর সে বলবে: আমি এসব কিছু জানি না। আল্লাহর কিতাবে যা পাব তারই অনুসরণ করব।’[১৬৩]

---

১৬১ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি.

১৬২ আবু দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ সূত্রে ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫

১৬৩ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী সূত্রে ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫

বস্তুত কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসও গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো বিশুদ্ধ হাদীসই কুরআনের খেলাফ হতে পারে না। নিম্নোক্ত একটি হাদীসের ভাষ্য থেকে এ বিষয়টি খুবই পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়। হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) একদিন নবী কারীম (সা) এর একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল।

فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا يُخَالِفُ هَذاَ

'আল্লাহর কিতাব কুরআনে এ সম্পর্কে এমন কথা আছে যা এই হাদীসের বিপরীত।'

তখন সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বললেন:

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تُعْرَضُ فِيْهِ بِكِتَابِ اللهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِكِتَاب اللهِ اَعْلَمُ مِنْكَ

'আমি তোমার নিকট রাসূলের হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি আল্লাহর কিতাবের সাথে তার বিরোধিতার কথা বলছ। অথচ রাসূলে কারীম (সা) আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে তোমার চেয়ে অধিক ওয়াকিবহাল ছিলেন।[১৬৪]

ইসলামের উৎস হিসেবে হাদীসে রাসূলের স্বতন্ত্র মর্যাদা

এসব উদ্ধৃতি ও আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকা এবং হেদায়তের পথে চলার জন্য কুরআ'ন মাজীদকে মেনে চলতে হবে। সেই সাথে নবী কারীম (সা) এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের বাহক হাদীস শরীফকে মেনে চলতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এ মর্মে হযরত নবী কারীম (সা) এর দুটি হাদীসের বাণী এখানে তুলে ধরতে চাই। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন:

إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْشَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِهِمَا أَبَداً كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِيْ وَلَنْ يَتَفَرّقَا حتىَّ يَرِدَا عَلَىَ الْحَوْضِ

'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, এই দুটি অনুসরণ করতে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত (হাদীস) এবং কিয়াতের দিন হাওযে কাওসার–এর উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত উভয় জিনিস কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।[১৬৫]

বিদায় হজ্জের ভাষণেও নবীজি এ কথার পূণর্ব্যক্ত করেছেন: ইতিহাসবেত্তা ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এই ভাষণের উদ্দিষ্ট ভাষ্যটি এরূপ:

---

১৬৪ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান দারেমী, *সুনানে দারেমী*, মদীনা মুনাওয়ারায় মুদ্রিত, ১৩৮৬ হিজরি, পৃ-৭৭

১৬৫ আবু আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাবিয়া ইবনে নাঈম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আল-হাকেম আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০১০, ১খ. পৃ-১৩ হাদীস নং (৪৩২১) দারু কুতনী, হাদীস নং ৪খ. ২৪৫

اَمْرانِ تركتُهُمَا فِيْكُمْ لَنْ تَضِلُّوْاإِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِماَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

'আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস রেখে গেলাম যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে চললে কক্ষণো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।[১৬৬]

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এই ভাষণের ভাষ্য এইরূপ:

আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে গেলাম, যা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী (সা) এর সুন্নাত।[১৬৭]

সীরাতে ইবনে হিশামে বিদায় হজ্জের এই অংশ নিম্নোক্তরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে:

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের নিকট এমন এক সম্পদ রেখে গেলাম, তোমরা যদি তা খুব দৃঢ়তা সহকারে ধারণ কর তবে কখনোই গোমরাহ হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।'

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন এর মজলিসে এক লোক বলল:

كَانَ جَالِسًا وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَا تُحَدِّثُونَا إِلَّا بِالْقُرْآنِ

'আপনি আমাদের নিকট কুরআ'ন ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা করবেন না।'

তখন হযরত ইমরান সে ব্যক্তিকে ডেকে বললেন

فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وُكِّلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَى الْقُرْآنِ أَكُنْتَ تَجِدُ فِيهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَصَلَاةَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا

'তুমি কি চিন্তা করে দেখেছ, তোমাকে ও তোমার সঙ্গী সাথীদেরকে যদি কেবলমাত্র কুরআনের উপরই নির্ভরশীল করে দেয়া হয় তাহলে কি তুমি কুরআনে যুহরের চার রাকাত, আসরের চার রাকাত ও মাগরিবের তিন রাকাত নামাযের উল্লেখ পাবে?'

হজ্জের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন:

أَرَأَيْتَ لَوْ وُكِّلْتَ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَى الْقُرْآنِ أَكُنْتَ تَجِدُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَالطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

---

১৬৬ আবু আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাবিয়া ইবনে নাঈম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আল-হাকেম আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০১০, ১খ. পৃ-১৩

১৬৭ আল্লামা আলুসী বাগদাদী, *তাফসীরে রূহুল মাআনী*, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫, ৫খ. পৃ-১৯৮

'তুমি কি মনে কর যে, যদি তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কেবল কুরআ'ন মজীদের উপর ন্যস্ত করা হয়, তাহলে কি তুমি সাতবার বায়তুল্লাহর তওয়াফ, সাফা মারওয়ার তাওয়াফ, আরাফার ময়দানে অবস্থান করা এবং পাথরকণা নিক্ষেপ করার বিধান দেখতে পাবে?'

তিনি আরো বললেন, কুরআনে চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু

وَالْيَدُ مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ أَمِنْ هَاهُنَا أَمْ هَاهُنَا أَمْ مِنْ هَاهُنَا

'চোরের হাত কোন স্থান হতে কাটতে হবে? এইখান হতে না ঐখান হতে তা কি কুরআনে লেখা আছে?[১৬৮]

এসব রেওয়ায়াত ও বর্ণনা প্রমাণ করে ইসলামী জীবন বিধানে হাদীস ও সুন্নাতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা কতখানি। প্রাথমিক যুগের মনীষীগণ এর গুরুত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করতেন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী সবাই কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসকেও অবশ্য পালনীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মনীষীগণের কিছু উক্তি উদ্ধৃত করতে চাই, যা থেকে হাদীস ও সুন্নাতকে মেনে নেয়ার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন এর প্রসঙ্গ আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তার প্রতি এক ব্যক্তি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলে:

إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنَا بِاَحَادِيْثٍ مَا نَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِى الْقُرْآنِ

আপনারা আমাদের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করেন,যার কোনো মূল ভিত্তি আমরা কুরআনে খুঁজে পাই না। তাতে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে বলেন:

اَوَجَدْتُمْ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذاَ وَ كَذاَ شَاةٌ وَمِنْ كَذاَ وَ كَذاَ بَعِيْراً اَوَجَدْتُمْ هَذاَ فِى الْقُرْأنِ

প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিতে হবে, এত এত (প্রত্যেক চল্লিশটি) বকরীতে একটি বকরী যাকাত দিতে হবে ও এত এত (প্রত্যেক পঁচিশটি) উটে একটি উট দিতে হবে– যাকাতের এই নিসাব কি তোমরা কুরআ'ন মজীদে দেখতে পাও?

তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যাকাত দানের স্পষ্ট নির্দেশ তো কুরআ'ন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে; কিন্তু তার বিস্তারিত বিধান ও ব্যবস্থা কি কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে? সে ব্যক্তি বলল, না তা কুরআনে পাওয়া যায় না। তখন হযরত ইমরান বললেন:

فعمن اخذتم هذا أَخَذْتُمُوهُ عَناَّ وَ اَخَذْناَهُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তা হলে যাকাতের এই বিস্তারিত বিধান তোমরা কার নিকট হতে জানতে পারে? এগুলো সবই তোমরা সাহাবীদের নিকট হতে পেয়েছ। আর আমরা তা আল্লাহর নবীর নিকট থেকে (হাদীসের মাধ্যমে) লাভ করেছি।[১৬৯]

---

১৬৮ আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত খতীব বাগদাদী, *আল কিফায়া ফী ইলমির রিওয়ায়া*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন,১৯৮১, ১খ. পৃ-১২

এই হাদীসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে যে মূলনীতি প্রমাণ করেছেন তা হল:

فَاُصُوْلُ جَمِيْعِ الْمَسَايِلِ ذُكِرَتْ فَى الْقُرْأنِ وَاَمَّا تَفَارِيْعُهَا فَبِبِيَانِ رَسُوْلِ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সমগ্র বিষয়ের মূল বিধান কুরআনে উল্লিখিত; কিন্তু তাদের শাখা-প্রশাখা, খুঁটিনাটি (ও ব্যবহারিক নিয়মনীতি) সবই রাসূলের বর্ণনা হতে জানা গেছে।[১৭০]

মকহুল দামেশকী বলেছেন:

اَلقُرْأنُ اَحْوَجُ اِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ اِلَى الْقُرْآنِ

'কুরআ'ন যতটা হাদীস বা সুন্নাতের প্রতি অধিকতর মুখাপেক্ষী, সুন্নাত কুরআনের প্রতি ততটা নয়।'[১৭১]

ইমাম আওযায়ীও নিম্নোক্ত ভাষায় এ কথা বলেছেন:

اَلكِتَابُ اَحْوَجُ اِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ اِلَى الْكِتَابِ

আল্লাহর কিতাবের জন্য সুন্নাত অধিক দরকারী; কিন্তু সুন্নতের জন্য কুরআনের প্রয়োজন ততটা নয়।'[১৭২]

ইয়াহয়া ইবনে আবি কাসীর বলেন:

اَلسُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ قَاضِيَةٌ عَلَى السُّنَّةِ

'সুন্নাত বা হাদীস কুরআনের তুলনায় অধিক ফয়সালাকারী, কুরআ'ন সুন্নাতের বিপরীত ফয়সালা দিতে পারে না।'[১৭৩]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ দুটি কথার দিতে গিয়ে বলেন:

إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَ تُبَيِّنُهُ

সুন্নত বা হাদীস কুরআনের ও বিশ্লেষণকারী এবং সুন্নাত এর অর্থ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে।[১৭৪]

---

১৬৯ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. বাবু মুতানাজ্জাব ফীহিয যাকাত

১৭০ খলীল আহমদ সাহারানপুরী, *বযলুল মজহুদ ফী হাল্লে সুনানে আবি দাউদ*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৭/ ২০০৬, ৩খ. পৃ-৬

১৭১ ইবনে আবদুল বর, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*, দারু ইবনুল জাউযী, কায়রো, ২০০৮, ২খ. পৃ-১৯১

১৭২ জামাল উদ্দীন ইবনে আল হাল্লাক আল কাসেমী, *তাফসীরে মাহাসিনুত তা'বীল*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৩৩২ হিজরি, ১খ. পৃ-১৯১

১৭৩ ইবনে আবদুল বর, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*, দারু ইবনুল জাউযী, কায়রো, ২০০৮, ২খ. পৃ-১৯১

১৭৪ জামাল উদ্দীন ইবনে আল হাল্লাক আল কাসেমী, *তাফসীরে মাহাসিনুত তা'বীল*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৩৩২ হিজরি, ১খ. পৃ-১৯১

এ বিষয়ে হযরত ওয়ালী উল্লাহ দেহলভীর ভাষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও ও দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলেছেন:

إِنَّ عُمْدَةَ الْعُلُوْمِ الْيَقِيْنِيَّةِ وَرَأْسَهَا وَ مَبْنىَ الْفُنُوْنِ الدِّيْنِيَّةِ وَأَسَاسَهَا هُوَ عِلْمُ الْحَدِيْثِ الَّذِىْ يُذْكُرُ فِيْهِ مَا صَدَرَ مِنْ اَفْضَلِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ مِنْ قَوْلٍ وَ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ فَهِىَ مَصَابِيْحُ الدُّجىَ وَ مَعَالِمُ الْهُدىَ وَ بِمَنْزِلَةِ الْبَدْرِ الْمُنِيْرِ مَنِ انْقَادَ لَهَا وَوَعىَ فَقَدْ رَشَدَ وْاهْتَدَى وَ اُوْتِىَ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ وَمَنْ اَعْرَضَ وَ تَوَلىَّ فَقَدْ غَوىَ وَ هَوَى وَ مَازَادَ نَفْسَهُ اِلاَّ التَّخْسِيْرُ فَاِنَّهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهىَ وَ اَمَرَ وَ نَدَرَ وَ بَشَّرَ وَ ضَرَبَ الْاَمْثَالَ وَ ذَكَّرَ وَاَنَّهَا لَمِثْلِ الْقُرْآنِ اَوْ اَكْثَرَ

'ইলমে হাদীস সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অধিক উন্নত, উত্তম এবং দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তি। হাদীসে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তার সাহাবীগণের থেকে নিসৃত কথা, কাজ ও সমর্থন বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত হাদীস হল অন্ধকারের মধ্যে আলোকস্তম্ভ, এ যেন এক সর্বাধিক উজ্জ্বলকারী পূর্ণ চন্দ্র। যে এর অনুসারী হবে ও একে আয়ত্ব করবে সে সৎপথপ্রাপ্ত হবে। সে লাভ করবে বিপুল কল্যাণ। আর যে একে অগ্রাহ্য করবে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে হবে পথভ্রষ্ট। সে লালসার অনুসারী হবে, পরিণামে সে অধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, নবী কারীম (সা) অনেক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। অনেক কাজের আদেশ করেছেন। পাপের পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, নেক কাজের সুফল পাওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে লোকদের নসীহত করেছেন। অতএব তা নিশ্চয় কুরআনের মতো কিংবা ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ।[১৭৫]

শাহ ছাহেব আরো বলেছেন:

فَاِنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ لِلْكِتَابِ ولاَ تُخَالِفُهُ

সুন্নাত বা হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যাতা এবং তার কিছুমাত্র বিরোধিতা করে না।[১৭৬]

ইমাম আবু হানিফার উক্তিটিও এ প্রমঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

لَوْلاَ السَّنَّةُ مَا فَهِمَ اَحَدٌ مِنَّا الْقُرْآنَ

'সুন্নাত বা হাদীসের অস্তিত্ব না হলে আমাদের মধ্যে কেউ কুরআ'ন বুঝতে পারত না।'[১৭৭]

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কথাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১৭৫শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি. ১খ. পৃ-১

১৭৬ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), *ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ*, মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলভী, ১৩৪৪ হি; পৃ- ১২

১৭৭ আব্দুল ওয়াহহাব শে'রানী, *কিতাবুল মীযান*, মাকতাবা তালীমুল হাদীসা, বৈরুত, ১৮৬১-৬২, পৃ-৫২

عَنْ رَبِيَّةَ قَالَ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ اَنْزَلَ اِلَيْكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَ تَرَكَ فِيْهِ مَوْضِعاً لِلسُّنَّةِ وَ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَرَكَ فِيْهَا مَوْضِعاً لِلرَّأْيِ

'রাবিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা (হে নবী!) আপনার প্রতি কুরআ'ন নাযিল করেছেন অতিশয় বিস্তারিত আকারে। তবে তাতে হাদীস ও সুন্নাতের জন্য একটি অবকাশ রেখে দিয়েছেন। আর নবী কারীম (সা) সেই সুন্নাত ও হাদীস স্থাপন করেছেন আর তাতেও ইজতিহাদ করার বা গবেষণা করে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগও রেখে দেয়া হয়েছে।[১৭৮]

ইমাম উবায়দ লিখেছেন:

وَلاَ بَيْنَ حُكْمِ اللهِ وَ بَيْنَ حَكْمِ رَسُوْلِهِ فِى التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ فَرْقٌ فِى شَيْئٍ وَلاَ كَانَ يَحْكُمُ بِحُكْمٍ يَدُلُّ الْكِتَابُ عَلىَ شَيْئٍ سَوَاهُ وَلَكِنَّ السُّنَّةَ هِىَ الْمُفَسِّرَةُ لِلتَّنْزِيْلِ وَ الْمُوَضِّحَةُ لِحُدُوْدِهِ وَ شَرَائِعِهِ

'আল্লাহ ও রাসূলের হালাল হারাম সম্পর্কিত হুকুমের মধ্যে পার্থক্য নেই। রাসূল এমন কোনো হুকুম দিতেন না, যার বিপরীত কথা কুরআ'ন হতে প্রমাণিত হত। বরং সুন্নাত (হাদীস) হচ্ছে আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের তা এবং কুরআনের আইন-বিধান ও শরী'আর বিশ্লেষণকারী।'[১৭৯]

নবী কারীম (সা) এর হাদীস ও ইজতিহাদের মধ্যে তফাৎ

যারা হাদীসের গুরুত্বকে অস্বীকার করে একমাত্র কুরআ'নকে দ্বীনের মূলনীতি বলে প্রচার করে তারা নবী করিম (সা)-এর কয়েকটি বৈষয়িক সিদ্ধান্ত ও মতামতকে সামনে এনে বলতে চায় যে, হাদীস বা রাসূলের কথা ও কাজ নির্ভুল হতে পারে না। তাদের বিভ্রান্ত প্রচারণার প্রেক্ষিতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা কিতাবে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সারাংশ এখানে উল্লেখ করছি।

নবী কারীম (সা) হতে বর্ণিত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হাদীসসমূহ শরীয়াতী হুকুম গ্রহণের দৃষ্টিতে দুই প্রকারের। রিসালাতের বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলে কারীম (সা) যত কথাই বলেছেন, তা প্রথম প্রকারের। 'রাসূল যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক'– আয়াতটিতে এ প্রকারের হাদীস সম্পর্কেই আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। পরকাল ও মালাকুতী জগতের আশ্চর্যজনক বিষয়াদি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে রাসূল (সা) যা বলেছেন তাও এই প্রকারের অধীন। এই হাদীসসমূহ ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান হতে নিঃসৃত। শরী'আর বিধি-বিধান, ইবাদতের নিয়ম-প্রণালী এবং সমাজ ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনার ও তা পালনের জন্য উৎসাহ দান সম্পর্কিত হাদীসসমূহও এই পর্যায়ের। তবে তার কিছু অংশ সরাসরি ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং কিছু অংশ স্বয়ং নবী করীমের ইজতিহাদ। অবশ্য নবী কারীম (সা) এর ইজতিহাদও ওহীর সমান মর্যাদার। কেননা, নবী বরীম (সা) এর রায় কখনো ভুলের উপর স্থায়ী হয়ে থাকতে পারত না।

---

১৭৮ জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, আদ দুররুল মনসূর ফিত তাফসীরিল মাসূর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪৩২/২০১১, পৃ-৪

১৭৯ আবু উবাইদ আল হারাবী আল বাগদাদী, *কিতাবুল আমওয়াল*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৮/২০০৭, পৃ-৫৪৪

নবী কারীম (সা) এর ইজতিহাদ আল্লাহর হুকুমের উপরই ভিত্তিশীল হতে হবে– এর কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, প্রায়ই এমন হত যে, আল্লাহর তা'আলা তাঁর নবীকে শরী'আর উদ্দেশ্য ও লক্ষ জানিয়ে দিতেন। শরী'প্রণয়ন, তার সহজতা বিধান ও আদেশ নিষেধ নির্ধারণের নিয়ম কানুন শিক্ষা দিতেন, নবী কারীম (সা) ওহীসুত্রে জানা এই আইন ও নিয়ম অনুযায়ী ওহীর সূত্রে লব্ধ উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাখ্যা দান করতেন। তিনি যেসব যুক্তিপূর্ণ কল্যাণময় বিষয় বিনা শর্তে পেশ করেছেন, যার কোনো সময় বা সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি–যেমন উন্নত ও খারাপ চরিত্র–তাও রিসালাতের দায়িত্ব পালন পর্যায়ের এবং তার অধিকাংশই ওহীর উৎস হতে গৃহীত। তা এই অর্থে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে সমাজ ও জনকল্যাণের নিয়ম-কানুন জানিয়ে দিয়েছেন, নবী কারীম (সা) সে নিয়ম কানুন হতে যুক্তি বা দলিল গ্রহণ করেছেন এবং তাকে মূলনীতি হিসেবে পেশ করেছেন। আমলসমূহের ফযিলত, আমলকারীদের গুণ ও প্রশংসামূলক হাদীসও এই পর্যায়ে গণ্য। আমার মতে এর অধিকাংশই ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত। আর কিছু অংশ তার ইজতিহাদের ফসল। দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস রিসালাতের দায়িত্ব পালন পর্যায়ের নয়। রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْهُ وَإِذاَ أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رِأْيِيْ فِإِنَّماَ أَنَا بَشَرٌ

'আমি একজন মানুষমাত্র, অতএব তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমি যখন কোনো জিনিসের আদেশ করি, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে, পালন করবে। আর যদি আমার নিজের মত হতে কোনো কাজের আদেশ করি তবে মনে রাখবে, আমি একজন মানুষমাত্র।'

এ বাণীতে রাসূল কারীম (সা) দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসের কথাই বুঝিয়েছেন। মদীনায় মুসলমানদের অত্যধিক ফসল লাভের আশায় পুরুষ খোরমা গাছের ডাল স্ত্রী খোরমা গাছের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে দেখে তা না করলে কোনো ক্ষতি হবে না' বলে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন:

لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْراً

'তোমরা এটা না করলে সম্ভবত ভালো হত।'

কিন্তু তা না করার দরুন পরবর্তী বছর অত্যন্ত কম পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। তখন নবী কারীম (স) বলেছেন:

فَإِنِّيْ ظَنَنْتُ ظَنًّا وَلاَ تُؤَاخِذُوْنِيْ بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذاَ حَدَثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئاً فَخُذُوْبِهِ فَإِنِّيْ لَمْ اَكْذِبْ عَلَى اللهِ

'আমি একটা ধারণা পোষণ করতাম, এবং তাই তোমাদেরকে বলেছিলাম (ধারণায় ভুল হলে) তোমরা সে জন্য দোষ ধরো না। কিন্তু আমি যখন আল্লাহর তরফ হতে কোনো কিছু বর্ণনা করি, তখন তোমরা তা অবশ্যই গ্রহণ করবে। কেননা আমি আল্লাহ সম্পর্কে কোনো মিথ্যা বথা বলি না।[১৮০]

---

১৮০ উল্লেখিত হাদীসসমূহের সূত্র: মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরাইশী আন- নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, লেবনান ১৯৮৭, দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠা, দ্র.বাবু ওজূবি ইমতিসাল মা কালাহু শারআন দূনা মা যাকারাহু সাল্লার্‌রাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

চিকিৎসা ও দ্রব্যগুণ ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা) যা কিছু বলেছেন, তাও এই পর্যায়ের। তিনি বলেছেন:

عَلَيْكُمْ بِالْاِدْهَامِ الْاَقْرَحِ

'হালকা সাদা কপাল বিশিষ্ট গাঢ় কৃষ্ণ ঘোড়া তোমরা অবশ্যই রাখবে।'

এটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে বলা কথা।

রাসূল (স) অভ্যাসবশত যা করতেন– ইবাদত হিসেবে নয়; কিংবা যা ঘটনাবশত করেছেন, ইচ্ছামূলকভাবে নয়, তার কোনো শরয়ীয়তী ভিত্তি নেই। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এর নিকট একদল লোক হাদীস শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন: আমি রাসূল (সা) এর প্রতিবেশী ছিলাম। তাঁর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত তখন আমাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন, আমি গিয়ে তা লিখে নিতাম। তাঁর অভ্যাস ছিল আমরা যখন দুনিয়ার বিষয় আলোচনা করতাম তখন তিনিও আমাদের সাথে দুনিয়ার বিষয়ে কথা বলতেন। আর যখন পরকালের কথা বলতাম, তিনিও আমাদের সাথে তাই বলতেন। এখন আমি কী তেমাদেরকে রাসূল (সা) এর এসব হাদীস বলব?' এ বর্ণনাটি এ প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়াও রাসূল (সা) এর সময়কালীন আংশিক কল্যাণের জন্য অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমস্ত মানুষের জন্য তা কোনো চিরন্তনী বিধান ছিল না। এর উদাহরণ কোনো বাদশাহ একটি সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করে তার কোনো নিদর্শন ঠিক করে দেয়ার মত। এই দৃষ্টিতেই হয়রত উমর ফারুক (রা) বলেছিলেন:

مَا لَنَا وَالرَّمَلَ كُنَّا نَتَوَالِىْ بِهِ قَوْماً قَدْ اَهْلَكَهُمُ اللهُ

'রমল করার আমাদের কী প্রয়োজন? এটি আমরা এমন এক শ্রেণীর লোকদের দেখানোর জন্য পূর্বে করতাম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন।'

কিন্তু পরে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, রমল করার জন্য অন্য কারণও থাকতে পারে এবং তা কিছুতেই পরিত্যাজ্য নয়।

যুদ্ধের বিশেষ পদ্ধতি এবং বিচার ফয়সালার বিশেষ রীতিনীতি ও ধরণ–ধারন সম্পর্কিত হাদীসসমূহও এই পর্যায়ে গণ্য।[১৮১]

মোটকথা বৈষয়িক ও কারিগরি ব্যাপার সম্পর্কে রাসূল (সা) এর কথাবার্তা সাধারণ মানুষের কথার সমতুল্য। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) এর ভাষায় তা নবী কারীম (সা) এর ইজতিহাদ। নবী কারীম (সা) এই পর্যায়েও অনেক কথাই বলেছেন। আর এ ধরনের সব কথাই যে যথাযথ সত্য প্রমাণিত হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। খেজুর গাছ সম্পর্কিত আরব দেশের প্রচলিত নিয়ম সম্পর্কে রাসূল (সা) এর নিষেধবাণীও এই পর্যায়েরই কথা ছিল। ইমাম নববী এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

---

১৮১ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি. ১ম খ. পৃ-১০২ হতে পরবর্তী

قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلَمْ يَكُنْ هَذاَ الْقَوْلُ خَبْراً وَإِنَّمَا كَانَ ظَنًّا كَمَا بَيَّنَهُ فِيْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ قَالُوْا وَرَأْيُهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أُمُوْرِ الْمَعَاشِ وَ ظَنُّهُ كَغَيْرِهِفَلاَ يَمْتَنِعُ وُقُوْعُ مِثْلِ هَذاَ وَلاَ نَقَصَ فِيْ ذَالِكَ

'বিশেষজ্ঞদের মতে নবীজির এ কথা কোনো বিষয়ে সংবাদ দানের পর্যায়ভুক্ত ছিল না। বরং তা তাঁর একটি ধরণামাত্র ছিল। যেমন এই প্রসঙ্গের হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তারা এও বলেছেন যে, বৈষযিক ব্যাপারে নবী করীমের মত ও ধারণা অন্যান্য মানুষের মত ও ধারণার মতোই। কাজেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া–অবাস্তব প্রমাণিত হওয়া, কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় এবং তাতে কোনো ত্রুটি বা দোষের কারণ নেই।[১৮২]

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইজতিহাদ সম্পর্কে এই কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, যেসব বিষয়ে ওহী নাযিল হয়নি। সেসব বিষয়ে রাসূল কারীম (সা ইজতিহাদ করেছেন। এই ইজতিহাদ যদি নির্ভুল হয়ে থাকে তবে আল্লাহর তা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হতে দিয়েছেন; আর যদি তাতে মানবীয় কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ সে বিষয়ে রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন ও সতর্ক করে দিয়েছেন। কাজেই রাসূলের ইজতিহাদও সুন্নাতের পর্যায়ে গণ্য। হাদীসে এসব ইজাতিহাদের বিরবরণ রয়েছে। অতএব হাদীস ও রাসূলের ইজতিহাদে কোনো মৌলিক পার্থক্য বা বিরোধ নেই।[১৮৩]

কিন্তু, দ্বীন ও শরী'আ সম্পর্কিত ব্যাপারে–আকীদা, ইবাদত, নৈতিক চরিত্র, পরকাল, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিষয়ে, রাসূলে কারীম (সা) যা কিছু বলেছেন, তা সবই ওহীর উৎস হতে গৃহীত, তা চিরন্তন মূল্যমান ও স্থায়ী গুরুত্ব সম্বলিত এবং তা কোনো সময়ই বর্জনীয় নয়।[১৮৪]

হাদীস অমান্যকারী কাফের

ইসলামী জীবন বিধান ও শরী'আর মূলনীতিতে হাদীসের এই গুরুত্বের কারণে ফিকহশাস্ত্রের ইমামগণ একমত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে, হাদীস অমান্যকারী গোমরাহ, ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়া লোক। ইবনে রাহওয়াই বলেছেন:

مَنْ بَلَغَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَبْرٌ يَقِرُّ بِصِحَّتِهِ ثُمَّ رَدَّهُ بِغَيْرِ تَقِيَّةٍ فَهُوَ كَافِرٌ

'যে লোকের নিকট রাসূলে কারীম (সা) হতে কোনো হাদীস পৌঁছল সে তার সত্যতা যথার্থতা স্বীকার করে তা সত্ত্বেও সে যদি কোনোরূপ কারণ ব্যতীত তা প্রত্যাখ্যান করে তা হালে তাকে কাফের মনে করতে হবে।

ইমাম ইবনে হাজম তাঁর আল আহকাম গ্রন্থে লিখেছেন:

---

১৮২ আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইবনে শরফ নববী, *শারহে নববী আলা মুসলিম*, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ২০১০, ২খ. পৃ-২৬৪

১৮৩ মুহাম্মদ মুহাম্মদ আবু যাহও, *আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, ইদারাতুল বুহূস আল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াত ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ১৫

১৮৪ শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি. ১খ. বাবু আকসামি উলুমিন নবীয়্যি (সা)

وَلَوْ اَنَّ اِمْرَاً قَالَ لاَ تَأْخُذْ اِلاَّ مَا وَجَدْنَا فِى الْقُرْآنِ لَكَانَ كَافِراً بِاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ

'কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, আমরা শুধু তাই গ্রহণ করব যা কুরআনে পাওয়া যায় তাছাড়া আর কিছুও গ্রহন করব না তা হলে সে ব্যক্তি গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাফের।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন:

سَيَأْتِىْ قَوْمٌ يُجَادِلُوْنَكُمْ بِشُبْهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنَّ اَصْحَابَ السُّنَّةِ اَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ عزوجل

'খুব শীঘ্রই এমন সব লোক আসবে যারা কুরআনের প্রতি সন্দেহ নিয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করবে, তোমরা তাদেরকে সুন্নাত বা হাদীসের সাহায্যে পাকড়াও কর। কেননা, সুন্নাতের ধারক বা হাদীস বিশারদ মহান আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী।[১৮৫]

আহলে কুরআ'নদের ফিতনা

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের ভবিষ্যতবাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল তার প্রমাণ বর্তমান যুগেও বিদ্যমান। কেননা, বর্তমান যুগে অনেকগুলো ফিতনার মধ্যে একটি জঘন্য ফিতনা হচ্ছে হাদীস অস্বীকার করার ফিতনা। এ যুগের হাদীস অস্বীকারকারীরা স্বয়ং রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পবিত্র সত্তা ও তাঁর হাদীস ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রমণ শুরু করেছে। হাদীস থেকে মানুষকে দূরে সরাতে পারলেই মানুষকে সহজে ইসলাম থেকে বিমুখ করা যাবে। এরা নানাভাবে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের একটি মুখরোচক শ্লোগান হল, সহীহ হাদীস। এরা তাদের মতবাদের বিপক্ষে যাবে এমন সব হাদীসকে যয়ীফ দুর্বল বা মউজু বানোয়াট হাদীস বলে আখ্যায়িত করে। ইসলামী জাহানে প্রামাণ্য সিহাহ সিত্তা বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে বলে যে, বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বুখারী মুসলিমের কোনো হাদীসও তাদের মতবাদের বিপক্ষে গেলে তাকে অস্বীকার করে বা সামনে আনতে রাজি হয় না। যেমন বিদআতে হাসানা ও বিদাআতে সাইয়্যিআ প্রসঙ্গ। বিদাতে সাইয়েআর হাদীস যেমন মুসলিম শরীফে উল্লেখিত বিদাতে হাসনার হাদীসও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। অথচ এরা কেবল বিদাতের কথা বলে বিদাতে সাইয়েআর কথা উল্লেখ করে এবং ইসলামের সবকিছুকে অস্বীকার করে। মাযহাবকেও বিদাতের পর্যায়ে গণ্য করে। তথাকথিত আহলে হাদীসদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে আহলে কুরআ'ন 'রা পুরো হাদীস শাস্ত্রকেই অস্বীকার করে। যার ইঙ্গিত হযরত উমর (রা) এর ভবিষ্যতবাণীর মধ্যে ফুটে উঠেছে। এরা বর্তমান যোগাযোগ মাধ্যমের নানা সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ফেসবুক, ওয়েবসাইট বা ওয়াজ মাহফিল সভা মজলিসের মাধ্যমে তাদের আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা হাদীসের অপব্যাখা করে জনমনে হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। হাদীসকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং বলতে চায় যে, ইসলামের পথে চলার জন্য শুধু কুরআ'নই যথেষ্ট। হাদীস মানার প্রয়োজন নেই। হাদীস বা সুন্নাহ শব্দটি শুনতেই যেন তারা নারাজ।

---

১৮৫ 'আলা উদ্দীন সামারকান্দী, তোহফাতুল ফোকাহা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৫/ ১৯৮৪, ১খ. পৃ-৭

উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে নতুন করে এই ভ্রান্ত মতবাদের উৎপত্তি হয়। তারপর তা পাকিস্তানে জায়গা নেয়। এরপরে ক্রমান্বয়ে তা আরও বিভিন্ন মুসলিম দেশে সংক্রমিত হতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ তাদের জমজমাট কার্যক্রম রয়েছে। এ মতের অনুসারীদের কেউ কেউ ইউরোপ-আমেরিকায় বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের এই বিষাক্ত মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। ফেসবুকে গড়ে তুলেছে বড় একটা গ্রুপ।

এসব হাদীস অস্বীকারকারীর ভ্রান্ত মতবাদের কথা মাথায় রেখে আমরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে এ সত্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে, ইসলামী শরীয়াহর দ্বিতীয় সূত্র হল হাদীস বা সুন্নাহ। কুরআনের পর এমনকি কুরআনের সাথে সাথে হাদীস ও সুন্নাহকে মান্য করতে হবে। কারণ, কুরআ'ন যেমন ওহীযোগে নবী কারীম (সা) এর উপর নাযিল হয়েছে, হাদীসও নবী কারীম (সা) এর কাছে ওহীযোগে নাযিল হয়েছে। পার্থক্য হল, কুরআনের ওহীর ভাব ও ভাষা আল্লাহর আর হাদীসের ওহীর ভাব আল্লাহর যদিও ভাষা রাসূলুল্লাহর। কুরআ'ন মজীদে আল্লাহ পাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى النجم

'এবং তিনি কোনো মনগড়া কথাও বলেন না; তা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'[১৮৬]

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর ফরয করে দিয়েছেন যাতে তারা নবী করিম (সা) এর আদেশ ও ফায়সালার সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আল্লাহ নিজের সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর ন্যস্ত না করে; অতপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।'[১৮৭]

তাতে প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর ফায়াসালাকে মানতে অস্বীকার করে, তার মানে রাসূলের কথা শোনার পর তা অস্বীকার করে তার মধ্যে ঈমানের লেশমাত্র নেই। সে কাফের।

এ কারণে মুসলিম উম্মাহর মাঝে এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে হাদীসের প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করবে অথবা কোনো বাণী রাসূলের বাণী বলে জানা সত্তেও তাকে অস্বীকার করবে সে সন্দেহাতীতভাবে কাফের। ইসলামের কোনো পর্যায়েই সে গণ্য হবে না। আল্লামা সুয়ুতী (র) এ কথাই বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

---

১৮৬ আল-কুরআ'ন - ৫৩ : ৩-৪

১৮৭ আল-কুরআ'ন - ৪ : ৬৫

اعلموا رحمكم الله أنَّ مَن أنكر كون حديث النبى صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف فى الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفرة

'জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। যে ব্যক্তি রাসূলের বাণী তা কথায় হোক বা কাজে হোক, তা শরী'আর দলীল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করবে সে কাফের, ইসলামের গণ্ডি থেকে সে খারিজ এবং ইহুদী নাসারা বা কাফেরদের যে কোনো সম্প্রদায়ের সাথে তার হাশর হবে।'[১৮৮]

আল্লামা ইবনে ওয়াযিরও বলেছেন:

التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح

'রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীসকে তা হাদীস বলে জানা সত্তেও যে অস্বীকার করবে সে পরিষ্কার কাফের।'[189]

চিন্তা করলে সবাই সহজেই বুঝতে পারবে যে, কুরআ'ন করীমে বর্ণিত নির্দেশাবলির বিস্তারিত বিবরণ এবং সুনির্দিষ্টকরণ শুধু রাসূল থেকেই পাওয়া যায়। রিসালাতের যুগে সাহাবায়ে কেরাম এ বিবরণ রাসূল (সা)-এর জবান থেকে লাভ করেছেন। পরবর্তীকালের লোকেরা এ বিবরণ মহানবী (সা)-এর হাদীসসমূহ থেকে লাভ করে যাচ্ছেন। যে ব্যক্তি হাদীসমূহ গ্রহণযোগ্য বলে মান্য করে না, তার কাছে কুরআ'ন করীমের অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলির বিশদ বিবরণ এবং সুনির্দিষ্টকরণের জন্যে কোন উপায় থাকবে না। মহানবী (সা) যেমনিভাবে কুরআনের ভাববস্তুর বর্ণনাদানকারী এবং শিক্ষাদাতা, অনুরূপ তিনি কোন কোন আইন বিধানের প্রণেতাও বটে। কুরআ'ন করীমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ অবস্থান তুলে ধরে বলেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

'(রাসূল) তাদের জন্য পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেন আর এবং অপবিত্র জিনিসগুলোকে তাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেন।'[১৯০]

উদাহরণ স্বরূপ শিকারী পাখী ও শিকারী হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম করেছেন। গর্দভ ও মাটির কীট-পতঙ্গ খাওয়া হারাম করেছেন। আমাদের জন্যে সেগুলোর বিধি-বিধানের জ্ঞান লাভ করা একমাত্র রাসূল (সা)-এর হাদীসসমূহ দ্বারাই সম্ভব।

১৮৮হাফেয জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *মিফতাহুল জান্নাত ফিল ইহতিজাজে বিস সুন্নাহ*, এদারাতুত তাবাআতিল মুনিরিয়া, ১৩৪৭ হিজরি, পৃ-১৪

১৮৯ মুহাম্মদ আবনে ইবরাহীম ইবনে আল ওয়াযিরী, *আল আওয়াসেম ওয়াল কাওয়াসেম ফিয যাব্বে আন সুন্নাতি আবিল কাসেম*, মুদ্রণে মুআসসাসা আর রিসালা, ১৪১২/ ১৯৯২, ২খ. পৃ-২৭৪

১৯০ আল-কুরআ'ন - ৭ : ১৫৭

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের এই গুরুত্বের কারণে সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে সকল যুগে হাদীস শিক্ষা, সংকলন, এবং হাদীসের আলোকে মানব জীবন পরিচালিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে গড়ে উঠেছে হাদীস বিষয়ক সুবিশাল জ্ঞান-ভান্ডার। কিন্তু ইসলামকে সমূলে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত একটি মহল হাদীস শরীফের এই গুরুত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে। তাদেরকে চিন্তা ও অন্যান্য দিক থেকে রসদ যুগিয়েছে কতিপয় ইহূদী-খৃস্টান 'প্রাচ্যবিদ' পন্ডিতগণ। তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে এক শ্রেণির মুসলিম পণ্ডিতও প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তারা

(১) কুরআ'ন কারীমের কিছু আয়াতের সরল অনুবাদ সামনে এনে দাবি করে যে, 'কুরআনেই সব কিছুর বর্ণনা' রয়েছে, কাজেই 'হাদীস' নিষ্প্রয়োজনীয়।

(২) হাদীসের বর্ণনা ও সংকলন বিষয়ক কিছু আপত্তি উত্থাপন করে দাবি করে যে, হাদীসের মধ্যে অনেক জালিয়াতি প্রবেশ করেছে, কাজেই তাঁর উপর নির্ভর করা যায় না।

(৩) কিছু হাদীস উল্লেখ করে হাদীসের মধ্যে বিজ্ঞান বা জ্ঞান বিরোধী কথাবার্তা বা বৈপরীত্য আছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই যে,

(১) হাদীসের উপর নির্ভর না করলে 'কুরআ'ন ' মানাও সম্ভব নয়। কুরআ'ন কারীমে 'সকল কিছুর' বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তা সবই শুধুমাত্র 'মূলনীতি' বা 'প্রাথমিক নির্দেশনা' রূপে। কুরআ'ন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই 'প্রাথমিক নির্দেশ', ব্যাখ্যা ছাড়া যেগুলো পালন করা অসম্ভব। ইসলামের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম 'সালাত' বা নামায। কুরআ'ন কারীমে শতাধিক স্থানে সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু সালাতের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয় নি। বিভিন্ন স্থানে রুকু করার ও সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'যেভাবে তোমাদেরকে সালাত শিখিয়েছি সেভাবে সালাত আদায় কর'। কিন্তু কুরআ'ন কারীমে কোথাও সালাতের এ পদ্ধতিটি শেখানো হয় নি। 'সালাত' বা 'নামায' কী, কখন তা আদায় করতে হবে, কখন কত রাকাআত আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাকাআত কী পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাকাআতে কুরআ'ন পাঠ কিভাবে হবে, রুকু কয়টি হবে, সিজদা কয়টি হবে, কিভাবে রুকু ও সিজদা আদায় করতে হবে.... ইত্যাদি কোনো কিছুই কুরআনে শিক্ষা দেয়া হয় নি। কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশকে আমরা কোনোভাবেই হাদীসের উপর নির্ভর না করে আদায় করতে পারছি না। এভাবে কুরআ'ন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই হাদীসের ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়।

(২) 'ওহী'র মাধ্যমে যে নির্দেশনা মানব জাতি লাভ করে তার বাস্তব প্রয়োগ ও পালনের সর্বোচ্চ আদর্শ হলেন 'ওহী-প্রাপ্ত নবীগণ' ও তাঁদের সাহচর্য প্রাপ্ত শিষ্য বা সঙ্গীগণ। তাঁদের জীবনাদর্শই মূলত অন্যদের জন্য 'ওহী'র অনুসরণ ও পালনের একমাত্র চালিকাশক্তি। এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরা ধর্ম-প্রচারক ও তাঁর শিষ্য, প্রেরিত বা সহচরদের জীবন, কর্ম ও আদর্শকে 'ধর্ম' পালনের মূল উৎসরূপে সংরক্ষণ ও শিক্ষা দান করেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ, ধৈর্য, মানবপ্রেম, আল্লাহর ভয়, সত্যের পথে আপোষহীনতা... ইত্যাদি 'হাদীস' ছাড়া জানা সম্ভব নয়। একজন মুসলমানকে হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন

করার অর্থই হলো তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এতে অতি সহজেই তাঁকে কুরআ'ন থেকে এবং ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়।

হাদীসের উপর নির্ভর না করলে 'কুরআ'ন '-এর পরিচয় লাভ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবন, পরিচয়, বিশ্বস্ততা, সততা, নবুয়ত ইত্যাদি কোনো তথ্যই হাদীসের মাধ্যমে ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তিনি কিভাবে কুরআ'ন লাভ করলেন, শিক্ষা দিলেন, সংকলন করলেন... ইত্যাদি কোনো কিছুই হাদীসের তথ্যাদি ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

কুরআ'ন কারীমে কিছু নির্দেশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। যেমন কোথাও মদ, জুয়া ইত্যাদিকে বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও তা অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কাফির ও অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কোথাও সকল প্রকার বিরোধিতা ও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদীসের নির্দেশনা ছাড়া এ সকল নির্দেশের কোনটি আগে, কোনটি পরে এবং কিভাবে সেগুলো পালন করতে হবে তা জানা যায় না। এজন্য হাদীস বাদ দিলে এ সকল আয়াতের ইচ্ছামত ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ হয়ে যায়।

মূলত এজন্যই ইহূদী, খৃষ্টান, কাদিয়ানী, বাহাঈ প্রমুখ সম্প্রদায় হাদীসের বিরুদ্ধে ঢালাও অপপ্রচার চালান। তাঁদের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহকে কুরআ'ন ও ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। তাঁরাও জানেন যে, হাদীসের সাহায্য ছাড়া কোনোভবেই কুরআ'ন মানা যায় না। শুধুমাত্র সরলপ্রাণ মুসলিমকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই তারা মূলত 'কুরআনের' নাম নেন।

(১) হাদীস সংকলন, লিখন, বর্ণনা ও জালিয়াতি বিষয়ক তাঁদের অন্যান্য আপত্তির বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে হাদীস শাস্ত্রকে এ জাতীয় উপসর্গ থেকে রক্ষার জন্য অতীত যুগের মুহাদ্দিসগণ এমন সতর্কতা, গবেষণা ও যাঁচাই বাছাই করেছেন যা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে দেখা যায় না। হাদীস শাস্ত্রে জারহ ও তা'দিল এর যে সৌধমালা রচিত হয়েছে তা অতুলনীয়। একই উদ্দেশ্যে আসমাউর রিজাল এর বিরাট শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কাজেই কালের পরিক্রমায় সহীহ ও জাল হাদীস এমনভাবে চিহ্নিত হয়েছে যে ব্যাপারে নূন্যতম সংশয়ের অবকাশ নেই।

(২) কোনো কোনো হাদীসের বক্তব্য বিজ্ঞান বিরোধী হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে আমরা বলব যে, সব হাদীসের বা অধিকাংশ হাদীসের বক্তব্য বিজ্ঞান বিরোধী এমন অভিযোগ এ পর্যন্ত কোনো শত্রুর পক্ষ হতেও উত্থাপিত হয়নি। কাজেই দু' একটি হাদীসের বক্তব্য আপাতত বিজ্ঞান বিরোধী মনে হলেও তাতে গোটা হাদীস শাস্ত্রকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ন্যায়নীতির পরিপন্থী। কেউ তো দাবি করতে পারবে না যে, বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কার চূড়ান্ত সত্য। কেননা, কালের পরিক্রমায় বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়। তা ছাড়া যেসব হাদীসের বক্তব্যকে আপাতত বিজ্ঞান বিরোধী মনে করা হয় সেগুলো সম্পর্কেও মুসলিম মনীষীগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাজেই ছোটখাট আপত্তির ভিত্তিতে কিছুতেই বিশাল হাদীস ভাণ্ডার বা ইসলামের অন্যতম প্রধান উৎসকে অস্বীকার করার পেছনে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

হাদীস সংকলনের বিবরণ

আমরা হাদীস ও সুন্নাহর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এর আগে কুরআ'ন মজীদের হেফাযত কীভাবে হল তাও জেনেছি। এখন আমরা হাদীস বা সুন্নাহ কীভাবে গ্রন্থিত হল তার উপর আলোকপাত করব। নবী করিম (সা)-এর যমানায় ও সাহাবীদের যুগে হাদীস সংরক্ষণের জন্যে ৩টি পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম পদ্ধতি: হাদীসের বর্ণনা মুখস্থকরণ

হাদীস সংরক্ষণের প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে হাদীসসমূহ মুখস্থকরণ। আর এ পদ্ধতি সে যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ছিল। আরববাসীকে মহান আল্লাহ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দান করেছেন। তারা শুধুনিজেদেও বংশ তালিকা নয়; বরংনিজেদের অশ্বগুলোর বংশতালিকাও মুখস্থ করে নিত। এক এক ব্যক্তির হাজার হাজার কবিতা মুখস্থ থাকত। অনেক সময় কোন কথা শুধু একবার শুনে বা দেখে পুরোপুরি মুখস্থ করে নিত। ইতিহাসে এর অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। এর মধ্য থেকে দু'একটি এখানে বর্ণনা করা হলো।

১. *সহীহ আল-বুখারী* শরীফে হযরত জা'ফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আয-যামরী বর্ণনা করেন, আমি একদিন ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খেয়ারের সাথে হযরত ওয়াহশী (রা)-এর সাক্ষাতে যাই। ওবায়দুল্লাহ (রা) ওয়াহশী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে চিনেন? তখন ওয়াহশী (রা) বললেন, আমি তোমাকে তো চিনি না। তবে আমার এতটুকু স্মরণ আছে, আজ থেকে অনেক বছর পূর্বে আমি একদিন আদী ইবনুল খিয়ারের নিকট গিয়েছিলাম। সেদিন আদীর বাড়িতে এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আমি সে সন্তানটিকে চাদরে আবৃত করে তার ধাত্রী মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সন্তানটির সারা দেহ ছিল আবৃত। আমি শুধু পাগুলো দেখেছিলাম। সে সন্তানটির পায়ের সাথে তোমার পাগুলোর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।[১৯১]

ভাবনার বিষয় হচ্ছে, যে জাতি এত সাধারণ কথাগুলো এমন দৃঢ়তার সাথে স্মরণ রাখতে পারে, সে জাতি হযরত মুহাম্মদ -এর বাণীসমূহ ও কর্মসমূহ স্মরণ রাখতে কতই না তত্ত্বাবধান করে থাকবে। বিশেষ করে যখন সেটাকে তারা নিজেদের জন্যে মুক্তির পথ মনে করেন। তা ছাড়া যখন মহানবী -এর এ ইরশাদ তাদের সম্মুখে এসে পৌঁছে ছিল-

نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا

'আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সজীব সম্মানিত করুন, যে আমার বাণীগুলো শ্রবণ করবে, অতঃপর মুখস্থ করবে, সংরক্ষণ করবে এবং তা অপরের কাছে পৌঁছে দেবে, যেমনিভাবে সে শুনেছে।'[192]

---

১৯১ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ৫খ. পৃ. ১০০

১৯২ আল-বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি./ ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), **মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার**, জামিয়াতুদ দারাসাত আল-ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি ১খ. পৃ. ১০৯; আল-খতীব তাবরীযী, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে

এর দ্বারা প্রমাণিত হল, সাহাবায়ে কেরাম মুখস্থকরণের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণে বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন।

২. হাফেযুল হাদীস ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকলানী (র) *আল-ইসাবা* গ্রন্থে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে ডেকে নিয়ে হাদীস বর্ণনা করে যেতে আবেদন করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাকে অনেক হাদীস শোনান। একজন লেখক সেগুলো লিখে যেতে থাকেন। অবশেষে হযরত আবু হুরায়রা (রা) সেখান থেকে প্রস্থান করেন। আবদুল মালেক পরবর্তী বছর তাঁকে আবার ডেকে আনেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বললেন, যে হাদীসগুলো আপনি গত বছর লিখিয়েছিলেন, সে হাদীসগুলো ক্রমিক অনুসারে আমাদেরকে শোনান। তিনি শোনানো আরম্ভ করলেন। লেখক নিজ লেখার সাথে সেগুলো মিলিয়ে নিচ্ছিলেন। কোন জায়গায় একটি বর্ণ, একটি বিন্দু বা একটি ফলারও ব্যতিক্রম হয়নি। ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ আগেরটাই ছিল।[১৯৩]

এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলি প্রমাণ কওে যে, আল্লাহ তা'আলা এসব মনীষীকে এরূপ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি শুধু হাদীস সংরক্ষণের জন্যই দান করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এরূপ স্মৃতিশক্তি হাদীসের জন্য এমনই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, যেরূপ নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হাদীস লিপিবদ্ধকরণ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : কর্মে পরিণতকরণ

হাদীস সংরক্ষণের দ্বিতীয় পদ্ধতি, যা সাহাবায়ে কেরাম (রা) অবলম্বন করেছিলেন, তা ছিল বাস্তবকর্মে পরিণতকরণ অর্থাৎ তাঁরা মহানবী (সা)-এর কথা ও কর্মসমূহ হুবহু কাজে পরিণত করত আত্মস্থ করে ফেলতেন। অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা কোন কাজ করে বলতেন,

هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَفْعَلُ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ করতে দেখেছি।'[১৯৪]

এ পদ্ধতি অতীব নির্ভরযোগ্য ছিল। কেননা যে কথার ওপর মানুষ নিজে আমল করে, সেটা স্মৃতিতে প্রস্তরাংকিত চিত্রের মতো বদ্ধমূল হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খ্রি., ১খ. পৃ.৭৮, সুনানে তিরমিযী, ৫খ. পৃ. ৩৪; সুনানে আবু দাউদ, ৩খ. পৃ-৩২২; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১খ. পৃ-৮৪

১৯৩ আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজার আল-আসকালানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯৫, ১খ. পৃ. ৭২

১৯৪ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ২খ. পৃ. ১৭৯, হাদীস : ১৭৫২

তৃতীয় পদ্ধতি : লিপিবদ্ধকরণ

লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে হাদীস লিপিবদ্ধকরণকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. বিক্ষিপ্তভাবে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ।

২. ব্যক্তিগত খাতায় হাদীস সংকরন, যা বর্তমান সময়ের ব্যক্তিগত নোটের সাথে তুলনীয়।

৩. হাদীসসমূহ পুস্তকাকারে অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্তকরণ ছাড়াই সংকলন করা।

৪. হাদীসসমূহ পুস্তকাকারে অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে সংকলন করা।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং সাহাবীদের যুগে হাদীস লিপিবদ্ধকরণের প্রথম দুই পদ্ধতি ভালোভাবে প্রচলিত ছিল।

হাদীস অস্বীকারকারীরা রিসালাতের যুগে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ স্বীকার করেন না। তারা *সহীহ মুসলিম* প্রভৃতিতে বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন,

لَا تَكْتُبُوْا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ

'তোমরা আমার কাছ থেকে শুনে কিছুই লিখো না। কুরআ'ন বহির্ভূত কিছু কেউ লিখে থাকলে সে যেন তা অবশ্যই মুছে ফেলে।'[১৯৫]

হাদীস অস্বীকারকারীদের বক্তব্য হলো, মহানবী (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধকরণ থেকে নিষেধ করা একথারই প্রমাণ বহন করে, সে যুগে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তা ছাড়া এতে এও প্রমাণিত হয়, মহানবী (সা)-এর হাদীসসমূহ কোন দলিল নয়। অন্যথায় তিনি যত্নের সাথে সেগুলো লিপিবদ্ধ করাতেন, কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, হাদীস লিপিবদ্ধকরণের এ নিষেধাজ্ঞা ইসলামের শুরুতে ছিল। এর কারণ সে সময় পর্যন্ত কুরআ'ন কারীম একক গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। বরং বিক্ষিপ্তভাবে সাহাবীগণের কাছে লিপিবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে সাহাবায়ে কিরামও তখন পর্যন্ত কুরআ নিক রীতিনীতির সাথে পুরোপুরি পরিচিত হননি, যা দিয়ে তাঁরা কুরআ'ন ও কুরআনের মাঝে প্রথম দর্শনেই পার্থক্য করে নিতে পারেন। এসব পরিস্থিতিতে যদি হাদীসসমূহও লিপিবদ্ধ করা হত, তা হলে সেগুলো কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। এ আশংকা সম্মুখে রেখে এর পথরোধের জন্যে মহানবী হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু যখন সাহাবায়ে কেরাম কুরআনিক রীতিনীতির সাথে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে গেলেন, তখন তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতিও দিয়েছিলেন। এরূপ কতিপয় ঘটনা হাদীস গ্রন্থসমূহে লিখিত রয়েছে। এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

১. *জামে' তিরমিযী*তে ইমাম তিরমিযী (র) ইলমের আলোচনা সংবলিত অধ্যায়সমূহে بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْهِ শিরোনামে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় স্থাপন করেছেন। তাতে তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন,

---

১৯৫ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরাইশী আন- নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, লেবনান ১৯৮৭, ৪খ. পৃ. ২২৯৮

كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ الْـحَدِيْثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَسْمَعُ مِنْكَ الْـحَدِيْثَ فَيُعْجِبُنِيْ وَلَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ اسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِّ.

'তিনি বলেন, আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে বসে থেকে তাঁর হাদীসগুলো শ্রবণ করতেন। সেগুলো তাঁর কাছে চমৎকার মনে হত; কিন্তু তিনি শ্রুত হাদীসগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারতেন না। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে এ অভিযোগ পেশ করে বললেন, হে রাসূল! আমি আপনার কাছ থেকে হাদীস শুনে থাকি এবং সেগুলো আমার কাছে দারুণ ভালো লাগে; কিন্তু সেগুলো আমি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তুমি তোমার ডানহাত দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর।' এরপর তিনি তাঁর হাত দ্বারা একটি রেখা টেনে দিলেন অর্থাৎ হাদীস লেখার দিকে ইঙ্গিত করলেন।'[১৯৬]

২. ইমাম আবু দাউদ (র)নিজ *সুনানে* এবং ইমাম হাকেম (র) *মুসতাদরাক* গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন,

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ^ أُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِيْ قُرَيْشٌ وَقَالُوْا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُوْلُ اللهِ بَشَرٌ يَّتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى ، فِيْهِ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনতাম এবং তা থেকে যা স্মরণে রাখার ইচ্ছ করতাম তা লিখে রাখছিলাম। অতপর কুরাইশের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল যে, তুমি যা কিছু শুনো তাই কি লিখে রাখ, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মানুষ এবং রাগের বশে ও সন্তুষ্ট অবস্থায় তিনি কথা বলে থাকেন। এরপর আমি লেখা থেকে বিরত হলাম। বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থাপন করলাম। তিনি তার আঙ্গুলী দ্বারা নিজের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তুমি লিখতে থাক। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার এই প্রাণ নিবদ্ধ, আমার ভেতর থেকে সত্য ছাড়া আর কিছু বের হয় না।'[১৯৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন,

قَيِّدُوا الْعِلْمَ قُلْتُ وَمَا تَقْيِيْدُهُ قَالَ كِتَابَتُهُ.

---

১৯৬ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, কায়রো, মিসর, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫,৫খ. পৃ. ৩৯

১৯৭ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. ৩খ. পৃ. ৩১৮; মুসতাদরাকে হাকীম, ১খ. পৃ. ১৮৭

'তোমরা জ্ঞানকে আবদ্ধ করে নাও।' আমি বললাম, সেটা কীভাবে আবদ্ধ করা যায়? তিনি বললেন, 'লিপিবদ্ধ করে নেয়া।''[198]

خَطَبَ فَذَكَرَ القِصَّةَ فِي الْـحَدِيْثِ قَالَ أَبُوْ شَاهٍ اكْتُبُوْا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ وَفِي الْـحَدِيْثِ قِصَّةٌ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ». اللهِ

'হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সা) একবার খুতবা প্রদান করলেন। অতপর হাদীসের পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক পর্যায়ে আবু শাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা আমার জন্য কিছু একটা লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। এই হাদীসে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এই হাদীস হাসান সহীহ।'[১৯৯]

এ প্রকারের হাদীসসসূহ লিখিতকারে হাদীস সংরক্ষণ করার সুস্পষ্ট প্রমাণ। হাদীস লিপিবদ্ধকরণে নিষেধাজ্ঞা অপর কোন প্রাসঙ্গিক কারণে ছিল। সে প্রতিবন্ধকতা যখন উঠে গেল, তখন তার অনুমোদন শুধু নয়, বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

আল্লামা নববী (র) হাদীস লিপিবদ্ধকরণের নিষেধাজ্ঞার আরেকটি দিক উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, সাধারণভাবে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ কোন কালেই নিষিদ্ধ ছিল না। বরং কোন কোন সাহাবী এরূপ করতেন যে, কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধকরণের সাথে সাথে মহানবী -এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তার সাথে লিখে ফেলতেন। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কুরআনের আয়াতসমূহের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা ছিল। এজন্যে শুধু এ পদ্ধতির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। কুরআ'ন থেকে পৃথক করে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা কখনোই ছিল না। ইমাম নববী (১)-এর এ মন্তব্য অতি যুক্তিযুক্ত।

১. **আস-সহীফাতুস সাদিকা** *মুসনদে আহমদে* বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হাদীসের যে সংকলন তৈরি করেন, তার নাম রেখেছিলেন, **اَلصَّحِيْفَةُ الصَّادِقَةُ** *আস-সহীফাতুস সাদিকা*। সাহাবীদের যুগে হাদীস বিষয়ক সংকলনসমূহের মধ্যে এটি ছিল সবচে বড়। এর হাদীসসমূহের পুরো সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি, কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর এক বর্ণনা দ্বারা এর ওপর কিছুটা আলোকপাত হয়। বর্ণনাটি *সহীহ বুখারী*তে রয়েছে। তিনি বলেন,

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّيْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

---

১৯৮ আবু আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাবিয়া ইবনে নাঈম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আল-হাকেম আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০১০, ১খ. পৃ-১৮৮

১৯৯ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ৩খ. পৃ. ১২৫, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, কায়রো, মিসর, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫, ৫খ. পৃ. ৩৯

‘নবী -এর কোন সাহাবীই তাঁর থেকে শ্রুত হাদীস আমার চাইতে বেশি সংগ্রহকারী ছিলেন না। তবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর ব্যতিক্রম। তিনি আমার চাইতে বেশি হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এর কারণ তিনি হাদীস লিখতেন আর আমি লিখতাম না।’[২০০]

এতে বোঝা গেল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর হাদীসসমূহ হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসসমূহ থেকে অধিক ছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫ হাজার ৩৬৪ অথবা ৫ হাজার ৩৭৪। সঠিক অভিমত দ্বিতীয়টিই। সুতরাং ইবনে আমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ নিশ্চয়ই এর চাইতে অধিক হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর বাণী আবু দাউদ (র) ও হাকেম (র)-এর সূত্রে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন,

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ أُرِيْدُ حِفْظَهُ.

‘আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে যা শুনতাম, তা সব লিখে নিতাম।’[২০১]

একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ, যা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেগুলোর সংখ্যা হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে কম, তাহলে হযরত আবু হুরায়রা (রা) কীভাবে বললেন, আমার চাইতে তাঁর অধিক হাদীস সংগৃহীত আছে? এই প্রশ্নের জবাব হল, এমন নয় যে, সংগৃহীত সব হাদীস অন্য লোকদের কাছে বর্ণনাও করে থাকবেন তা আবশ্যক নয়।

ঘটনা হলো, হযরত আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন পবিত্র নগরী মদীনায়। মদীনা ছিল সেকালে ইলমে দ্বীনের কেন্দ্র। এ জন্যে তিনি হাদীস বর্ণনার অধিকতর সুযোগ লাভে সক্ষম হয়েছেন। এর বিপরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সিরিয়ায় ছিলেন। হাদীসের ছাত্রদের সিরিয়ায় পৌঁছা ততটা সম্ভব হয়নি, যতটা মদীনায় সম্ভব হয়েছে। এজন্যে অধিক সংখ্যক হাদীস সংগ্রহে থাকা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যার চেয়ে কম।

আস-সহীফাতুস সাদিকা সেকালে বিশালতর হাদীস সংকলন ছিল, যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখতেন। মৃত্যুর পর এ সহীফা তাঁর প্রপৌত্র হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা)-এর নিকট স্থানান্তরিত হয়। যিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ সনদে হাদীস বর্ণনা করতেন। এমনটি হাফেযুল হাদীস ইমাম ইবনে হাজার আল-আকসলানী (র) *তাহযীবুত তাহযীব* গ্রন্থে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র) ও আলী ইবনুল

২০০আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, *সহীহ আল বুখারী*, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ৩খ. পৃ. ১২৫, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, কায়রো, মিসর, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫, ৫খ. পৃ. ৩৯,

২০১ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. ৩খ. পৃ. ৩১৮; আবু আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাবিয়া ইবনে নাঈম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আল-হাকেম আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০১০, ১খ. পৃ-১৮৮, ১খ. পৃ. ১৮৭

মাদীনা (১)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তারা বলেন, যে হাদীস عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ এ সনদে আসবে, তা সম্পর্কে বুঝতে হবে, সেটি *সহীফায়ে সাদিকার* হাদীস।

২. সহীফায়ে আলী (রা) صَحِيْفَةُ عَلِيٍّ رَضِىْ اللهُ عَنْهُ *সুনানে আবু দাউদে* হযরত আলী (রা)-এর এ উক্তি বর্ণিত আছে,

مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কুরআ'ন ও এ সহীফায় যা আছে, তা ব্যতীত আর কিছুই লিখতাম না।'[২০২]

এ বর্ণনা *সহীহ আল-বুখারীতে* চার জায়গায়, *সহীহ মুসলিমে* দু' জায়গায়, *সুনানে নাসায়ী*, *সুনানে তিরমিযীতেও* সংকলিত হয়েছে। হযরত আলী (রা)-এর সহীফা তাঁর তরবারির খাপে আবদ্ধ থাকত। উক্ত বর্ণনার কতিপয় শব্দ দ্বারা জানা যায়, এতে দিয়াত, মা'আকিল, ফিদয়া, কিসাস, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের বিধান, যাকাতের নিসাব এবং পবিত্র মদীনা সম্মানিত হওয়া সম্পর্কিত মহানবী -এর বাণী লিপিবদ্ধ ছিল।

৩. **(কিতাবুস সাদাকা) كِتَابُ الصَّدَقَةِ** এটি ছিল সেসব হাদীসের সংকলন, যা মহানবী স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন। এতে যাকাত, সাদাকা ও উশর প্রভৃতির বিধি-বিধান ছিল। *সুনানে আবু দাউদ* থেকে জানা যায়, এ কিতাবটি তিনি নিজে গভর্নরদের কাছে প্রেরণের জন্যে লিখিয়েছিলেন, কিন্তু গভর্নরদের কাছে পাঠানোর আগেই তাঁর ওফাত হয়। মহানবী -এর পর এ কিতাবখানি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে ছিল। পরে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়। এরপর তাঁর পুত্রদ্বয় হযরত আবদুল্লাহ (রা) ও ওবায়দুল্লাহ (রা)-এর নিকট স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর তাঁদের কাছ থেকে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এটি লাভ করলে এর অনুলিপি করান। তাঁর নিকট থেকে এটি হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র)-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়। হযরত সালেম (র) থেকে ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (র) সেটা হিফয করেন এবং অন্যদেরও পড়ান।[২০৩]

৪. সুহুফু আনাস ইবনে মালিক (রা) صُحُفُ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হযরত মা'বাদ ইবনে হিলাল (র) বলেন,

كُنَّا إِذَا أَكْثَرَنَا عَلَى ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَحَالًا عِنْدَهُ فَقَالَ هَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ فَكَتَبْتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ.

২০২ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. ২খ. পৃ. ২১৬

২০৩ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. ২খ. পৃ. ৯৮

'আমি যখন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট বেশি বেশি যেতাম, তখন তিনি আমাকে কিছু লেখা বের করে দেখান। অতঃপর বলেন, এটা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি, অতঃপর লিখে নিয়েছি এবং তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেছি।'[২০৪]

মুসতাদরাকে হাকেম সূত্রে উক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আনাস (রা)-এর নিকট হাদীসের কয়েকটি সংকলন ছিল।

৫. সহীফাতু আমর ইবনু হাযম (রা) صَحِيْفَةُ عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ যখন মহানবী আমর ইবনে হাযম (রা)-কে নাজরানের গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন, তখন একটি সহীফা তাঁকে দিয়েছিলেন। এটি মহানী -এর বিবিধ হাদীস সংবলিত ছিল। এটিকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। *সুনানে আবু দাউদ* প্রভৃতিতে এ সহীফার যে উদ্ধৃতিগুলো এসেছে, সেগুলো থেকে জানা যায়, তাতে তাহারাত, সালাত যাকাত, হজ্জ ও ওমরা, জিহাদ, সিয়ার ও মাগানিম (গনীমতের মাল) প্রভৃতি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬. সহীফাতু ইবনে আব্বাস (রা) صَحِيْفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ *তাবাকাতে ইবনে সা'দ* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস হযরত কুরাইব ইবনে আবু মুসলিমের ঘটনা লিখিত আছে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কিতাবসমূহের এত বিশাল এক ভাণ্ডার পেয়েছিলেন, যা পুরো এক উষ্ট্রীর বোঝা ছিল।

৭. সহীফাতু ইবনে মাসউদ (রা) صَحِيْفَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) নিজ গ্রন্থ *জামিউ বয়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি*তে লিখেছেন,

عَنْ مَعْنٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كِتَابًا وَّحَلَفَ لِىْ إِنَّهُ خَطُّ أَبِيْهِ بِيَدِهِ.

'হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একটি ছোট্ট পুস্তক বের করে বললেন, আমি শপথ করে বলছি, এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর লিখিত।'[২০৫]

৮. সহীফাতু জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) صَحِيْفَةُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ *সহীহ মুসলিমে* বর্ণিত আছে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হজ্জের বিধি-বিধানের ওপর একটি পুস্তিকা সংকলন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) *আত-তারীখুল কবীর* গ্রন্থে হযরত মা'মার (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে,

২০৪ আবু আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাবিয়া ইবনে নাঈম নিশাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আল-হাকেম আলাস সহীহাঈন*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০১০, ১খ. পৃ-১৮৮, ৩খ. পৃ. ৬৬৪

২০৫ইবনে আবদুল বর, *জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি*, দারু ইবনুল জাউযী, কায়রো, ২০০৮, ২খ. পৃ-১৯০, ১খ. পৃ. ৩১১

وعَنْ مَعْمَرَ قَالَ رَأَيْتُ قَتَادَةَ قَالَ لسَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ أمسك علَيَّ الْـمَصْحَفَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَلَمْ يُخِطِ حَرْفًا فَقَالَ يَا أَبَا النَّضَرِ لَأَتِيَنَا لَصَحِيْفَةَ جَابِرٍ إِحْفِظْ مِنِّيْ لَسُوْرَةَ الْبَقَرَةِ.

'হযরত মা'মার (রা) বলেন, আমি কাতাদা (রা)-কে দেখেছি তিনি সাঈদ ইবনে আরূবাকে বলেন, আমার সামনে মাসহাফ (কুরআ'ন শরীফ) রাখ। অতঃপর তিনি সুরা আল-বাকারা পড়েন, পড়ায় একটি অক্ষরও ভুল করেননি। অতঃপর বলেন, হে আবু নযর (সাঈদ ইবনে আরুবা) আমার জন্য হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সহীফা আন, আর তুমি আমার নিকট হতে সুরা আল-বাকারা মুখস্থ কর।'[২০৬]

৯. صَحِيْفَةُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সহীফাতু সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হাফেযুল হাদীস ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকলানী (র) *তাহযীবুত তাহযীব* গ্রন্থে লিখেছেন, সুলাইমান ইবনে সামুরা (রা) তাঁর পিতা সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে এক বিরাট পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) বলেন,

اَلرِّسَالَةُ الَّتِيْ كَتَبَهَا سَمُرَةُ لِأَوْلَادِهِ يُوْجَدُ فِيْهَا عِلْمٌ كَثِيْرٌ.

'সামুরা (রা) তাঁর সন্তানদের জন্য যে পুস্তিকা লিখেছেন, তাতে অনেক ইলম পাওয়া যায়।'

১০. صَحِيْفَةُ سَعَدِ بْنِ عُبَادَةٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (সহীফাতু সা'দ ইবনে উবাদা (রা) ইমাম ইবনে সা'দ (র) *তাবাকাত* গ্রন্থে লিখেন, হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) একটি সহীফা বিন্যস্ত করেন। এতে অনেকগুলো হাদীস সংকলিত ছিল।

১১. صُحُفُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (সুহুফু আবী হুরায়রা (রা) ইমাম হাকেম (র) মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে আমর (র)-এর ঘটনা লিখেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সম্মুখে একটি হাদীস বর্ণনা করলাম। সে হাদীস সম্পর্কে 'কিছুই জানেন না' প্রকাশ করলেন। আমি আরজ করলাম, আমি তো এ হাদীস আপনার কাছেই শুনেছি। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, যদি এ হাদীস আমিই বর্ণনা করে থাকি তা হলে অবশ্যই আমার কাছে লিখিত থাকবে। সে মতে তিনি কয়েকখানা খাতা বের করে আনেন, যেগুলোতে অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। এ খাতাগুলোতে অনুসন্ধান করা হলে আলোচ্য হাদীসটি পাওয়া যায়।

এতে জানা গেল, হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে তাঁর বর্ণিত সমগ্র হাদীস লিখিতভাবে বিদ্যমান ছিল। এতে ৫ হাজার ৩৬৪ হাদীসের লিখিত সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু এর ওপর প্রশ্ন আরোপিত হতে পারে যে আগে তো হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর এ বাণী অতিক্রান্ত হয়েছে, আমি হাদীসসমূহ লেখতাম না' উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা হলে এ বর্ণনার ব্যাখ্যা কী দাঁড়ায়? এর উত্তর হল, হযরত আবু হুরায়রা (রা) রিসালাতের যুগে এবং

২০৬ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, *আত-তারীখুল কবীর*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ২০০৯, খ. ৭, পৃ. ১৮৫

খলীফাগণের প্রাথমিক যুগে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করতেন না, কিন্তু শেষ বয়সে মনে করে থাকবেন, কখনো যেন আমি এ বর্ণনাগুলো ভুলে না বসি। সে জন্যে তিনি নিজের মুখস্থকৃত হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেন।

১২. মুসনদু আবী হুরায়রা (রা) مُسْنَدُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইমাম ইবনে সা'দ (র) *তাবাকাত* গ্রন্থে লিখেছেন,

أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ، كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْـحَضْرَمِيِّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ بِحِمْصَ سَبْعِيْنَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ قَالَ لَيْثٌ وَكَانَ يُسَمِّى الْـجُنْدَ الْـمُقَدَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ بِمَا سَمِعَ مِنَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ^ مِنْ أَحَادِيْثِهِمْ إِلَّا حَدِيْثَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا.

'হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর বাবা আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান মিসরের গভর্নর থাকাকালে কাসীর ইবনে মুররা আল-খাযরামীকে চিঠি লিখলেন, আপনার কাছে সাহাবীদের বর্ণনাকৃত যতগুলো হাদীস আছে, সেগুলো আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। তবে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসগুলো ছাড়া। কেননা সেগুলো আমার কাছে আছে। এতে জানা যায়, হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসগুলো তাঁর নিকট লিখিতরূপে বিদ্যামন ছিল।'[২০৭]

১৩. মুআল্লাফু বাশীর ইবনে নুহাইক (র) مُؤَلَّفُ بَشِيْرِ بْنِ نُهَيْكٍ বশীর ইবনে নুহাইক (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর ছাত্র। ইমাম দারেমী (র) লিখেন, তিনি বলতেন,

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ هَذَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ.

'আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে যা কিছু শুনতাম তা লিখে নিতাম। পরবর্তীতে আমি এ সংকলন হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর খেদমতে উপস্থাপন করে নিবেদন করলাম, এ হচ্ছে সেসব হাদীস যা আমি আপনার কাছ থেকে শুনেছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ, সঠিক বলেছ।'[২০৮]

১৪. সহীফাতু আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান (র) صَحِيْفَةُ عَبْدِ الْـمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ পিছনে আলোচনা এসেছিল, আবদুল মালেক (র) ইবনে মারওয়ান (রা) পরীক্ষাবশত হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে ডেকে নিয়ে তাঁর হাদীসের কিছু বর্ণনা লিখে নিয়েছিলেন।

---

২০৭ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, ২০০৮, খ. ৯, পৃ. ৪৫০

২০৮আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনদে আহমদ*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি., ১খ. পৃ. ৪৩৫; মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, ২০০৮, খ. ৯, পৃ. ২২২

১৫. সহীফাতু হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (র) صَحِيْفَةُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ হযরত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (র) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বিখ্যাত ছাত্র। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর হাদীসসমূহের একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। হাজী খলীফা (র) তাঁর *কাশফুয যুনূন* নামক গ্রন্থকারদের চরিতাভিধান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে এর নাম *আস-সহীফাতুস সহীহা* বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) স্বীয় মুসনদে এ সহীফাখানা পুরো বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে উক্ত সহীফার সূত্রে বহু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তিনি যখন কোন হাদীস উল্লেখ করতেন তখন বলতেন,

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ

"হযরত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি তা (সহীফা) হতে হাদীসসমূহ উল্লেখ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন।'

সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল পূর্বে এ সহীফার মূল পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এর একটি পাণ্ডুলিপি জার্মানীর বার্লিন গ্রন্থাগারে রয়েছে। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটি সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের মাজমাউল ইলমী নামক গ্রন্থাগারে বিদ্যমান রয়েছে। মহানবী -এর জীবনচরিত ও ইতিহাসের প্রখ্যাত গবেষক ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ এ উভয় পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে নিয়ে এ সহীফাখানি প্রকাশ করেছেন। এতে একশ আটত্রিশটি হাদীস রয়েছে। *মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল* (র)-এর সাথে যখন এটি মিলিয়ে নেয়া হয়েছে, তখন কোথাও একটি বর্ণ অথবা একটি বিন্দুতেও পার্থক্য প্রমাণিত হয়নি।

এ কয়েকটি উদাহরণ একথা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট যে, রাসূল এবং সাহাবীগণের যুগে হাদীস লিপিবদ্ধকরণের প্রথা খুব ভালোভাবেই প্রচলিত হয়েছিল। এখানে শুধু বৃহৎ সংকলনগুলোর উল্লেখ করা হলো। এ ছাড়া রাসূলে কারীম ব্যক্তিগতভাবে যে চিঠিপত্রগুলো লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, অথবা কাউকে কোন কথা লিখিয়ে দিয়েছিলেন অথবা ফরমানসমূহ জরি করেছিলেন, সেগুলো এর বাইরে। বৃহৎ গ্রন্থরাজিতে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

সরকারি পর্যায়ে খলীফাত্রয়ের যুগে হাদীস সংকলন ও সম্প্রচারের সেরূপ সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, যেরূপ কুরআ'ন সংকলনের বেলায় হয়েছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারূক (রা) উভয়ে নিজ নিজ শাসনামলে এ সংকল্প করলেন যে, কুরআ'ন করীমের মতো হাদীসসমূহের একটি সংকলনও সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হোক, কিন্তু তাঁরা এ কাজ থেকে বিরত থাকেন। কারণ সে সময় পর্যন্ত গ্রন্থাকারে কুরআ'নুল করীমের একটি সংকলন সরকারি তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। যদি হাদীসের কোন সংকলনও এভাবে তৈরি হত, তাহলে সেটার প্রতি পরবর্তীকালের মুসলমানদের ভক্তি-শ্রদ্ধার মাত্রা কুরআনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যেত। এ ছাড়া আশঙ্কা ছিল, মানুষ কুরআ'ন করীমের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে হাদীসের সংরক্ষণ ও সম্প্রচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ত। এ আশঙ্কার বহিঃ প্রকাশ হযরত ওমর (রা) এ শব্দাবলির মাধ্যমে করেছেন,

إِنِّيْ كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّيْ ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوْا قَبْلَكُمْ كَتَبُوْا كُتِبًا فَأَكَبُّوْا عَلَيْهَا وَتَرَكُوْا كِتَابَ اللهِ.

'আমি মহানবী -এর হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম, কিন্তু তখন তোমাদের পূর্ববর্তী এক জাতির কথা আমার স্মরণ পড়ল, যারা কতিপয় পুস্তক রচনা করে সেগুলো রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর কিতাব ছেড়ে দিয়েছিল।'[২০৯]

হাদীস সংরক্ষণে হযরত আলী (রা)-এর অবদান

হযরত আলী (রা) প্রাথমিক যুগে অধিক হাদীস বর্ণনা করার বিরোধী ছিলেন। এমনকি নিজের লিখিত হাদীসের সহীফাখানাও মানুষকে কালেভাদ্রে দেখাতেন, কিন্তু তাঁর শাসনামলে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক কপটের নেতৃত্বে সাবায়ী ফিতনার অভ্যুদয় ঘটে। এটা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের একটি গভীর ষড়যন্ত্র। তারা মুসলমানদের মাঝে কলহের বীজ বপন করত ইসলামকে নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। এ লক্ষ্যে তারা দু'টি কাজ এক সাথে শুরু করে। একটি হল, মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিরূপ বিদ্রোহী করে তোলা। দ্বিতীয়ত মিথ্যা হাদীস গড়ে নিয়ে একটি নতুন মতবাদ সৃষ্টি করা। প্রথম পদক্ষেপে সাহাবীদের ব্যাপারে মুসলমানদের বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তখনই হযরত আলী (রা) এক ঘোষণা জারি করেছিলেন, যা ইবনে সা'দ প্রমুখ উদ্ধৃত করেছেন। তা হল,

قَاتَلَهُمُ اللهُ أَىْ عَصَابَةٌ بَيْضَاءُ سَوَّدُوْا وَأَىَّ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَفْسِدُوْا.

'আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কেমন বর্ণচোরা লোক এরা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কেমন কেমন হাদীস তারা নষ্ট করে দিয়েছে।'[২১০]

হযরত আলী (রা) এ ফেতনার পথ রোধের উদ্দেশেও এক দিকে সাহাবীদের মর্যাদা সম্প্রচার করেন, অপর দিকে হাদীসের ব্যাপারে কর্মপন্থা পরিবর্তন করে ফেলেন এবং প্রচুর পরিমাণে হাদীস বর্ণনার পন্থা বেছে নেন। ইবনে সা'দের উক্তি অনুযায়ী এই কর্মপন্থা ছিল, তিনি মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করতেন এবং বলতেন,

من يشترى علمى بدرهم فذهب الحارث فاشترى صحيفة فجاء بها إلى على فأملى عليه

'এক দেরহামের বিনিময়ে কে আমার জ্ঞান খরিদ করবে? অতপর হারেস আল আওয়ার এক দিয়ে একটি খাতা খরিদ করলেন এবং তা আলীর কাছে নিয়ে এলেন। অতপর আলী (রা) তাতে অনুলিখন করান।'[211]

---

২০৯ আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল বায়হাকী, *আল-মদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা*, দারুল খোলাফা লিল কিতাবিল ইসলামী, বৈরুত, ২০১৫, ১খ. পৃ. ৪০৭

২১০ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, দায়েরাতুল মাআরেফ আল-উসমানিয়া, ২০০৯, ১খ. পৃ. ১৫

২১১ আবু হাফস উমর ইবনে শাহীন, তারিখু আসমাইস সেকাত, দারুস সালফিয়া, কুয়েত, ১৯৮৪, ৭খ. পৃ-২৮২

অনুরূপ হযরত আলী (রা) সহীহ হাদীসসমূহ অধিক মাত্রায় বর্ণনা করে সাহাবীদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনার বিষয়গুলো মোকাবিলা করেন। যার দরুন তাঁর শিষ্যগণের কয়েকজনের কাছে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহের বিপুল সংগ্রহ ছিল।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর শাসনামলে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর শাসনামল পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধকরণ দু'পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু এখন হাদীস যথারীতি সংকলনের সময় এসে গেছে। কেননা এখন কুরআ'ন করীমের সাথে হাদীসের সংমিশ্রিত হবার আশঙ্কা নেই। তাই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মদীনার বিচারপতি আবু বকর ইবনে হাযম (রা)-এর নামে এক চিঠি লিখে নির্দেশ দিলেন,

انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّيْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

'রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যেসব হাদীস রয়েছে সেগুলোর প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে ফেলুন। কেননা আমি ইলম বিলোপ এবং আলেম-ওলামার অন্তর্ধানের প্রবল আশঙ্কা করছি।'[২১২]

ইমাম মালেক (র)-এর মুয়াত্তায়ও এ পত্র সম্পর্কে বর্ণনা আছে। এতে মহানবী (সা)-এর হাদীসসমূহের সাথে সাথে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত তথা আদর্শ সংকলনের নির্দেশও উল্লিখিত আছে। উক্ত কিতাবে এ নির্দেশ মদীনার বিচারপতির নামে লিখিত হওয়ার কথা উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু হাফেযুল হাদীস ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকলানী (র) *ফাতহুল বারী*তে হাফেয আবু নুআইম আল-আসবাহানী (র)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এ পত্র শুধু মদীনার বিচারপতির নামে নয়, বরং সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের বিচারপতিদের নামে প্রেরিত হয়েছিল। পত্রের ভাষা ছিল, كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِلَى الْآفَاقِ. 'ফরমানটি উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র) সাম্রাজ্যের দিগ-দিগন্তে লিখে পাঠান।'[২১৩]

এতে বোঝা যায়, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)নিজ শাসনাধীন পুরো সাম্রাজ্যে বৃহৎ মাত্রায় হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষে নিম্নোদ্ধৃত হাদীস গ্রন্থাবলি সংকলিত হয়।

১. কুতুবু আবী বকর (র) كُتُبُ أَبِيْ بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ বিচারপতি আবু বকর (র)-কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আবদুল বার হাযম (র) স্বীয় কিতাব *আত-তামহীদে* ইমাম মালেক (র) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, হযরত আবু বকর (র) হাদীসের কয়েকটি কিতাব সংকলন করেন, কিন্তু সেগুলো

---

২১২ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ১খ. পৃ. ৩১

২১৩ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, দারুল কুতুবিস সালাফিয়া, কায়রো ২০১৫, ১খ. পৃ. ১৯৫; তারীখু আসবাহান, ১খ. পৃ. ৩৬৬

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট প্রেরণ করেন নি। কেননা এরি মধ্যে তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন।

২. রিসালাতু সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ফিস সাদাকাত رِسَالَةُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ হাফেয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (র) *তারীখুল খোলাফা* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এ পুস্তিকাখানা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর ফরমান অনুযায়ী লিখিত হয়েছিল।[২১৪]

৩. দাফাতিরুয যুহরী (র) دَفَاتِرُ الزُّهْرِيْ رَحِمَهُ اللهُ আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) *জামিউ বায়ানিল ইলম ও ফযলিহি* গ্রন্থে ইমাম যুহরী (র)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) আমাদের হাদীস বা সুন্নাহগুলো সংকলনের নির্দেশ দেন। তখন আমরা বিরাট বিরাট ভলিউম লিখে ফেললাম। হয়ত সেকালে ইমাম যুহরী (র)-এর চাইতে অধিক হাদীস সংকলনের খেদমত কেউ বেশি করেননি। ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) সাম্রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে সেই বিশাল ভলিউম থেকে একটি করে পাঠিয়ে দেন।

৪. কিতাবুস সুনান লি-মাকহূল (র) كِتَابُ السُّنَنِ رَحِمَهُ اللهُ এ কিতাবখানি ইমাম ইবনে মাকহূল (র) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ কিতাব সংকলিত হওয়ার ফলে প্রকারান্তরে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ কাজ চতুর্থ পর্যায়ে প্রবিষ্ট হয়। আল্লামা ইবনে নদীম *আল-ফেহরিস্ত* গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। দৃশ্যত এ কিতাবখানিও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর ফরমান তা'মীল করতে গিয়ে লিখিত হয়েছিল। কেননা হযরত মাকহূল (র) তখন বিচারপতি ছিলেন।

৫. আবওয়াবুশ শা'বী (র) أَبْوَابُ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ এটি হযরত আমের ইবনে শুরাহবীল (র)-এর সংকলন। হাফেয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (র) *তাদরীবুর রাবী* নামক হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, এটি হচ্ছে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হাদীস শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ। হযরত ইমাম শা'বী (র) যেহেতু কুফায় হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) কর্তৃক নিযুক্ত বিচারপতি ছিলেন সেহেতু এ গ্রন্থখানিও তাঁর ইশারায়ই সংকলিত হয়ে থাকবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর ইন্তিকাল ১০১ হিজরী সনে হয়েছিল। অতএব উপর্যুক্ত কিতাবগুলো এর পূর্বেই সংকলিত হয়েছিল।[২১৫]

---

২১৪ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তারিখুল খোলাফা*, ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শাউনিল ইসলামিয়া, কাতার, ২০১৫, পৃ. ১৭৩

২১৫ মুহাম্মদ তকী উসমানী, *দরসে তিরমিযী*, মাকতাবা দারুল উলুম, করাচি, ২০১৪

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংকলন

প্রথম হিজরী শতাব্দী ছিল অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হাদীস সংকলনের সূচনাকাল। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংকলনের কাজ আরো অধিক জোরালোভাবে শুরু হয়। এ যুগে যেসব হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল, সেগুলোর সংখ্যা বিশেরও অধিক। তন্মধ্যে কতিপয় বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে,

كِتَابُ الْآثَارِ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (ইমাম আবু হানিফা (র) সংকলিত কিতাবুল আসার) এ গ্রন্থে হাদীসমূহ ফিকহী বিন্যাসে বিন্যস্ত করা হয়। হাদীস শাস্ত্রে এ গ্রন্থের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। তিনি ৪০ হাজার হাদীসের মধ্য থেকে বাছাই করে এ কিতাবখানি সংকলন করেন। *আল-মুয়াফিক* নামক পুস্তকে একথার উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটির কয়েকটি অনুলিপি রয়েছে। যথা- (১) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বর্ণনাসূত্রে লিখিত, (২) ইমাম আবু ইউসূফ (র)-এর বর্ণনাসূত্রে লিখিত, (৩) ইমাম যুফার (র)-এর বর্ণনাসুত্রে লিখিত।

এ কিতাবখানি কালের দিক থেকে ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র)-এর *মুয়াত্তা* কিতাবটির চেয়ে অগ্রবর্তী। এও প্রমাণিত আছে, ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) ইমাম আবু হানিফা (র)-এর রচনাবলি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এজন্যে এ কিতাবখানি স্বীয় সংকলন পদ্ধতিতে ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র)-এর *মুয়াত্তা* নামক কিতাবখানির মূল উৎসের মর্যাদা রাখে। অনেক আলেম *কিতাবুল আসার* গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন। এর সনদে আগত ব্যক্তিগণের জীবনকথা নিয়ে অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে হাফেয ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকলানী (র) অন্যতম।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সরাসরি সংকলিত গ্রন্থ হলো *কিতাবুল আসার*। এছাড়া *মুসনদে আবী হানিফা (র)* নামে যেসব কিতাব পাওয়া যায়, সেগুলো স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (র)-এর নয়, বরং তাঁর পরবর্তীতে অনেক মহাত্মা *মুসনদে আবু হানিফা* নামে বহু গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁদের মাঝে হাফেয ইবনে কিদাহ (র), হাফেয আবু নুআইম (র), হাফেয ইবনে আদী (র) ও হাফেয ইবনে আসাকির (র) বিখ্যাত। পরে আল্লামা খারিযমী (র) এ সকল মুসনদ একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করেন। এটি *জামিউ মাসানীদিল ইমামিল আযম (র)* নামে খ্যাত।

- ইমাম মালেক (র)-এর মুয়াত্তা اَلْمُوَطَّأُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ গ্রন্থটিকে সেকালে আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলা হত। এরপর *সহীহ আল-বুখারী* এ মর্যাদা লাভ করে। কেননা এতে *মুয়াত্তার* প্রায় সকল হাদীস অপরাপর অসংখ্য হাদীসের সাথে বিদ্যমান রয়েছে।
- আল জামে' লিমা'মার ইবনে রাশেদ (র)' اَلْجَامِعُ لِمَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ رَحِمَهُ اللهُ তিনি ইমাম মালিক (র)-এর সমকালীন। সে যুগে এ কিতাবখানি অনেক জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজকাল এটি দুষ্পাপ্য।
- সুফিয়ান আস-সাওরী (র)-এর জামে' اَلْجَامِعُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ইমাম শাফিয়ী (র) এ গ্রন্থ হতে সাহায্য গ্রহণ করেছেন।
- ইবনে জুরাইজ (র)-এর আস-সুনান اَلسُّنَنُ لِابْنِ جُرَيْجٍ رَحِمَهُ اللهُ একে *সুনানু আবিল ওয়ালীদ* বলা হয়।
- ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র)-এর সুনান اَلسُّنَنُ لِوَكِيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ رَحِمَهُ اللهُ
- আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র)-এর কিতাবুস যুহদ كِتَابُ الزُّهْدِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ رَحِمَهُ اللهُ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস শরীফ সংকলন

এ শতাব্দীতে হাদীস সংকলনের কাজ যৌবনকালে উপনীত হয়। হাদীসের সনদগুলোর বহর প্রলম্বিত হয়। এক একটি হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়। জ্ঞানের প্রসারতার ফলে হাদীস শাস্ত্রের ওপর কিতাবাদি নতুন নতুন বিন্যাস রীতিতে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়ে বাস্তব রূপ লাভ করতে থাকে। হাদীস গ্রন্থাবলি বিশের অধিক প্রকারে বিভক্ত হয়ে যায়। আসমাউর রেজাল (চরিতাভিধান) শাস্ত্র যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করল। এ বিষয়েও কতকগুলো কিতাব লিখিত হয়। এ যুগেই হাদীস শাস্ত্রের ছয়টি বিশুদ্ধতম গ্রন্থ 'সিহাহ সিত্তা' সংকলিত হয়।

مُسْنَدُ أَبِيْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ رَحِمَهُ اللهُ মুসনদে আবী দাউদ আত-তায়ালিসী (র) তিনি হচ্ছেন, সেই আবু দাউদের অগ্রবর্তী, যাঁর সুনান সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন মনীষীর মন্তব্য হচ্ছে, এ গ্রন্থখানি মুসনদ গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্ব প্রথম। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, সর্ব প্রথম মুসনদ হচ্ছে *মুসনদু ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা*। আবু দাউদ আত-তায়ালিসী (র) যদিও তাঁর অগ্রবর্তী, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে খোরাসান প্রদেশের অধিবাসী জনৈক আলেম তাঁর মুসনদ বিন্যস্ত করেন।

مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল (র) একে অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ মুসনদ বলা হয়েছে। এতে প্রায় ৪০ হাজার হাদীস রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ৭ লাখ হাদীস থেকে এগুলো বাছাই করেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)নিজ জীবনে এসব হাদীস সংকলন করে রেখেছিলেন, কিন্তু অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে যেতে পারেননি। তাঁর স্বনামধন্য পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (র) সেগুলো অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেন। তিনি এতে প্রায় ১০ হাজার হাদীস সংযোজন করেন। তাঁর পরে আবু বকর হাফেয কাতীয়ী (র)ও এতে কিছু সংযোজন করেন। এগুলোকে *যিয়াদাতুল মুসনদ* বলা হয়। *মুসনদে আহমদ* গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও যরীফ সব ধরনের হাদীসই আছে। এতে কোন জাল হাদীস আছে কিনা সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। দীর্ঘকাল পর কোন হাদীসবেত্তা মনীষী *মুসনদে আহমদ* ফিকহ গ্রন্থের বিন্যাস অনুযায়ী অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেন।

مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَاقِ رَحِمَهُ اللهُ মুসান্নাফু আবদির রায্যাক (র) আগেকার দিনে মুসান্নাফ শব্দটির প্রয়োগ সেই পারিভাষিক ভাবার্থের ওপরই হত, আজকাল যার জন্যে আস-সুনান শব্দটি প্রচলিত রয়েছে। এ মুসান্নাফ গ্রন্থখানি ইমাম আবদুর রায্যাক ইবনুল হুমাম আল-ইয়ামানী (র)-এর সংকলিত। এটি কতেক দিক থেকে অতীব সমাদৃত গ্রন্থ। এটা এ জন্যে যে, আবদুর রায্যাক হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা (র) এবং মা'মার ইবনে রাশিদ (র) প্রমুখ ইমামগণের শিষ্য এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ওস্তাদ। ফলে এ গ্রন্থে অধিকাংশ হাদীস তিন সূত্রে বর্ণিত। দ্বিতীয়ত ইমাম বুখরী (র)-এর ঘোষণা অনুযায়ী এ গ্রন্থটির সকল হাদীসই সহীহ শুদ্ধ।

مُصَنَّفُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ شَيْبَةَ رَحِمَهُ اللهُ মুসান্নাফু আবী বকর ইবনে আবী শায়বা (র) ইনিও ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) প্রমুখের ওস্তাদ। তাঁর সংকলিত গ্রন্থের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে শুধু আহকামের হাদীসগুলো ফিকহী বিন্যাস অনুযায়ী সংকলন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এতে মারফু' হাদীসগুলোর সাথে সাহাবায়ে কেরাম (রা) ও তাবেয়ীন (র)-এর ফতোয়াগুলোও প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর দরুন

হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী হাদীস বোঝা সহজ হয়ে যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, এতে সংকলক প্রতিটি মাযহাবের প্রমাণ্য বিষয়গুলো সম্পূর্ণনিরপেক্ষতার সাথে সংকলন করেছেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, ইমাম আবু বকর (র) স্বয়ং কুফার অধিবাসী, সেহেতু তিনি ইরাকবাসী ইমামগণের মতাদর্শ অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য বিষয়সমূহ এ গ্রন্থে অধিকহারে পাওযার যায়। যার দরুন আল্লামা যাহিদ আল-কাওসারী (র) লিখেছেন, أحوج ما يكون الفقيه إليه كتاب ابن أبى شيبة. 'একজন ফকীহ যে কিতাবখানির প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী, সেটি হচ্ছে ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (র)-এর মুসান্নাফ।'

মুসতাদরাকে হাকেম (র) مُسْتَدْرَكُ الْـحَاكِمِ رَحِمَهُ اللهُ এ কিতাবখানি বুখারী ও মুসলিমের মুসতাদরাক কিতাব। কিন্তু হাদীস যাচাইয়ের ব্যাপারে ইমাম হাকেম (র) অধিক অমনোযোগী ছিলেন বলে কারো কারো অভিমত। এ জন্যে তিনি এরূপ অনেক হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম অথবা যে কোন একজনের শর্তানুযায়ী সহীহ শুদ্ধ মনে করে নিজ কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত দুর্বল। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (র) এ গ্রন্থখানির একটি পার্শ্বটীকা সংযোজন করেছেন। এতে মুসতাদরাকের সংক্ষেপায়নও রয়েছে। সেই সাথে ইমাম হাকেম (র)-এর অমনোযোগিতার প্রতি সতর্কীকরণও রয়েছে। ইমাম হাকেম (র) সম্পর্কে কোন কোন লোক মন্তব্য করেছেন, তিনি শিয়া ছিলেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাবারানী (র)**-এর মাআজিম** اَلْـمَعَاجِمُ لِلطَّبَرَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ইমাম তাবারানী (র)-এর মাআজিম ৩টি।

যথা– ১. কবীর, ২. আওসাত ও ৩. সগীর। *আল-মু'জামুল কবীর* হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মুসনদ। অর্থাৎ এতে সাহাবীগণের নামের ক্রমানুযায়ী বর্ণনাগুলো সংকলন করা হয়েছে। *আল-মুজামুল আওসাত* গ্রন্থে ইমাম তাবারানী (র) নিজের শায়খদের নামের ক্রমানুয়ায়ী বর্ণনাসমূহ সংকলন করেছেন এবং তাঁদের শুধু تفردات (ব্যক্তিগত) غرائب (অভিনব অভিমতগুলো) সংকলন করেছেন। *আল-মু'জামুস সগীর* গ্রন্থে প্রত্যেক শায়খের এক একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এতে অধিকতর সে সব শায়খদের বর্ণনাই রয়েছে, যাঁদের কাছ থেকে ইমাম তাবারানী (র) শুধু একটি বর্ণনা শুনেছেন।

মুসনদুল বাযযার (র) مُسْنَدُ الْبَزَّارِ رَحِمَهُ اللهُ এটিকে *আল-মুসনদুল কবীর*ও বলা হয়। এটি ইমাম আবু বকর আল বায্যার কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। এটি معلل (মু'আল্লাল) শ্রেণির গ্রন্থ। অর্থাৎ এতে ইমাম মহোদয় বর্ণনাবলির ত্রুটির কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মুআল্লাল শ্রেণীর গ্রন্থগুলোর মূলনীতি হচ্ছে, যে হাদীস সম্পর্কে গ্রন্থ সংকলক কোনরকম মন্তব্য না করে নীরবতা অবলম্বন করবেন, সেটা তাঁর নিকট সহীহ অথবা আমলযোগ্য মনে করা হয়।

মুসনদু আবী ইয়া'লা (র) مُسْنَدُ أَبِيْ يَعْلَى رَحِمَهُ اللهُ এ কিতাবখানি মুসনদ নামে খ্যাত হয়ে পড়েছে। অথচ এটি হচ্ছে মু'জাম।

মুসনাদুদ দারেমী (র) مُسْنَدُ الدَّارِمِيّ رَحِمَهُ اللهُ এ কিতাবটিকেও মুসনদ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হল সুনান শ্রেণীর গ্রন্থ।

বায়হাকী (র)-**এর আস-সুনানুল কুবরা** اَلسُّنَنُ الْكُبْرَى ، لِلْبَيْهَقِيْ رَحِمَهُ اللهُ এ কিতাবটি ইমাম বায়হাকী (র) শাফিয়ী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ।

সুনানু দারাকুতনী سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيْ رَحِمَهُ اللهُ এ কিতাব ফিকহের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ সংবলিত। এতে প্রতিটি হাদীসের সনদসূত্র অতীব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসের প্রকারভেদ ও তার গুরুত্ব

হাদীসের মূলনীতিশাস্ত্র বিশারদগণ সূত্র পরম্পরা বিচারে হাদীসকে বহুবিধ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর আলোকে মুজতাহিদ ইমামদের মাসালা-মসায়েলের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতানৈক্য অনুধাবন করা সহজতর হয়। সনদের সবল দুর্বল দিকের ভিত্তিতে বিন্যস্ত প্রকারভেদগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১. اَلْـمَرْفُوْعُ (মারফু') যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কোন কথা, কর্ম, সম্মতি তথা কোন কাজের প্রতি তার মৌনসম্মতির কথা বর্ণিত হয়, সেই হাদীসকে মারফূ হাদীস বলে।

২. اَلْـمَوْقُوْفُ (মওকুফ) যে হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের কোন উক্তি, অবস্থা অথবা কাজের প্রতি মৌনসম্মতির কথা বর্ণিত হয়, সে হাদীসকে মাওকুফ হাদীস বলে।

৩. اَلْـمَقْطُوْعُ (মাকতু') যে হাদীসে তাবেয়ী ও তাবেয়ীদের কথা, কর্ম ও সমর্থনগুলো বর্ণিত হয়, তাকে মাকতু' হাদীস বলে। অর্থাৎ তাবেয়ী বা তাবে তাবেয়ীর সনদে বর্ণিত হাদীসকে মাকতু' বলে।

৪. اَلْـمُتَّصِلُ (মুত্তাসিল) যে হাদীসের সনদ থেকে কোন বর্ণাকারী বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

৫. اَلْـمُعَلَّقُ (মু'য়াল্লাক) যে হাদীসের সনদের শুরু থেকে বর্ণনাকারীর নাম বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে, এ বিলুপ্তকরণ আংশিক হোক বা সমষ্টিগত হোক, তাকে মুয়াল্লাক হাদীস বলে।

৬. اَلْـمُرْسَلُ (মুরসাল) যে হাদীসের সনদের শেষ দিক থেকে বর্ণনাকারীর নাম বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে, তাকে হাদীসে মুরসাল বলে। যেমন– একজন তাবেয়ী যদি সাহাবীকে বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন– তাবেয়ীর এরূপ বলা, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ كَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا 'রাসূলুল্লাহ (সা)-এরূপ বলেছেন বা এরূপ করেছেন।' এ তাবেয়ী অল্পবয়স্ক বা অধিকবয়স্ক হোন না কেন।

৭. اَلْـمُعْضَلُ (মু'দাল) সনদের মাঝখান থেকে একাধিক্রমে দুই বা দুইয়ের অধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া। এ বাদ পড়ে যাওয়াটা সংকলকের হস্তক্ষেপের কারণে হোক বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই হোক।

৮. اَلْـمُنْقَطِعُ (মুনকাতি') সনদের মধ্যে দুয়ের অধিক বর্ণনাকারীকে একই স্থান থেকে অথবা বিভিন্ন স্থান থেকে বাদ দেয়া, অন্য কথায় যে সনদে একজন বা কতিপয় বর্ণনাকারীর নাম বিভিন্ন জায়গা থেকে বিলুপ্ত করা হয়, তাকে মুনকাতি বলে।

৯. اَلْـمُضْطَرِبُ (মুযতারিব) হাদীসের সনদ বা মূল পাঠে অতিরিক্ততা, ত্রুটি অথবা অগ্র-পশ্চাত করাকে ইযতিরাব বলে। ইযতিরাব প্রায়শ সনদের মধ্যবর্তী স্থানেই হয়ে থাকে।

১০. اَلْـمُدْرَجُ (মুদরাজ) হাদীসের মূল পাঠ বর্ণনাকারী নিজের বা অপরের কোন কথা মিলিয়ে দিলে একে মুদরাজ বলে। কখনো মূল পাঠে পরিবর্তন করা হলে তাকে মুদরাজুল মতন বলে।

১১. اَلشَّاذُ (শায) যে হাদীসের ব্যাপারে একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত আরেকজন বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন, সে হাদীসকে শায বলে। এর বিপরীত হাদীসকে اَلْـمَحْفُوْظُ (মাহফুয) বলে।

১২. اَلْـمُنْكَرُ (মুনকার) যে বর্ণনায় অধিক দুর্বল বর্ণনাকারী স্বল্প দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন, তাকে মুনকার বলে।

১৩. اَلْـمُعَلَّلُ (মু'আল্লাল) যে হাদীসে কোন দূষণীয় গুপ্ত কারণ বিদ্যমান, তাকে 'মু'আল্লাল' হাদীস বলে। যেমন– মুরসাল হাদীসকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করা।

১৪. اَلصَّحِيْحُ لِذَاتِهِ (সহীহ লি-যাতিহি) যে হাদীসের সকল বর্ণনাকারী পূর্ণাঙ্গ আদালত গুণ ও পূর্ণ-ধীশক্তিসম্পন্ন হন এবং হাদীসটির সূত্র কোন দোষে দুষ্ট এবং শায নয়, তাকে সহীহ লি-যাতিহী বলে। সহীহ লি-যাতিহির ভিত্তি বর্ণনাকারীর আলামত গুণ ও ধী-শক্তি প্রভৃতি গুণাবলির ওপর। এসব গুণবৈশিষ্ট্যের মধ্যে উন্নত, মধ্যম ও নিম্ন হওয়ার পার্থক্যও রয়েছে।

১৫. اَلصَّحِيْحُ لِغَيْرِهِ (সহীহ লি-গায়রিহি) যে হাদীসে পরিপূর্ণ ধী-শক্তি ছাড়া সহীহ লি-যাতিহির অন্য গুণাবলি রয়েছে, আর ধী-শক্তির স্বল্পতা বর্ণনা সূত্রের বিভিন্নতা দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, তাকে সহীহ লি-গায়রিহী বলে। এমনিভাবে যে সূত্র বর্ণনাকারীর একক বর্ণনার কারণে হাসান লি-যাতিহী হবে, সেটাও বর্ণনাসূত্রের বৈচিত্রের ফলে সহীহ লি-গায়রিহী বলে।

১৬. اَلْـحَسَنُ لِغَيْرِهِ (হাসান লি-গায়রিহী) যে হাদীসে সহীহ লি-যাতিহির এক বা একাধিক গুণে ঘাটতি থাকবে, কিন্তু এ ঘাটতি বর্ণনার আধিক্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, হাদীসটির বিষয়বস্তু বিকৃত না হয় এবং যার গ্রহণযোগ্যতার কোন লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাকে হাসান লি-গায়রিহি বলে।

১৭. اَلْـحَسَنُ لِذَاتِهِ (হাসান লি-যাতিহি) যে হাদীসে পরিপূর্ণ ধী-শক্তি ছাড়া সহীহ লি-যাতিহির সকল গুণ রয়েছে, আর এ ঘাটতি বর্ণনাসূত্রের বিভিন্নতা দ্বারা পূরণ হয় না, সেটাকে হাসান লি-যাতিহি বলা হবে।

১৮. اَلضَّعِيْفُ (যয়ীফ) যে হাদীস একাধিক বৈশিষ্ট্যে সহীহ লি-যাতিহীর চেয়ে অসম্পূর্ণ হবে এবং সূত্রের আধিক্য দ্বারা সেই অসম্পূর্ণতা পূর্ণ হবে না, তাকে যয়ীফ হাদীস বলে।

১৯. اَلْـمَتْرُوْكُ (মাতরূক) যে হাদীসের সনদে কোন বর্ণনাকারী মিথ্যার অভিযোগ অভিযুক্ত হবেন অর্থাৎ বর্ণনাকারীর ব্যাপারে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করার অপবাদ থাকবে, এরূপ হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলে।

২০. اَلْـمَوْضُوْعُ (মাওযূ) যে হাদীসের সনদের মধ্যে এমন কোন বর্ণনাকারী থাকবেন, যার সম্বন্ধে হাদীস জাল করার অভিযোগ প্রমাণিত, এরূপ হাদীসকে মাওযূ হাদীস বলে।

২১. اَلْغَرِيْبُ (গারীব) যে হাদীসের সনদের কোন বর্ণনাকারী হাদীসের সূত্র পরম্পরায় শায়খ বা ওস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনায় একাকী হয়ে পড়েন, তাকে গারীব হাদীস বলে।

২২. اَلْعَزِيْزُ (আ'যীয) যে হাদীসের বর্ণনাকারী দু'জন, অতঃপর সূত্র-পরম্পরার প্রত্যেক বর্ণনাকারী থেকে অন্তত দু'ব্যক্তি বর্ণনা করেন, এরপর যদি কোন জায়গায় বর্ণনাকারী দুয়ের অধিক হন, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা এ বিষয়ে স্বল্পতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে। এ ধরনের হাদীসকে আযীয হাদীস বলে।

২৩. اَلْـمَشْهُوْرُ (মাশহূর) যে হাদীস দুয়ের অধিক ব্যক্তির বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয় অর্থাৎ সূত্র পরম্পরায় কোন স্থানেই তিনের চেয়ে কম বর্ণনাকারী হবে না। আর এ আধিক্য মুতাওয়াতের হাদীসের সীমারেখা থেকে নীচে হবে, তাকে মাশহুর হাদীস বলে। হাদীসে মশহুর দ্বারা عِلْمُ الْيَقِيْنِ (নিশ্চিত জ্ঞান) লাভ করা যাবে না।

২৪. اَلْـمُتَوَاتِرُ (মুতাওয়াতির) যে হাদীস প্রতি যুগে এত অধিক ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, সেসব ব্যক্তির মিথ্যার ওপর অভিন্ন মত হওয়া স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব, এরূপ হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে।

২৫. اَلْـمَعْرُوْفُ (মা'রূফ) যে হাদীসের বর্ণনাকারী শক্তিশালী, কিন্তু দুর্বল বর্ণনাকারী তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন, এরূপ হাদীসকে মা'রূফ বলে। এটি 'মুনকার' হাদীসের বিপরীত। অর্থাৎ অধিক দুর্বল বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনায় যদি স্বল্প দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন, তাহলে তাকে মুনকার বলে।

২৬. اَلْـمَحْفُوْظُ (মাহফুয) মাহফুয শাযের বিপরীত হাদীস। অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, কিন্তু তাঁর চেয়ে নিম্নস্তরের বিশ্বস্ত লোক তার বিরোধিতা করেন। যদি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী প্রাধান্যপাপ্ত বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন, তাহলে তাকে শায বলে।

২৭. اَلْـمَقْلُوْبُ (মাকলূব) যে হাদীসের সূত্রে বা মূলপাঠে ভুলবশত অগ্র-পশ্চাৎ হয়ে পড়েছে, তাকে মাকলূব হাদীস বলে। যেমন– মুররা ইবনে কাবের স্থলে কাব ইবনে মুররা বলা।

২৮. اَلْـمُصَحَّفُ وَالْـمُحَرَّفُ (মুসাহহাফ ও মুহাররাফ) যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নামের মধ্যে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে, তাকে মুসাহহাফ বলে। যেমন– شُرَيْحٌ (শুরায়হ)-এর স্থলে سُرَيْحٌ (সুরায়হ) লিখিত হল। আর যদি এক শব্দের পরিবর্তে আরেক শব্দ লিখিত হয়, তা হলে তাকে মুহাররাফ বলে।

২৯. اَلْـمُدَلَّسُ (মুদাল্লাস) যে হাদীসের বর্ণনাকারীর অভ্যাস হচ্ছে, তিনি নিজ শায়খ বা শায়খ (শিক্ষক)-এর নাম গোপন করে ওপরের শায়খের নামে হাদীস বর্ণনা করেন।

৩০. اَلْـمُعَنْعَنْ (মুআনআন) যে হাদীসের সনদের মধ্যে عَنْ (আন) অব্যয় থাকবে, সে হাদীসকে মুআনআন হাদীস বলে। عَنْ থাকাকে عَنْ عَنْ (আনআন) বা عَنْعَنَةٌ (আনআনা) বলে। এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

৩১. اَلْـمُسَلْسَلُ (মুসালসাল) যে হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারী একই শব্দ অথবা একই উক্তি অথবা একই উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে অভিন্ন বর্ণনা প্রদান করেন, সে হাদীসকে মুসালসাল বলে।

৩২. اَلْـخَبْرُ الْوَاحِدُ (খবরে ওয়াহিদ) গরীব হাদীস, আযীয হাদীস ও মাশহূর হাদীস এ সকল হাদীসের প্রত্যেক প্রকারকে খবরে ওয়াহিদ বলে।

হাদীস শরীফ চর্চাকারীগণের বিভিন্ন স্তর

যারা হাদীস শরীফ নিয়ে চর্চা করেন বিশেষজ্ঞগণ তাদেরকেও বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন। আমরা এখানে খুব সংক্ষেপে তাদের পরিচয় তুলে ধরছি।

১. اَلطَّالِبُ (তালিব) হাদীস শিক্ষার্থীকে তালিব বলে।

২. اَلشَّيْخُ (শায়খ) হাদীসের শিক্ষককে মুহাদ্দিস বা শায়খ বলে। সাধারণ পরিভাষায় বুখারী শরীফের পাঠদানকারী মুহাদ্দিসকে শায়খুল হাদীস বলে।

৩. اَلْـحَافِظُ (হাফেয) যিনি সনদ ও মূল পাঠসহ এক লক্ষ হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা ও আদালত গুণ বিশ্লেষণসহ সংরক্ষণ করেন, তাঁকে হাফেয বলে।

৪. اَلْـحُجَّةُ (হুজ্জত) সনদ ও মতন (মূল পাঠ) এবং বর্ণনাকারীদের সমালোচনা ও আদালত গুণ বিশ্লেষণসহ যিনি ৩ লাখ হাদীস সংরক্ষণ করেন, তাঁকে হুজ্জত বলে।

৫. اَلْـحَاكِمُ (হাকেম) যে ব্যক্তি বর্ণিত সকল হাদীসের সনদ ও মূল পাঠ জারাহ (সমালোচনা) ও তা'দীল (ন্যায়পরায়ণতা)-এর ব্যাখ্যাসহ সংরক্ষণ করেন, তাঁকে হাকেম বলে। হাকিমের স্তর হুজ্জতেরও ওপরে। তাছাড়া হাদীসের বিভিন্ন সূত্রের ওপর অবগতি লাভকারীদের ওপরও হাকেম শব্দটির প্রয়োগ হয়।

মূলপাঠ ও সনদের বিধানগত পার্থক্য

হাদীস বর্ণনাকারীগণ দোষ ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণসমূহ সনদের সাথে সম্পর্কিত। হাদীসের মূলপাঠের বিধান প্রয়োগ করা হয় অপরাপর লক্ষণগুলোর আলোকে। যদি কোন হাদীস একজন হাদীস জালকারী বর্ণনা করে তাহলে সনদের দিক থেকে সে হাদীসকে জাল হাদীস বলা হবে; কিন্তু হুবহু হাদীসটি জাল বলা যাবে না। তবে যখন কোন হাদীসের সনদে হাদীস জালকারী থাকে এবং সে হাদীসের মূলপাঠ কোনভাবেই প্রমাণিত না হয়, সে হাদীসকে সাধারণত জাল হাদীসই বলা হবে। ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) তাঁর লিখিত *মীযানুল ইতিদাল* গ্রন্থে এর এই উদাহরণ দিয়েছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسَى الْـمَرْوْزِيّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٍ সূত্রে বর্ণিত طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ হাদীসটিকে জাল হাদীস বলেছেন। ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) বলেন, হাদীসটি এ সনদের দিক থেকে জাল। অন্যথায় মূল হাদীস এবং অন্যান্য দুর্বল সূত্রসমূহ দ্বারা এটি প্রমাণিত।[২১৬]

অনুরূপভাবে হাফেয আবদুল বার صَلاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ হাদীসটি বাতিল বলে প্রত্যাখ্যাত বলেছেন, কিন্তু আল্লামা শামসুদ্দীন আস-সাখাওয়ী (র) বলেন, এ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিধান বিশেষ সনদের দিক থেকে, অন্যথায় মূল হাদীস প্রত্যাখ্যাত নয়।

অনুরূপভাবে দুর্বল হাদীসের মধ্যেও দুর্বলতার বিধান সনদের দিক থেকে প্রয়োগ হয়। আর এও হতে পারে, কোন বিশুদ্ধ হাদীস একজন দুর্বল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। সনদের দিক থেকে সে হাদীসকে দুর্বল বলা হবে, কিন্তু হাদীসের মূল পাঠ সম্পর্কে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। ইমাম নববী (র) বলেন,

إِنَّ رِوَايَاتِ الرَّاوِى الضَّعِيْفِ يَكُوْنُ فِيْهَا الصَّحِيْحُ وَالضَّعِيْفُ وَالْبَاطِلُ فَيَكْتُبُوْنَهَا ثُمَّ يُمَيِّزُ أَهْلُ الْـحَدِيْثِ وَالْإِتْقَانِ بَعْضَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ وَّذَلِكَ سَهْلٌ عَلَيْهِمْ مَّعْرُوْفٌ عِنْدَهُمْ وَبِهَذَا احْتَجَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ حِيْنَ نَهَى عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الْكَلْبِيِّ فَقِيْلَ لَهُ أَنْتَ تَرْوِىْ عَنْهُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ.

---

২১৬ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল*, দারুল মা'রিফা লিত-তাবা'আ ওয়ান নাশার, বৈরুত, লেবনান, ১৩৮২ হি. / ১৯৬৩ খ্রি., ১খ. পৃ. ৬৯

২১৬ শামসুদ্দীন আস সাখাবী, *আল-মাকাসিদুল হাসানা ফী বয়ানি কসীরিম মিনাল আহাদীসিল মশহূরা আলাল আলসিনা*, পৃ. ৬৪৩, দারুল কিতাবিল আরবি, বৈরুত, ১৪০৫/ ১৯৮৫

'নিশ্চয়ই দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনাগুলোতে সহীহ, যয়ীফ ও বাতিল সর্ব প্রকার হাদীসই অন্তর্ভুক্ত থাকে। মুহাদ্দিসীন এসব বর্ণনাই উদ্ধৃত করেন। এরপর হাদীসের শিক্ষিত সমাজ এগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করেন। এটা তাদের জন্যে সহজ ব্যাপার। সুফিয়ান আস-সাওরী (র)-কে যখন কালবীর বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কি তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি একথা দ্বারাই দলিল পেশ করেছিলেন, আমি তো তার সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেই।'[২১৭]

জাল হাদীসের বিধান

اَلْحَدِيْثُ الْمَوْضُوْعُ (জাল হাদীস) দ্বারা ইসলামী শরী'আর কোন আইন সাব্যস্ত হয় না। কোন হাদীসের জাল হওয়া খুলে না বলে তা বর্ণনা করাও বৈধ নয়। একটি হাদীস কতিপয় দুর্বল সনদ দ্বারা বর্ণনা করা হলে শক্তিশালী হয়ে যায়, কিন্তু একটি হাদীস যদি কতিপয় জাল সনদে বর্ণনা করা হয়, তবুও সেটি জালই থেকে যায়। কেননা মন্দের সাথে মন্দের মিলনে মন্দই থাকে।

হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়সমূহের বিবরণ

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা ইসলামের যেসব বিধি-বিধান ও সমাধান সাব্যস্ত হয়, তন্মধ্যে যেগুলোর সম্পর্ক হালাল-হারাম হওয়ার সাথে সেগুলো ৪ প্রকার। যথা–

১. اَلْعَقَايِدُ الْقَطِيْعَةُ (আকায়িদে কাতীআ) অকাট্য বিশ্বাসসমূহ। যেমন- তাওহীদ, রিসালাত, সৃষ্টির সূচনা ও পুনরুত্থান।

২. اَلْعَقَايِدُ الظَّنِّيَّةُ (আকায়িদে জন্নিয়া) ধারণাভিত্তিক বিশ্বাসসমূহ। যেমন– ফিরিশতাদের ওপর নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও কবরের অবস্থা।

অকাট্য বিশ্বাসসমূহ সাব্যস্ত করার জন্যে মুতাওয়াতির হাদীস আবশ্যক। সেটা শাব্দিক মুতাওয়াতির হোক বা অর্থগত মুতাওয়াতির হোক। সনদের প্রত্যেক স্তরে তিনের অধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত বর্ণনাকে মুতাওয়াতির বলে।

৩. اَلْأَحْكَامُ (আহকাম) বিধি-বিধান। এগুলো সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে বিশুদ্ধ হাদীস থাকতে হবে অথবা এতটুকু হতে হবে যে, তা হাসান লি-গায়রিহী শ্রেণীর হাদীসের চাইতে নিম্নমানের হবে না।

৪. اَلْفَضَايِلُ وَالْمَنَاقِبُ (ফাযাইল ওয়া মানাকিব) শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল হাদীসসমূহও গ্রহণযোগ্য। যেমন– আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন,

---

২১৭ মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া ইবনে শারাফ আন নাবাবী, *আল-মিনহাজ ফী শরহে সহীহে মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ* মুআসসা কারতুবা, মিশর, ২০০৯, ১খ. পৃ. ১২৫

أَنَّهُمْ قَدْ يَرْوُوْنَ عَنْهُمْ أَحَادِيْثَ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالْقَصَصِ وَأَحَادِيْثَ الزُّهْدِ وَمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ الْحَدِيْثِ يَجُوْزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِيْهِ وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوْعِ مِنْهُ وَالْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّ أُصُولَ ذَلِكَ صَحِيْحَةٌ مُقَرَّرَةٌ فِي الشَّرْعِ مَعْرُوْفَةٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَعَلَى ، كُلِّ حَالٍ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ لَا يَرْوُوْنَ عَنِ الضُّعَفَاءِ شَيْئًا يَحْتَجُّوْنَ بِهِ عَلَى ، انْفِرَادِهِ فِي الْأَحْكَامِ.

'হাদীসশাস্ত্রবিদগণ দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে আগ্রহ সৃষ্টি, ভীতি প্রদর্শন, আমলের ফযীলত মর্যাদা, গল্প-কাহিনী, দুনিয়া-বিমুখতা ও উত্তম নৈতিকতা বিষয়ক বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু হালাল-হারাম বিষয়ক বিধি-বিধান প্রসঙ্গে কোন হাদীসই তাঁরা দুর্বল বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে বর্ণনা করেন না। প্রথমোক্ত প্রকারের হাদীসসমূহ দুর্বল বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে বর্ণনা করা এবং সেগুলোর ওপর আমল করা শুদ্ধ এবং শরী'আ দ্বারা প্রমাণিতও বটে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় প্রকার তথা বিধি-বিধান সম্পর্কিত হাদীসসমূহে যখন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী একক হয়ে পড়বেন, তখন তার বর্ণনা কখনো প্রমাণরূপে পেশ করা যাবে না।'[২১৮]

প্রখ্যাত হাফেযুল হাদীসগণের নাম

হাদীস চর্চাকারীদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান দখল করেছেন তারা হাফেযুল হাদীস নামে প্রসিদ্ধ। আমরা এখানে হানাফী, শাফিয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মতের অনুসারী প্রখ্যাত হাফেযুল হাদীসগণের নাম উপস্থাপন করছি,

ক. হানাফী মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম

১. **হাফেয আবু বশর আদ-দুলাবী;** মুহাম্মদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে মুসলিম আল-আনসারী আদ-দুলাবী আর-রাযী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.)

২. **হাফেয আবু জা'ফর আত-তাহাওয়ী;** আবু জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা আল-আযদী আত-তাহাওয়ী (২৩৯–৩২১ হি. = ৮৫৩–৯৩৩ খ্রি.)

৩. **হাফেয ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ;**আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে মাখলাদ আল-খানযালী আত-তামীমী আল-মারূযী (১৬১–২৩৮ হি. = ৭৭৮–৮৫৩ খ্রি.)

৪. **হাফেয আবু বকর আল-কালাবাযী;** আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবু ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব আল-কালাবাযী আল-বুখারী আল-হানাফী (০০০–৩৮০ হি. = ০০০–৯৯০ খ্রি.)

৫. **হাফেয আবু বকর আল-জাস্‌সাস;** আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-জাস্‌সাস (৩০৫–৩৭০ হি. = ৯১৭–৯৮০ খ্রি.)

২১৮ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ১২৫-১২৬

৬. **হাফেয ইবনে আবুল আওয়াম আস-সা'দী;** আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল আওয়াম আস-সা'দী (৩৪৯–৪১৮ হি. = ৯৬০–১০২৭ খ্রি.)

৭. **হাফেয আবু মুহাম্মদ আস-সামারকন্দী;** আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল কাসিম ইবনে জা'ফর আস-সামারকন্দী আল-কাসিমী (৪০৯–৪৯১ হি. = ১০১৮–১০৯৮ খ্রি.)

৮. **হাফেয শামসুদ্দীন আস-সুরূজী;** আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুল গনী আস-সুরূজী (৬৩৯–৭১০ হি. = ১২৪১–১৩১০ খ্রি.)

৯. **হাফেয কুতবুদ্দীন আল-হালবী;** কুতবুদ্দীন আবদুল কারীম ইবনে আবদুন নুর ইবনে মুনীর আল-হালবী (৬৬৪–৭৩৫ হি. = ১২৬৬–১৩৩৫ খ্রি.)

১০. **হাফেয আলাউদ্দীন আল-মারিদীনী; আবুল হাসান আলাউদ্দীন আলী ইবনে উসমান ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুস্তফা আল মারিদীনী, (৬৮৩-৭৫০ হিজরি=১২৮৪-১৩৪৯খ্রি.)**

১১. **হাফেয জামাল উদ্দীন আয-যায়লায়ী;** আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ আয-যায়লায়ী (০০০–৭৬২ হি. = ০০০–১৩৬০ খ্রি.)

১২. **হাফেয আলাউদ্দীন মুগলতায়ী;** আবু আবদুল্লাহ মুগলতায়ী ইবনে কালীজ ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাকজারী আল-মিসরী আল-হুকরী আল-হানাফী (৬৮৯–৭৬২ হি. = ১২৯০–১৩৬১ খ্রি.)

১৩. **হাফেয বদরুদ্দীন আল-আইনী;** আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ আল-আইনী (৭৬২–৮৫৫ হি. = ১৩৬১–১৪৫১ খ্রি.)

১৪. **হাফেয কাসিম ইবনে কুতলূবাগী;** আবুল ফিদা যয়নুদ্দীন আবুল আদল কাসিম ইবনে কুতলূবাগী আস-সূদূনী (৮০২–৮৭৯ হি. = ১৩৯৯–১৪৭৪ খ্রি.)

শেষোক্তজন মুসনদে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সংকলক।

খ. শাফেঈ মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম

১. **হাফেয আবু বকর আল-মারূযী;** কাযী আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাঈদ ইবনে ইবরাহীম আল-উমাওয়ী আল-মারূযী (০০০–২৯২ হি. = ০০০–৯০৫ খ্রি.)

২. **হাফেয দারাকুতনী;** শায়খুল ইসলাম, আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতনী (৩০৬–৩৮৫ হি. = ৯১৮–৯৯৫ খ্রি.)

৩. **হাফেয হামদ আল-খাত্তাবী** আবু সুলায়মান হামদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল খাত্তাব আল-বসতী আল-খাত্তাবী (৩১৯–৩৮৮ হি. = ৯৩১–৯৯৮ খ্রি.)

৪. **হাফেয আবু বকর আল-বায়হাকী;** আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.)

৫. **হাফেয ইবনুল আসীরআল-জাযারী;** মুজাদ্দিদুদ্দীন আবুস সা'দাত আল-মুবারক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল কারীম আশ-শায়বানী আল-জাযারী ইবনিল আসীর (৫৪৪–৬০৬ হি. = ১১৫০–১০ খ্রি.)

৬. **হাফেয ইবনে দকীকুল** ঈদ; আবুল ফাতহ তাকী উদ্দীন কাযী মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুতী' ইবনে দকীকুল ঈদ আল-কুশায়রী (৬২৫–৭০২ হি. = ১২২৮–১৩০২ খ্রি.)

৭. **হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী;** আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.)

৮. **হাফেয যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী;** আবুল ফযল আবদুর রহীম ইবনুল হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে ইবরাহীম আল-কুরদী আর-রাযনানী আল-মিহরানী আল-মিসরী আশ-শাফিয়ী (৭২৫–৮০৬ হি. = ১৩২৫–১৪০৪ খ্রি.)

৯. **হাফেয নুরুদ্দীন আল-হায়সামী;** আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫–৮০৭ হি. = ১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.)

১০. **হাফেয ইবনে হাজর আল-আসকলানী;** আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.)

গ. মালিকী মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম

১. **হাফেয ইবনে আবদুল বার;** আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বর আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি. = ৯৮৭–১০৭১ খ্রি.)

২. **হাফেয আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী;** সুলায়মান ইবনে খালাফ ইবনে সা'দ ইবনে আইয়ুব ইবনে ওয়ারিস আত-তুজুবী আল-কুরতুবী আল-বাজী (৪০৩–৪৭৪ হি. = ১০১২–১০৮১ খ্রি.)

৩. **হাফেয ইবনে রুশদ;** আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী (৪৫০–৫২০ হি. = ১০৫৮–১১২৬ খ্রি.)

৪. **হাফেয আল-মাযারী;** আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওমর আত-তামীমী আল-মাযারী (৪৫৩–৫৩৬ হি. = ১০৬১–১১৪১ খ্রি.)

৫. **হাফেয কাযী আয়ায;** আবুল ফযল কাযী আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬–৫৪৪ হি. = ১০৮৩–১১৪৯ খ্রি)

৬. **হাফেয আবু বকর ইবনুল আরবী;** কাযী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাআফিরী আল-ইশবীলী আল-মালীকী (৪৬৮–৫৪৩ হি. = ১০৭৬–১১৪৮ খ্রি.)

৭. **হাফেয আবুল কাসিম আস-সুহায়লী;** আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-খাসআমী আস-সুহায়লী (৫০৮–৫৮১ হি. = ১১১৪–১১৮৫ খ্রি.)

ঘ. হাম্বলী মতাবলম্বী হাফেযুল হাদীসগণের নাম

১. **হাফেয আবুল ফরজ ইবনুল জওযী;** জামাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী (৫০৮–৫৭৯ হি. = ১১১৬–১২০১ খ্রি.)

২. **হাফেয আবদুল গনী আল-মাকদিসী;** তকী উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল গনী ইবনে আলী ইবনে সুরূর আল-মাকদিসী আল-জামায়ীলী আদ-দামিশকী আল-হাম্বলী (৫৪১–৬০০ হি. = ১১৪৬–১২০৩ খ্রি.)

৩. **হাফেয ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী;** আবু মুহাম্মদ মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী আল-জামায়ীলী আদ-দামিশকী আল-হাম্বলী (৫৪১–৬০১ হি. = ১১৪৭–১২২৩ খ্রি.)

৪. **হাফেয ইবনে রজব আল-হাম্বলী;** যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রজব ইবনুল হাসান আস-সালামী আল-বগদাদী আদ-দামিশকী আল-হাম্বলী (৭৩৬–৭৯৫ হি. = ১৩৩৬–১৩৯৩ খ্রি.)

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির বিভিন্ন স্তর

হাদীসের কোন কিতাবটি বিশুদ্ধতার দিক থেকে কোন পর্যায়ে পড়ে হাদীস গবেষণার জন্য তাও জানা আবশ্যক। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) জনৈক শিষ্যকে এক চিঠি লিখেন, যা এক পুস্তিকার রূপ লাভ করে। তাতে তিনি বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থগুলোর স্তরভেদ নিয়ে আলোচনা করেন। পুস্তিকাটির নাম ছিলো-মা *য়াজিবু হিফযুহু লিন-নাযির* ما يجب حفظه للناظر। এতে শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) হাদীস গ্রন্থাবলিকে ৫টি স্তরে বিভক্ত করেন। আমরা এখানে সে ৫টি স্তর সম্পর্কে কতিপয় জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় তুলে ধরছি।

প্রথম স্তর

প্রথম স্তরে হচ্ছে সেসব হাদীস গ্রন্থ, যেগুলোর সংকলকগণ আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, তাঁদের কিতাবে গৃহীত সকল হাদীস সহীহ হাদীসের সকল শর্তের বিচারে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হবে। এ ধরনের কিতাবগুলোকে সিহাহ মুজাররাদা বলে। সুতরাং এ শ্রেণীর কিতাবসমূহের প্রতিটি হাদীসের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে যে,

সে সব গ্রন্থে গৃহীত হাদীসসমূহ তাদের গ্রন্থকারের নিকট সহীহ। নিম্নে প্রদত্ত কিতাবগুলোকে এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা–

১. *সহীহ আল-বুখারী*

২. *সহীহ মুসলিম*

৩. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*

৪. *মুসতাদরাকে হাকেম*

৫. *সহীহ ইবনে হিব্বান*

৬. *সহীহ ইবনে খুযাইমা*

৭. আবদুল্লাহ ইবনে ইবনুল জারুদ (র)-এর *আল-মুনতাকা*

৮. কাসিম ইবনে আসবাগ (র)-এর *আল-মুনতাকা*,

৯. যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (র)-এর *আল-মুখতারা*,

১০. *সহীহ ইবনুস সাকান*,

১১. *সহীহ ইবনুল আওয়ানা*।

এসব গ্রন্থকে এদিক থেকে সিহাহ মুজাররাদা (নিখাদ বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলি) শ্রেণীতে গণনা করা হয় যে, এগুলোর সংকলকগণ শুধু সেসব হাদীসই গ্রহণ করেছেন, যা তাঁদের নিজ ধারণায় বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেগুলো বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি নয়।

সহীহাইন (*সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিম*) ও ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তার ব্যাপারে সবাই একমত যে, এসব গ্রন্থের সকল হাদীস বিশুদ্ধ। শুধু ইমাম দারাকুতনী (র) এতে মতানৈক্য পোষণ করেন। তিনি নিরীক্ষণ করত তাঁর *আত-তাতাব্বুউ আলাস সহীহাইন* গ্রন্থে *সহীহ আল-বুখারী* ও *সহীহ মুসলিমের* অনেক হাদীসকে গায়রে সহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম হাফেয ইবন হাজার আসকলানী (র) তাঁর *হাদিউস সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী* নামক কিতাবে সেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে ইমাম দারাকুতনী (র)-এর যাবতীয় সমালোচনার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেছেন। যার দরুন তাঁর পরবর্তী কালের সকল আলেম বুখারী-মুসলিমের প্রতিটি হাদীসের বিশুদ্ধতার ওপর একমত পোষণ করেন।

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরে সেসব গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোর সংকলকগণ বিশেষ নীতি অবলম্বন করেছেন যে, তাদের গ্রন্থে হাসান জাতীয় হাদীসের চেয়ে নিম্নস্তরের কোন হাদীস যেন স্থান না পায়। তাদের গ্রন্থে কোন দুর্বল হাদীস এসে পড়লে তাঁরা সেটির দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্কীকরণে গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং যে হাদীসের ব্যাপারে তাঁরা নীরবতা পালন করবেন, সে হাদীস তাঁদের নিকট অন্তত হাসান শ্রেণীর তো হবেই।

সুনানে নাসায়ী

সুনানে নাসায়ী বা ইমাম নাসায়ী (র)-এর اَلْـمُجْتَبَى ، مِنَ السُّنَنِ এ স্তরের সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে এই *সুনানে নাসায়ী*। সুতরাং এতে এমন কোন হাদীস নেই যা ইমাম নাসায়ী (র)-এর নিকট হাসান শ্রেণীরও নিম্নে। তবে কোন হাদীস ব্যতিক্রম থাকলে সেটির দুর্বলতার সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন।

সুনানে আবু দাউদ

সুনানে আবু দাউদ। এতেও ইমাম আবু দাউস (র) যে হাদীসের ওপর নীরবতা অবলম্বন করেন, সে হাদীসটি তাঁর কাছে প্রমাণরূপে পেশ করার উপযোগী। তবে কখনো হাদীসের সনদে নগণ্য দুর্বলতা থাকে। ইমাম আবু দাউদ (র) এ ধরনের হাদীস অনুমোদন করেন এবং এর ওপর নীরবতাও অবলম্বন করেন। ইমাম হাফেয মুনযিরী (র) আবু দাউদ (র)-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেছেন। তাতে তিনি নগণ্য দুর্বলতাও বিবৃত করা ব্যতীত ছেড়ে দেননি।

ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) লিখেন, *সুনানে আবু দাউদের* মধ্যে প্রায় অর্ধেক হাদীস এমন, যেগুলো বুখারী (র) ও মুসলিম (র) নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আবার কিছু কিছু হাদীস আছে, যা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত বা যে কোন একটির শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিছু হাদীস এমন আছে, যেগুলোর বর্ণনাকারীদের কারো মধ্যে স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা পাওয়া যায়। যার দরুন সেটি সহীহ থেকে হাসানের স্তরে পর্যবসিত হয়েছে। উক্ত তিন প্রকারের ওপর ইমাম আবু দাউদ (র) সাধারণত নীরবতা অবলম্বন করেন। অবশ্য চতুর্থ প্রকার হাদীস যেগুলোর দুর্বলতার ব্যাপারে নীরবতা পালন করেন না। তবে কদাচিৎ কোথাও এরূপ হাদীস বিনা বাক্যব্যয়ে এ জন্যে উদ্ধৃত করে দেন যে, সেগুলোর অস্বাভাবিকতা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ০০০০

জামে তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী (র)-এর اَلْـجَامِعُ الْكَبِيْرُ। এতে প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে তার বিশুদ্ধতার মানও সুস্পষ্ট বিবৃত করে দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে হাদীসের সকল গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থটি অনন্য। কেননা ইমাম তিরমিযী (র) সতর্কীকরণ ছাড়া কোন দুর্বল হাদীস উল্লেখ করেননি। তবে আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ সেগুলোকে হাসান ও সহীহ আখ্যায়িতকরণে তুলনামূলক অমনোযোগী বলে অভিহিত করেছেন।

এ তিনটি কিতাব সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন মনীষী *সুনানে দারেমী*কেও দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন, *মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল*ও দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এতে কোন হাদীস হাসান শ্রেণীর নিম্নের নয়। এ অভিমত সঠিক নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে, *মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলের* অনেকগুলো বর্ণনা দুর্বল ও মুনকার শ্রেণীর। এজন্যে কোন কোন আলেম এটাকে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর বাস্তবতাও তাই। এখানে লক্ষণীয় যে, এ মতানৈক্য মূল *মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল* প্রসঙ্গে। اَلزِّيَادَةُ গ্রন্থটিও *মুসনদে আহমদ ইবনে হাম্বলের* অংশবিশেষ। এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান আবদুল্লাহ

ইবনে আহমদ (র) সংকলন করে মুসনদের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ অংশটি যে তৃতীয় স্তরের শামিল এ ব্যাপারে সবাই একমত।

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির তৃতীয় স্তর

সেসব কিতাব এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোতে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মুনকার, মওযূ সব ধরনের হাদীসই বিদ্যমান। এ স্তরের কিতাবগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতির আলোচনা বর্ণিত হলো।

সুনানে ইবনে মাজাহ

এটি যদিও বিশুদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থের শামিল। কিন্তু, এতে দুর্বল ও মুনকার শ্রেণীর হাদীস এমন কি অন্তত ১৯টি বানোয়াট হাদীসও রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আলেমগণের এক বড় দল একে বিশুদ্ধ ৬টি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেননি। কেউ কেউ এর স্থলে ইমাম মালেক (র) কর্তৃক সংকলিত মুয়াত্তাকে রেখেছেন। আবার কেউ রেখেছেন *সুনানে দারেমী*কে।

সুনানে দারুকুতনী

এটি ইমাম আবু আবদুল্লাহ আদ-দারাকুতনী (র)-এর সংকলন। তিনি উঁচু স্তরের একজন হাফেযুল হাদীস। তিনি এ কিতাবে আইন বিষয়ক প্রতিটি পরিচ্ছেদের অধীনে সংশ্লিষ্ট সকল হাদীসকে মূল পাঠ ও বর্ণনাসূত্রের বিভিন্নতার সাথে সংকলন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ জন্যে এ কিতাবখানি ইসলামী বিধি-বিধানের হাদীসসমূহের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। ইমাম দারাকুতনী (র) প্রতিটি হাদীস উল্লেখ করে তার সনদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করেছেন। এ গ্রন্থখা নিতেও সব ধরনের সরস-নীরস হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সাধারণত ইমাম দারাকুতনী (র) তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর দুর্বলতার ওপর সতর্ক করেছেন।

ইমাম বায়হাকী (র)-এর *আস-সুনানুল কুবরা*

ইমাম বায়হাকী (র) ইমাম দারাকুতনী (র)-এর শাগরেদ। তিনি এ কিতাবটি শাফিয়ী মাযহাবের প্রখ্যাত মূলপাঠ *মুখতাসার আল-মুযানী*র বিন্যাস অনুযায়ী সংকলন করেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য শাফিয়ী মাযহাবের ফিকহের দলিল- প্রমাণ বর্ণনা করা। যার দরুন তিনি তাঁর প্রামাণ্য হাদীসসমূহের সত্যায়ন এবং বিরোধী পক্ষের দলিল প্রমাণ দুর্বল সাব্যস্তকরণ ও তাতে খুঁত বের করণে সদা তৎপর। এ গ্রন্থখানির ওপর হাফেয আলাউদ্দিন আল-মাদীনী (র) যিনি ইবনুত তুরকমানী নামেও খ্যাত, একটি পাদটীকা লিখেছেন। এর নাম اَلْجَوْهَرُ النَّقِيّ عَلَى ، سُنَنِ الْبَيْهَقِيْ। তিনি হানাফী মতাবলম্বী এবং হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এজন্যে তিনি ইমাম বায়হাকী (র)-এর দলিল- প্রমাণের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এতে হানাফী চিন্তাধারার দলিল- প্রমাণগুলোর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ভাণ্ডার পাওয়া যায়।

মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক

এটি ইমাম আবদুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম আসসানআনী (র)-এর সংকলন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর শাগরেদ এবং ইমাম বুখারী (র) প্রমুখের শিক্ষকের শিক্ষক। এতে তিনি মারফূ শ্রেণীর হাদীসগুলো

ছাড়াও সাহাবা এবং তাবেয়ীনের আইনী মতামত তথা ফতোয়াসমূহও প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করেছেন। এ গ্রন্থেও সব ধরনের হাদীস পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত গ্রন্থখানি দুষ্পাপ্য ছিল। সম্পতি মুদ্রিত হয়েছে।

ইবনে আবু শায়বা (র)-এর মুসান্নাফ

اَلْمُصَنَّفُ فِى الْأَحَادِيْثِ وَالْآثَارِ এটি ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (র) কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। তিনি ৬ ইমামের অধিকাংশের শিক্ষাগুরু। এ গ্রন্থটির সংকলনরীতি মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকের অনুরূপ। উভয় গ্রন্থে হানাফী চিন্তাধারার দলিল- প্রমাণের এক বিরাট ভাণ্ডার পাওয়া যায়।

মুসনাদে তায়ালিসী

এটি ইমাম আবু দাউদ আত-তায়ালিসী (র)-এর সংকলন। ইনি ইমাম আবু দাউদ (র)-এর অগ্রজ। কোন কোন মনীষী বলেছেন, মুসনদ গ্রন্থ সংকলনে তিনি অগ্রবর্তিতার সম্মান লাভ করেছেন। তবে একথা ঠিক নয়। এ গ্রন্থখানি হায়দরাবাদের দাক্ষিণাত্য থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সুনানে সাঈদ ইবনে মাসসূর (র)

এ কিতাবে মু'দাল, মুনকাতা' ও মুরসাল হাদীস অধিক বিদ্যমান। এটি লখনৌয়ের মজলিসে ইলমী প্রকাশ করেছে।

মুসনাদুল হুমায়দী

এর সংকলক ইমাম হুমায়দী (র) ইমাম বুখারী (র)-এর ওস্তাদ। তিনি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর চরম বিরোধীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর এ গ্রন্থখানিও লখনৌর মজলিসে ইলমী দু'খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

এ হল কতিপয় কিতাব, যেগুলোর সূত্র অধিক হারে ব্যবহৃত হয়। এগুলো ছাড়া এ শ্রেণীর আরো অনেক কিতাব রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে

- *মুসনদে বায্যার*,
- *মুসনদে আবু ইয়ালা আল-মুসিলী*,
- *মুসনদে আবদ ইবনে হুমাইদ*,
- *মুসনদে আহমদ ইবনে মানী*,
- আবু নুআইম আল-আসবাহানী (র)-এর *হিলয়াতুল আউলিয়া ও তাবাকাতুল আসফিয়া*,
- আবু নুআইম আল-আসবাহানী (র) ও
- ইমাম বায়হাকী (র)-এর দালায়িলুন নুবুওয়াত,

- *মুসনদে ইবনে জারীর*,
- ইবনে জারীর (র)-এর *তাহযীবুল আসার*,
- *জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআ'ন*,
- *তারীখুল মুলুক ওয়াল উমাম* ও
- *তাফসীরে ইবনে মারদুওয়াই*

এ ছাড়া তাফসীরের বহু সংখ্যক কিতাব এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য *তাফসীরে ইবনে কাসীর* এগুলো থেকে ব্যতিক্রম। কেননা ইমাম হাফেয ইবনে কাসীর (র) হাদীসের একজন গবেষক। তিনি সাধারণত দুর্বল হাদীসসমূহের প্রতি সতর্কীকরণে অভ্যস্ত। এ স্তরের গ্রন্থাবলিতে কোন হাদীস প্রত্যক্ষ করে তার ওপর সে পর্যন্ত নির্ভর করা যাবে না, যে পর্যন্ত না সনদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান করা হবে।

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির চতুর্থ স্তর

এই স্তরে আছে সেসব কিতাব যেগুলোর অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল। বরং শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) লিখেছেন, এস্তরের গ্রন্থগুলোর প্রত্যেকটি হাদীসই দুর্বল। যেমন– হাকীমুত তিরমিযী নামে পরিচিত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে বাশার (র)-এর نَوَادِرُ الْأُصُوْلِ فِيْ أَحَادِيْثِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ইবনে আদী (র)-এর ৬০ অংশ বিশিষ্ট اَلْكَامِلُ فِيْ ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ, যা ১২ ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে। মুরতাযা আয-যাবীদী (র) কর্তৃক সংকলিত تَاجُ الْعُرُوْسِ مِنَ جَوَاهِرِ الْقَامُوْسِ-র ভাষ্যগ্রন্থে আছে, এটি ৬০ ভলিউম সম্বলিত। হাদীসের গঠনমূলক সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে ইবনে আদী (র)-এর *আল-কামিল* গ্রন্থখানির স্থান অতীব উর্ধ্বে। একে পূর্ণাঙ্গতম গ্রন্থ মনে করা হয়। ইবনে তাহের (র) হাদীসগুলো একত্র করে আরবী বর্ণমালার অনুক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন। *আল-কামিল* গ্রন্থের পাদটীকা লিখেছেন ইবনুর রূমিয়া আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুফাররাজ আল-উমুবী আল-আন্দালুসী আল ইশবীলী (র)। তাঁর এ পাদটীকাটি *আল-হাফী ফী তাকমিলাতিল কামিল* নামে পরিচিত। এটি একটি বিশাল গ্রন্থ। এরূপ আবু জা'ফর আল-উকায়লী (র)-এর *কিতাবুয যুয়াফা* ও আল্লামা দায়লামী (র)-এর *মুসনদুল ফিরদাওস* চতুর্থ স্তরের কিতাব। এতে তিনি ১০ হাজার সংক্ষিপ্ত বাচনিক হাদীস আরবী বর্ণমালার অনুক্রম অনুযায়ী একত্র করেছেন। ইমাম হাফেয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (র)-এর *তারীখুল খোলাফা*, হাফেয ইবনে আসাকির (র)-এর ৮০ ভলিউমে মুদ্রিত *তারীখে দামিশক* এবং খতীব বাগদাদী (র)-এর প্রায় ২০ ভলিউমে লিখিত *তারীখে বাগদাদ* এ সকল কিতাব চতুর্থ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

হাকীম তিরমিযী (র)-এর *নাওয়াদিরুল উসূল*, ইবনে আদী (র)-এর *আল-কামিল* এবং উকাইলী (র)-এর *কিতাবুয যুয়াফা* সম্পর্কে শাহ আবদুল আযীয (র)-এর এ মন্তব্য অতীব যথার্থ। তিনি বলেন, এ গ্রন্থগুলোর হাদীস দুর্বল। এর কারণ যেসব মনীষী এ গ্রন্থগুলোতে দুর্বল বর্ণনাকারীদের আলোচনা লিখেছেন, সেই সাথে তাদের হাদীসগুলোও বর্ণনা করেন। কিন্তু অপর কিতাবগুলোতে এমন বর্ণনাসমূহ দুর্বল, যা অপর কোন কিতাবে বর্ণিত

নেই। তাহলে সেগুলোতে এমন কিছুসংখ্যক হাদীস আছে যা বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছয়টিতেও বর্ণিত রয়েছে। এরূপ হাদীসগুলোকে সাধারণভাবে দুর্বল বলা যাবে না।

বিশুদ্ধতার বিচারে হাদীস গ্রন্থাবলির পঞ্চম স্তর

পঞ্চম স্তরে সেসব গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলো জাল হাদীসের আলোচনায় রচিত হয়েছে। যেমন– ইমাম ইবনু জাওযী (র)-এর *আল-মওযূআতুল কুবরা*, সানআনী (র)-এর *আল-মওযূআত*, হাফেয জালাল উদ্দীন আস-সুয়ুতী (র)-এর *আল-লা'আলিল মাসনূআ ফিল আহাদীসিল মওযূআ*। এগুলোর ব্যাপারে সর্বজ নিবিদিত অভিমত হচ্ছে, এগুলো মওযূ তথা জাল হাদীসসমূহের সংকলন।

৪র্থ অধ্যায়

কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান বাস্তবায়নে মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামের কাঠামোকে আমরা যদি মানব দেহের কাঠামোর সাথে তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারব ইসলামের সুরক্ষায় কুরআ'ন ও হাদীসের গুরুত্ব কতখানি। দুটি হাত, দুটি পা, দুটি চোখ বা কান না হলে আমরা জীবনবাহী মানব দেহের কথা চিন্তা করতে পারি না। ইসলামেরও দুটি অংশ বা জোড়া রয়েছে। এর একটি তাওহীদ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, দ্বিতীয়টি রেসালাত বা আল্লাহর নবীর নবুওয়াতের উপ সুদৃঢ় ঈমান। অনুরূপভাবে জীবনে সঠিক ও সুন্দর পথে চলতে হলে রেল লাইনের দুটি বিটের মতো সিরাতুল মুস্তাকীমের দুটি বিষয়ভিত্তিক পরিচয় আমাদের সামনে থাকতে হবে। একটি কুরআ'ন , অপরটি আল্লাহর নবীর হাদীস বা সুন্নাহ। আমরা ইতোপূর্বে কুরআ'ন ও হাদীসের পরিচয় পেয়েছি। এই কুরআ'ন ও হাদীসই মুসলিম জীবনের পথের দিশারী। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও শান্তি এই দুইয়ের অনুসরনের উপর নির্ভরশীল। মহানবী (সা) বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

> 'তোমাদের কাছে আমি দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এগুলো সুদৃঢ়ভাবে ধারন করবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআ'ন) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত।[২১৯]

এখন প্রশ্ন হল, কুরআ'ন ও হাদীসকে আমরা কীভাবে অনুসরণ করব? কুরআ'ন ও হাদীসের সব কথা কি সবার পক্ষে সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব। কিছু কথা বা বিধান তো সহজে বুঝা যায়। তাতে কোনো দ্ব্যর্থ বোধক কিছু নেই। কিন্তু কতক বাণী তো এমন যে, তা ব্যাখ্যা না করলে সাধারণ লোকদের পক্ষে বুঝা ও তা অনুসরণ করা সম্ভব নয়। যারা এই ব্যাখ্যা দিবেন বা কুরআ'ন ও হাদীসের বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও অনুসিদ্ধান্ত রাখার যোগ্যতা রাখেন পরিভাষায় তাদের বলা হয় মুজতাহিদ। তারাই নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন মূলনীতির আলোকে কুরআ'ন সুন্নাহর বাহ্যত বিপরীতমুখী বিষয়াদির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান দিয়েছেন। তারা নতুন নতুন উদ্ভুত প্রশ্ন বা মাসআলা, যার বিধান সরাসরি কুরআ'ন সুন্নাহে বর্ণিত নেই, সেখানে কোন মূলনীতির আলোকে হুকুম-আরোপিত হবে, সেই মূলনীতিও নির্ধারণ করেছেন। তারা মানব জীবনের চাহিদা অনুযায়ী সাধারণের পালনীয় জীবন জিজ্ঞাসার যেসব জবাব কুরআ'ন ও হাদীস অনুসন্ধান করে দিয়েছেন সেই জবাব বা সমাধান সমষ্টিকে বলা হয় মাযহাব বা পথচলার নীতিমালা।

প্রশ্ন আসতে পারে কুরআ'ন ও হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মাযহাব কেন মানতে হবে? সরাসরি কুরআ'ন ও হাদীসকে অনুসরণ করলে অসুবিধা কোথায়?

---

২১৯ ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র), *আল-মুআত্তা*, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫, খ. ২, পৃ. ৮৯৯

মাযহাব পালনের কথা এই জন্য বলা হয় যে, যেহেতু কুরআ'ন সুন্নাহ সম্পর্কে আলেম খুবই নগণ্য। বিশেষত তারা কুরআনে কারীমের কোন আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে, কোন আয়াতের হুকুম বহাল আছে, কোন আয়াত কোন প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে, কোন আয়াত কাদের উদ্দেশ্য করে নাজিল হয়েছে। কোন আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ কি? আরবী ব্যাকরণের কোন নীতিতে পড়েছে এই বাক্যটি? এই আয়াত বা হাদীসে কী কী অলংকারশাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে? ইত্যাদী সম্পর্কে বিজ্ঞ হন না; সেই সাথে কোনটি সহীহ হাদীস কোনটি দুর্বল হাদীস? কোন হাদীস কি কারণে দুর্বল? কোন হাদীস কী কারণে শ[3]শালী? হাদীসের বর্ণনাকারীদের জীবনী একদম নখদর্পনে থাকা আলেম এখন নাই, অথচ হাদীসের শ[3]শালী না হলে তার দ্বারা শরয়ী হুকুম প্রমাণিত হয়না। এসব কারণে সাধারণভাবে সবার পক্ষে কুরআ'ন সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে সঠিক মাসআলা বা অনুসিদ্ধান্ত বের করা ও অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। কাজেই এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ মুজতাহিদ আলেমের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলা আমাদের উপর কর্তব্য। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যায়, কুরআ'ন মজীদে সালাত শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-اقيموا الصلاة "তোমরা নামায কায়েম কর।' আরেক আয়াতে বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

তথানিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেস্তারা নবীজীর উপর সালাত পড়ে। এই আয়াতের শেষাংশে এসেছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'হে মুমিনরা তোমরাও তাঁর উপর সালাত পড় এবং তাঁকে সালাম জানাও।'[২২০]

এই সকল স্থানে"সালাত" শব্দটি লক্ষণীয়। তিনটি স্থানে সালাত এসেছে। এই তিন স্থানের সালাত শব্দের ৪টি অর্থ। প্রথম অংশে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল "নামায" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা নামায কায়েম কর।[২২১]

আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও তার ফেরেস্তারা নবীজী (সা) এর উপর সালাত পড়েন মানে হল- আল্লাহ তা'আলা নবীজী (সা) এর উপর রহমত পাঠান, আর ফেরেস্তারা নবীজী (সা) এর জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন।

আর তৃতীয় আতাংশে "সালাত" দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মতরা যেন নবীজী (সা) এর উপর দরূদ পাঠ করে।

একজন সাধারণ পাঠক বা সাধারণ আলেম সালাত শব্দের অর্থগত এই পার্থক্যের কথা কিভাবে জানবে? তিনি যদি নামাযের স্থানে রহমাত অর্থ করেন, আর রহমতের স্থানে বলেন যে, রাসূলের প্রতি দরূদ, আবার দরূদের স্থানে নামায অর্থ গ্রহণ করেন তাহলে নিশ্চয়ই জগাখিচুড়ি হবে।

---

২২০ আল-কুরআ'ন - ৩৩ : ৫৬

২২১ আল-কুরআ'ন - ২ : ৪৩

এরকম অসংখ্য স্থান আছে, যার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। তাই একজন বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির শরাপন্ন হয়ে তার গবেষণা অনুযায়ী উক্ত বিষয়ের সমাধান নেয়াটাই হল যৌক্তিক। এই নির্দেশনাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

'তোমরা না জানলে যারা জ্ঞান রাখে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও।' {সূরা নাহল-৪৩}

এক ধরনের প্রচারণা আমাদের ধর্মীয় যুব সমাজের মন মস্তিষ্ককে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা বলতে চায় যে, আমাদের তো কুরআ'ন ও হাদীসই যথেষ্ট। আবার নতুন নতুন গবেষণা বা নতুন সিদ্ধান্ত উদ্ভাবনের প্রয়োজন কেন? কেনই বা ফিকহশাস্ত্রের উৎপত্তি বা মাযহাবের প্রয়োজন হবে। মাযহাব হলে তো একটিই। সেটি কুরআ'ন ও হাদীস। আপাত সুন্দর এই কথার মধ্যে এক ধরনের মৌলবাদী গোড়ামীর চিন্তা কাজ করছে। কুরআ'ন ও হাদীসের বাইরে আর কিছু চর্চা করা বৈধ না হলে বিশাল ফিকহশাস্ত্র, আরবি সাহিত্য ও ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, দর্শন, কালামশাস্ত্র এমনকি তাফসীরশাস্ত্রও অকেজো হয়ে যাবে। তাদের বোধোদয়ের জন্য নবী করিম (সা)-এর একটি হাদীসই যথেষ্ট, যাতে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلىَ الْيَمَنِ قَالَ قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ برَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ

'হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন মু'আয বিন জাবাল (রা) কে ইয়ামেনে গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন তখন মু'আয (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন-"যখন তোমার কাছে বিচারের ভার ন্যস্ত হবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সাল করবে?" তখন তিনি বললেন-আমি ফায়সালা করব কিতাবুল্লাহ (কুরআ'ন) দ্বারা। রাসূল (সা) বললেন-যদি কিতাবুল্লাহতে সমাধান না পাও? তিনি বললেন-তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব। রাসূল (সা) বললেন-যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতে না পাও? তখন তিনি বললেন-তাহলে আমি ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত দেয়ার চেষ্টা করব এবং এ ব্যাপারে কোনো অলসতা করব না। মু'আয তখন রাসূল (সা) তাঁর বুকে চাপড় মেরে বললেন-যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই তৌফিক দিয়েছেন যে ব্যাপারে তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট।'[২২২]

২২২ সূনানে আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৫৯৪, সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং-১৩২৭, সুনানে দারেমী, হাদিস নং-১৬৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২২০৬১

এই হাদীসে লক্ষণীয় হল, রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় হযরত মু'আয (রা) বলছেন যে, আমি কুরআ'ন সুন্নাহয় না পেলে নিজ থেকে ইজতিহাদ করব, আল্লাহর নবী বললেন-আল-হামদুলিল্লাহ। বস্তুত কুরআ'ন ও হাদীস থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নবী করিম (সা)-এর এই অনুমোদন থেকে ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীতে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনার প্রয়োজনে মাযহাবের সৃষ্টি হয়।

ইসলামের গতিশীলতার রক্ষাকবচ ইজতিহাদ

কোনো ধর্ম, কোনো জাতি, কোনো সংস্কৃতি, কোনো জীবনবিধান শুধুমাত্র অতীতের বিভিন্ন সাধনা, বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে জীবিত থাকতে পারে না। অতীতের দোহাই দিয়ে সময়ের নবোদ্ভূত মাসআলা ও জটিলতা থেকে দায়িত্বমুক্ত থাকতে পারে না। বরং নব উদ্ভুত সব সমস্যা সমাধানের পথ ও প্রক্রিয়া উন্মুক্ত থাকতে হবে। নচেত জাতীয় জীবন গভীর স্থবিরতা ও অচলাবস্থার মুখোমুখি হতে বাধ্য হবে। এই বাস্তবতাটি ইসলামের ন্যায় একটি গতিশীল ধর্ম ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও শতভাগ সত্য। কাজেই প্রত্যেক যুগে ও প্রতিটি ভূখণ্ডে ইজতিহাদে মুতলাক না হোক; নিদেনপক্ষে কিয়াস ও ইসতিম্বাত, কিতাব ও সুন্নাহর ওপর সুদূর দৃষ্টি, উসূলে ফিকহ ও শরী'আর নীতিমালা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা এবং তাত্থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম প্রত্যেক যুগে, প্রতিটি পরিবেশে, প্রতিটি দেশে ইজতিহাদী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনকে নতুন নতুন অচলায়তন হতে উদ্ধার করেছেন।

যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দানে ইজতিহাদ

আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতি, শিল্প, আমদানী-রফতানী, লাভ-লোকসান আন্তর্জাতিক ব্যবসা, ব্যাংক বীমা, এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি ও অভিজ্ঞতা ইসলামী সমাজের সামনে নতুন নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করছে। পশ্চিমা সভ্যতা ও বস্তুজাগতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাবে প্রতিনিয়ত এমন নতুন নতুন মাসআলা জন্ম নিচ্ছে, যেই মাসআলাগুলো ইতোপূর্বে আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের কল্পনাতেও আসেনি। কাজেই আজ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই মাসআলা, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে শরী'আর মূলনীতি, কুরআ'ন ও সুন্নাহর পথনির্দেশনা এবং ফিকহর ভাণ্ডারের আলোকে নতুন প্রজন্মের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব সার্থকতার সঙ্গে আঞ্জাম দিতে হবে।

এই কাজটি যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, ততোটাই নাজুক। এখানে সামান্য ভুল ঘটে গেলে বা কোনো পক্ষের প্রতি যৎসামান্য পক্ষপাতিত্ব হয়ে গেলে কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করা হলে দ্বীনের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এটি শুধুমাত্র জায়েয ও নাজায়েযের গণ্ডির ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গুনাহ ও হারামের পঙ্কিল গহ্বরে নিপতিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

শরী'আ সম্পর্কিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভাসাভাসা জ্ঞান, ফিকহ ও উসূলে ফিকহর অস্বচ্ছ বিদ্যা আর ছায়াজ্ঞান নিয়ে এ ময়দানে অগ্রসর হওয়া যাবে না। জাতির এই খেদমত আঞ্জাম দিতে হলে রীতিমত শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ অর্জন করতে হবে। তার দায়িত্ব হবে, কুরআ'ন ও সুন্নাহর আলোকে, ফিকহ ও উসূলে ফিকহর নীতিতে, সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে সহীহ ও দ্বিধাহীন ফয়সালা জানিয়ে দেয়া।

ভ্রান্তির কবল থেকে বাঁচাতে পারে ইজতিহাদ

বাস্তবতা হলো, প্রতিটি যুগেই মানুষ ভুল, বিচ্যুতি, বাঁকা পথ ও পথচ্যুতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এমন বিশেষজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়ে থাকে, যিনি নিজ শাস্ত্রে ও নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা, অন্যদের অপেক্ষা অধিক বুৎপত্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। বিভিন্ন জ্ঞান, শাস্ত্র, গবেষণা ও নিরীক্ষণের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এরচেয়েও অধিক উজ্জ্বল, স্পষ্ট ও দিব্য বাস্তবতা হলো, দ্বীনের ওপর আমল করতে, নিত্য নব উদ্ভূত মাসআলাসমূহের ব্যাপারে শরী'আর বিধান জানতে এমন বিশেষজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞের দারস্থ হতে হবে যিনি শুধু নিজ শাস্ত্রেই প্রভূত দক্ষতার অধিকারী হবে না, বরং তাকে যেমন ওই শাস্ত্রের যাবতীয় গবেষণা ও তথ্যের মর্মমূলে পৌঁছানোর মতো গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানসমুদ্রের অধিকারী হতে হবে, তেমনি তাকে এই মানসিকতার অধিকারী হতে হবে যে, আমি যদি লোকদেরকে তাদের দ্বীনি মাসআলা ও বিধানসমূহ সম্পর্কে অবগত করি, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে এর জন্যে প্রভূত সাওয়াব ও পুরস্কারের দাবীদার হবো। তাঁর ভেতর এ চেতনা থাকতে হবে যে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব ও ইলমী আমানত অন্যদের কাছে পৌঁছানোর এ কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। সেই জবাবদিহীর চেতনা অবচেতনভাবেই তার অন্তকরণে বদ্ধমূল থাকতে হবে। হিসাব-কিতাবের ভয়ে তাঁকে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথমদিকের যুগগুলোতে, বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের যুগে জনসাধারণ ফিকহী আহকাম ও মাসাইল জানার জন্যে স্বভাবতই এমন ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হতেন যারা প্রথমত দ্বীনি বিদ্যাগুলোতে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতেন, দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মাসআলা ও জটিলতা নিরসন করাকে, শরী'আর বিধান জানানোকে এবং কুরআ'ন -সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের পথদেখানোর কাজটিকে অশেষ সাওয়াব ও পুরস্কারের কাজ এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম বিবেচনা করতেন। উক্ত আমানত আদায় করাকে নিজেদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, এ কাজের জন্যে আমাকে কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহী করতে হবে।

ফিকহী চিন্তাধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের ইতিহাসের সূচনাকালীন যুগগুলোতে কোনো বিশেষ ও নির্দিষ্ট ফিকহী চিন্তাধারা বা কোনো বিশেষ মাযহাব অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা ছিলো না। সবসময় নির্দিষ্ট একজনের দ্বারস্থ হওয়ার রেওয়াজ ছিলো না। বরং প্রশ্নকারী যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে দ্বীনি ও ফিকহী আহকাম ও মাসাইল জেনে নিতেন। কেননা প্রথমত এটা ছিলো সে যুগের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত ঈমান ও ইহতিসাবের চেতনা সর্বত্র বিরাজমান ছিলো। সঠিক কথা জানা ও হক পর্যন্ত পৌঁছানোর উদ্দীপনা সে যুগের সবার মাঝেই জাগ্রত ছিলো। তৃতীয়ত, সব জায়গাতেই জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ছিলো। গবেষণা ও আলোচনার আসর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

কিন্তু পরবর্তীতে এমন যুগ এসে পড়ে, যখন সময়ের চাহিদায় সময় ও শ্রম বাঁচানোর স্বার্থে, সত্য ও ন্যায় সন্ধ্যানের জন্যে লোকেরা ফিকহী চর্চাকেন্দ্রগুলোর শরণাপন্ন হতে শুরু করে। সেই চর্চাকেন্দ্রগুলো হতো সত্য ও

ন্যায়ের যোগ্য মুখপাত্র। সেখানকার জ্ঞান ও গবেষণা, আমানত ও বিশ্বস্ততা এবং খোদাভীরুতা ছিলো সততই নির্ভরযোগ্য। তখন থেকে কোনো বিশেষ ফিকহী চর্চাকেন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়াটা একটি সাধারণ ও অনুসরণীয় পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ পদ্ধতিটি সবার মনোপূত হয়। কারণ এটি ছিলো সবার জন্যে সহজসাধ্য। এভাবে জ্ঞানের প্রয়োজনের নির্দিষ্ট ফিকহ চর্চাকেন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়াকে কেউ দোষণীয় মনে করতো না। এ ধরনের কাজকে কেউ বিদ'আত বা শিরকও বলতো না। এমন নয় যে, এখানে ইজমার পরিপন্থী কোনো ব্যাপার ঘটেছে। যার ফলশ্রুতিতে গোটা মুসলিম-বিশ্বে নির্দিষ্ট চারটি ফিকহী চর্চাকেন্দ্রের কোনো একটির শরণাপন্ন হওয়াটা একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। এভাবে শরণাপন্ন হওয়াটা জনগণের মাঝে যেমন কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, তেমনি এটিকে কেউ বিদ'আত বা গুমরাহী বলেও মন্তব্য করেনি। এর একমাত্র কারণ হলো, সেই ফিকহী চর্চাকেন্দ্রগুলো যেসমস্ত মাসায়েল প্রকাশ করতো সেগুলো ইসলামের মৌলিক উৎসদ্বয় কুরআ'ন ও সুন্নাহর মুতাবিক হতো। কাজেই তাদের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাদের নির্দেশিত আহকামের ওপর আমল করলে পক্ষান্তরে কুরআ'ন ও সুন্নাহর ওপরই আমল করা হতো। এই প্রাজ্ঞ অভিমত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীর। তিনি 'ইকদুল জিদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলীদ' পুস্তকে বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

ফিকহ সংকলনের গোড়ার কথা

বস্তুত ফিকহ এর সংকলন, মাসআলাসমূহের ইসতিম্বাত ও সমাধান নিরুপণ, শাখাগত মাসআলাসমূহ ও ফতোয়াসমূহের বিন্যাস; এগুলো ইসলামের এমন এক প্রয়োজন ছিলো; যেগুলোতে বিলম্ব করার কোনো সুযোগই ছিলো না। ইসলাম তখন আরব বদ্বীপ থেকে বেরিয়ে শাম, ইরাক, মিসর, ইরান সহ অন্যান্য বিশাল ও জনবহুল অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিলো। সামাজিকতা, ব্যবসা, রাষ্ট্রব্যবস্থা; এগুলোর সবক'টিই প্রসার লাভ করেছিলো। যা প্রতিনিয়ত নানামাত্রিক জটিল রূপ গ্রহণ করছিলো। এ সময় সেই নবোদ্ভূত অবস্থা ও মাসআলাজনিত সমস্যার ওপর ইসলামের মৌলিক নির্দেশনাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্যে প্রয়োজন ছিলো এমন কিছু ব্যক্তিত্ব; যাদের থাকবে অত্যন্ত ক্ষুরধার মেধা, যেকোনো বিষয়কে গভীর থেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা, সূক্ষদর্শিতা, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বিশদ অবগতি, মানবীয় মানসিকতা ও তার দুর্বলতা সম্পর্কে নিখুঁত সচেতনতা, জাতিগত স্তর ও জীবনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং এর পূর্বে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, শরী'আর চেতনা সম্পর্কে গভীর বুৎপত্তি, নববীযুগ ও সাহাবাযুগের সকল বিবরণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও ইসলামের গোটা জ্ঞানভাণ্ডার– কুরআ'ন , হাদীস, ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যের অধিকারী।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে এ সকল শাস্ত্রবিদ ইমাম ও মুজতাহিদদের জন্মগ্রহণ করাটা নিঃসন্দেহে এ ধর্মের জীবন এবং তার উম্মতের কার্যক্ষমতা ও প্রাণশক্তির উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যাঁদের সাধনা ও মেধার মাধ্যমে এই উম্মতের জ্ঞানচর্চার জগতে, এই উম্মতের লেনদেন-বিষয়ে একটি শৃঙ্খলা ও ঐক্য বলবৎ হয়েছে। এর ফলে ইসলাম ধর্ম সেই বিশৃঙ্খল মানসিকতা, অরাজক অর্থনৈতিক অবস্থা ও অস্থিতিশীল সামাজিক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেয়েছে; যেগুলোর সঙ্গে ইসলামকে তার সূচনালগ্নে মুকাবিলা করতে হয়েছে। ইমামগণ ফিকহ এর এমন এক ভিত্তিমূল প্রবর্তন করে গেছেন এবং এমন মৌলিক নির্দেশনার বিন্যাস দান করেছেন; যেগুলোর আলোকে পরবর্তীতে উদ্ভূত অসংখ্য সমস্যা ও জটিলতার অনায়াসে সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। সহায়ক সেই নির্দেশনার

আলোকে জনজীবন হতে পেরেছে ভারসাম্যপূর্ণ, আইন-আশ্রিত ও শরয়ী আলোক-প্রাপ্ত।

এ কথা সত্য যে, ইসলামী সভ্যতার উপর তাতারী আক্রমন ও ফেতনার পর উদ্ভূত বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে কতিপয় আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে 'ইজতিহাদ'-এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যথায় অনৈসলামিক শক্তি ও বেদ্বীনি শাসকশক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে এই ইজতিহাদকে একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার পর খুব দ্রুতই সময়ের চাহিদা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত নব নব সমস্যার সমাধানে উলামায়ে কেরাম পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন। যার উদাহরণ, আল্লামা শামী রহ.-এর 'রদ্দুল মুহতার' ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ফাতাওয়া আলামগীরির সংকলনসমগ্র প্রণয়ন।

পরবর্তী যুগেও আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ; যেখানে হানাফী ফিকহ মুসলিম জনজীবনকে দিকনির্দেশনা দানের বাতিঘর হিসেবে কাজ করছে, হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী রহ. মাওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গীমহল্লী রহ. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. সহ প্রমুখ বরেণ্য ও কালজয়ী ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সমকালীন বিভিন্ন মাসআলা ও যুগের চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন। আজ তাদের ফতোয়ার বিশাল ভাণ্ডার আমাদের জাতীয় সম্পদ।বিশেষ করে শাহ ওয়ালী্ উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) হাদীস শাস্ত্রের ন্যায় ফিকহশাস্ত্রের গতিপথ নির্ণয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তা কেবল উপমহাদেশ নয়; সমগ্র ইসলামী জাহানে জ্ঞানী মনীষীগণ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে আজকের প্রয়োজন

দ্বীনি ও শরয়ী বিধান জানার জন্যে মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদ ও ফিকহী প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের যেকোনো যুগ অপেক্ষা বর্তমান সময়ে অনেক বেড়ে গেছে। আগেকার যুগে ইমামগণ কুরআ'ন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা ইসতিম্বাত করতেন এবং এই দু' উৎস থেকে নিয়মিত আহরণ করতেন। অথচ বর্তমান সময়ে সেই মানের ও মনের মানুষের বড় অভাব। বর্তমান যুগটি হচ্ছে চিন্তাধারার বিশৃঙ্খলা, মানসিকতায় অনৈক্য, বস্তুজাগতিক প্রতিযোগিতা, মাযহাব বিরোধী নব্য ফেতনা ও নৈতিক শৈথিল্যের যুগ।

দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো, এমন নাজুক ও ফেতনাময় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত চার ইমামের ফিকহী চর্চাকেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র আকারে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। এ অঞ্চলের সিংহভাগ জনগণের মাযহাব হানাফী বিধায় এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে মুসলমানদে মাঝে পারস্পরিক বৈরীতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা শুধু বাড়তেই থাকবে।

অথচ ভারতীয় মুসলমানদের এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো ঐক্য ও সহাবস্থান। কেননা এ সময় তারা ব্রাহ্মণ্যবাদ, শিরক ও ধর্মবৈরী শক্তিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জেরও মুকাবিলা করে চলেছে।

ভারতীয় মুসলমানরা তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীদের শিরকসর্বস্ব আক্বীদা ও আমল, বিদআত ও কুসংস্কার, জাহেলী রুসম ও রেওয়াজ, অনৈসলামিক পার্সোনাল আইনের যাতাকলে প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে। কাজেই এ মুহূর্তে

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, নতুন প্রজন্মের দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা। সেখানেই আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। কেননা এ ভূখণ্ডে মুসলমানদের অস্তিত্ব ও জাতিসত্তা টিকিয়ে রাখা তখুনি সম্ভব হবে, যখন আমরা আমাদের আক্বীদা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দ্বীনি মর্যাদা ও আত্মবোধ, ইসলামী স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হব। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধর্মহীনতা ও ধর্মবিরোধীতার লক্ষণগুলো ক্রমেই ফুটে ওঠছে। যাকে ইরতিদাদ বা ধর্মচ্যুতি বা ধর্মদ্রোহিতা নামে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু সঙ্গত কারণেই আমরা ইরতিদাদ শব্দটি উচ্চারণ করতে চাই না। এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে উত্তম পথ ও মূলনীতি হচ্ছে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর বাতলানো পথ। তার সেই অবদানের প্রভাব ও ফলাফল আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাঁর সুযোগ্য সন্তানগণ সেই মিশন অব্যাহত রেখেছিলেন।

ইতিহাসের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা হলো, যখন কোনো ভুল বা সঠিক প্রশ্ন সামনে এসে যায় অথবা কোনো মানসিক বিবাদ দাঁড়িয়ে যায় বা দাঁড় করানো হয় অথবা কোনো বাস্তবতাকে যখন চ্যালেঞ্জ করা হয় তখন সেটিকে স্রেফ আবেগ প্রকাশ করে, কিংবা আবেগতাড়িত বক্তৃতা দিয়ে অথবা প্রতিবাদ-বিক্ষোভের মশাল দিয়ে প্রতিহত করা যায় না। তার জন্যে প্রয়োজন এমন বুদ্ধিবৃত্তিক মোর্চা, যা স্রেফ তর্কসর্বস্ব কথামালা দিয়ে নয়, বরং জ্ঞানজ প্রমাণের প্রজ্ঞা দিয়ে চিন্তা ও বুদ্ধির গাম্ভীর্যমাখা উত্তর দেবে।

এক্ষেত্রে আবেগ বর্জন করে বিবেক প্রয়োগ করতে হবে। অগ্নিগোলা নিক্ষেপকারী বক্তৃতা না ঝেড়ে হৃদয়গ্রাহী, দরদমাখা আলোচনা পেশ করতে হবে। আর তার জন্যে যেমন ইসলামী শরী'আ, কুরআ'ন ও সুন্নাহ, তাফসীর ও হাদীস, ফিকহ ও উসূলে ফিকহ এর ওপর বিশুদ্ধ ও গভীর শিক্ষা অর্জন করতে হবে, তদ্রুপ অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠীর পারিবারিক আইনের ওপরও স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে। অন্যথায় ইসলামের পারিবারিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বকীয়তা প্রমাণিত করা সম্ভব হবে না।

ইসলামী আইনের আধুনিক সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী সংবিধানের বৈশিষ্ট ও সমকালীন অন্যান্য সংবিধানের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র প্রমাণিত করা এবং ইসলামের নীতিমালা ও বিধি-বিধানের ওপর বিজ্ঞোচিত দৃষ্টিপাত করার এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত নাজুক ও বৈপ্লবিক।

উদাহরণ স্বরূপ চাঁদ দেখা ও তার প্রমাণিত হওয়া প্রসঙ্গে কয়েকটি নতুন মাসআলা কয়েক বছর যাবত জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে যাচ্ছে। একটি হলো, আধুনিক প্রচারযন্ত্র ও প্রচারমাধ্যম তথা রেডিও, তারবার্তা, টেলিফোন ও ডাকের মাধ্যমে চাঁদ দেখার অবগতি লাভ করা এবং সেই বার্তা সম্প্রচার করা। দ্বিতীয় বিষয় হলো, চাঁদের উদয়স্থল (مطالع)-এর ভিন্নতা নিয়ে বিতর্ক। এ বিষয়টি পূর্ব থেকেই একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা। বর্তমানে মহাকাশ বিদ্যা ও আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন গবেষণা এবং আধুনিক বিভিন্ন ধরনের প্রচারযন্ত্র ও প্রচারমাধ্যমের উপস্থিতি বিষয়টিকে নতুন করে চিন্তা-ভাবনার আঁতশী কাঁচের নিচে নিয়ে এসেছে। তৃতীয় বিষয় হলো, সমগ্র পৃথিবীতে একই দিনে ঈদ উদযাপনের মানসিকতা অনেকগুলো মুসলিম দেশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছে। অনেকগুলো মুসলিম সংগঠন এটিকে ইসলামী ঐক্যের প্রতীক ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রয়াস মনে করছে। অনেকগুলো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও কিছু কিছু মুসলিম প্রশাসন অনেক দিন যাবত সেটির পালে

হাওয়া জুগিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টিকে আরবী পত্র-পত্রিকায় **توحيد أعياد** শব্দে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যও মসিলিম উম্মাহকে ইজতিহাদের পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে। ইজতিহাদ তাকলীদ ও মাযহাব মানি না– এ ধরনের ভাগাড়ম্বরতা দিয়ে এই সংকটের উত্তরণ ঘটানো যাবে না।

প্রথমত মুসলিম জাহানের আধুনিক উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়ত যারা প্রশাসন ও রাজনীতির বাগডোর ধারণ করে আছেন, তারা বিভ্রান্তি, ভুল বুঝাবুঝি এবং দ্বীন থেকে এক প্রকার নৈরাশ্যের কারণে চরম স্থবিরতার শিকার। এই স্থবিরতা অনেক দিন যাবত ইসলামী জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্র ও সেখানকার প্রতিনিধিদের ওপর ছায়াবিস্তার করেছে।

সেই স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে যেই শাস্ত্রটি মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিলো তা এক পর্যায়ে নিজস্ব যোগ্যতা ও উপকারিতা খুইয়ে ফেলছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানবজীবনের পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে আগের মতো নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দেখাতে পারছে না। অথচ প্রতিযোগিতাময় বর্তমান বিশ্বে তা খুবই প্রয়োজন।

ইসলামী জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রসমূহের প্রাচীন সিলেবাসের মাঝে পরিবর্তনের গতি খুবই ধীর ; অথচ বর্তমান যুগটি খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল। যুগের চাহিদাকে লক্ষ্য করে ইসলামী জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রগুলোর সিলেবাসের মৌলিকত্বের মাঝে প্রযোজনীয় সংস্কার সাধিত হয়নি। অথচ অথীতে যারা মুসলিম ইম্মাহর চাহিদার আলোকে সিলেবাস তৈরী করেছিলেন, তারা ছিলেন ইলমী ও তা'লীমি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তারা সবসময়ই নিজেদের মেধা ও বাস্তববাদীতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং সর্বযুগেই সংস্কার, পরিবর্তন ও সংযোজনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শুরু হতেই তার ধারাবহিকতায় বিপত্তি ঘটে। ফলে যুগের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে সিলেবাস বিন্যাসের প্রক্রিয়াটি একটি স্থানে এসে থেমে যায়।

সন্দেহ নেই যে, মুসলিম জাহানের নানা প্রান্তে এমন যোগ্যতার অধিকারী দ্বীনি ব্যক্তিত্ব অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করেছেন, যাঁরা নিজস্ব মহলকে নিজেদের শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব দিয়ে জয় করতে পেরেছেন এংব একটি বৃহৎ শ্রেণিকে মানসিক ধর্মহীনতার কবল থেকে রক্ষা করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিকহ ও ইসলামী মাসায়েলের ওপর একটি পর্যায় পর্যন্ত ব্যক্তিউদ্যোগে কাজও করেছেন। ফিকহ ও ইসলামী সংবিধানকে নতুন পোষাকে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু মুসলিম জাহানে একটি এমন শক্তিশালী বৈশ্বিক আন্দোলনের শূন্যতা বরাবরই অনুভূত হচ্ছিলো এবং এখনো হচ্ছে, যা বর্তমান প্রজন্মকে ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে জুড়ে দেবে। তাদের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করবে। ইসলামী শাস্ত্রসমূহে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে এবং এই বাস্তবতাকে প্রমাণিত করে তুলবে যে, ইসলামী আইন ও ফিকহ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি একটি উন্নয়নশীল প্রক্রিয়া। ইসলামী ফিকহ এমন শাশ্বত মৌলনীতির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত; যা কখনই সেকেলে ও অকার্যকর হয় না। যার মাঝে জীবনের সর্বধরনের পরিবর্তন ও উন্নয়নকে সঙ্গ দেয়ার পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে। যার উপস্থিতিতে কোনো মানবরচিত ও আইনের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটাই বর্তমান যুগের সেই অতীব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ; যা ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে এবং বিদ্যমান ইসলামী সমাজকে মানসিক ও সামাজিক ধর্মহীনতার কবল থেকে রক্ষা করতে পারবে। একই সাথে পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা ধুলিঝড় ও আধুনিকতার সয়লাব থেকে মুসলিম উম্মাহকে সুরক্ষিত রাখবে। আল্লামা

আল্লামা ইকবাল –যিনি আধুনিক বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন, তিনি এই কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে কলম ধরেছেন। কাজটিকে তিনি একটি তাজদীদি কীর্তি অভিহিত করেছেন। তিনি এক স্থানে লিখেছেন,

> 'আমার বিশ্বাস হলো, যে ব্যক্তি বর্তমান যুগের জুরিসপ্রোডেন্স (Jurisprudence) তথা আইননীতি-এর ওপর একটি সমালোচনাত্মক দৃষ্টি দিয়ে কুরআ'নী বিধি-বিধানের চিরন্তনত্ব প্রমাণিত করবেন তিনিই হবেন ইসলামের মুজাদ্দিদ। মানবসম্প্রদায়ের জন্যে সবচেয়ে বড় সেবক তিনিই প্রতিপন্ন হবেন। প্রায় সমস্ত দেশেই বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ হয়তো নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছেন অথবা ইসলামী আইনের ওপর চিন্তা–ভাবনা করছেন। মোটকথা, বর্তমান যুগ জ্ঞানগত কর্মের যুগ। কেননা, আমার ক্ষুদ্র অভিমত হলো, বর্তমান সময়ে ইসলাম ধর্মকে যুগের মাপকাঠির ওপর যাচাই করা হচ্ছে। সম্ভবত ইসলামের ইতিহাসে এমন সময় ইতোপূর্বে কখনই আসেনি।'[২২৩]

ইসলামী ফিকহ এর আধুনিক সংস্করণ ও বিস্তৃতকরণের কাজ করার অর্থ এ নয় যে, এর মাধ্যমে কোনো নতুন সংবিধানের ভিত্তিপ্রস্থর রাখতে হচ্ছে আ তার জন্যে নতুন নীতিমালা গঠন করা ও একটি অস্তিত্বহীন জিনিসকে অস্তিত্ব দান করার প্রয়োজন পড়বে। কেননা ইসলামী ফিকহ ও আইনমালার এই বিশাল পুজি এবং মানবমেধা ও সাধনার এই বিরল বিস্ময়কর নমূনা –যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আইনী ভাণ্ডারসমূহে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর– এটি জীবনের অনেকগুলো বৃহদাংশ এবং প্রাচীন জীবনের সবগুলো অংশকে বেষ্টন করে আছে। এখন প্রয়োজন হলো, তার বিজ্ঞোচিত মৌলনীতি ও তত্ত্বগুলো থেকে–যা সরাসরি কুরআ'ন ও হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, নতুন নতুন শাখাসমূহ উদ্ভাবন
করতে হবে। সেগুলো থেকে বর্তমান জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা সংগ্রহ করতে হবে।

প্যারিস সম্মেলনের অভিজ্ঞতা

ফিকহশাস্ত্রের বিস্তৃতি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার আইনী তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্যে প্রখ্যাত সিরিয় পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ মুসতফা আহমদ আয যরক্বা-এর একটি মূল্যায়ন উপস্থাপন করছি। এটি তার রচনা المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية-এর ভূমিকা থেকে একটি চয়িত। সেখানে তিনি প্যারিস ইউনিভার্সিটির ইসলামী আইন সম্পর্কিত সপ্তাহব্যাপী সেমিনারে পশ্চিমা আইন বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

> সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবিধানসমূহের আন্তর্জাতিক একাডেমীর প্রাচ্য আইন শাখা প্যারিস ইউনিভার্সিটির কলেজ বিভাগে ২ জুলাই ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে 'ইসলামী ফিকহ সপ্তাহ' উদযাপন করে এবং এ উপলক্ষে একটি কনফারেন্স আয়োজন করে। কনফারেন্সটি প্যারিস ইউনিভার্সিটির ইসলামী ফিকহ অনুষদের প্রফেসর মুসিও মিলিয়টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আরব-অনারব বিভিন্ন দেশের আইন কলেজের অধ্যাপক, জামিয়াতুল আযহারের প্রতিনিধি, আরব ও ফ্রান্সিস আইনবিদসহ

২২৩. ইকবালনামা, ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান, ২০১২, ১খ. পৃ-৫০-৫১

ওরিয়েন্টালিস্টদের বৃহৎ সংখ্যায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। মিসর থেকে চারজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসেন। দু'জন জামিয়া ফুয়াদ থেকে। একজন জামিয়া ইবরাহীম ল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং আল-আযহারের هيئة كبار العلماء-[২২৪]এর একজন প্রতিনিধি। দামেশক ইউনিভার্সিটির ল কলেজের পক্ষ থেকে আমি এবং ডক্টর মা'রূফ আদ-দুয়ালিবী প্রতিনিধিত্ব করেছি। প্রতিনিধিগণ দেওয়ানী, ফৌজদারী ও অর্থনীতি সংক্রান্ত আইনমালাকে পাঁচটি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করেন। শিরোনামগুলো একাডেমীর পক্ষ থেকে পূর্বেই নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিলো। যা নিম্নরূপ–

১. মালিকানা প্রমাণ। ২. জনস্বার্থে জনসম্পত্তি অধিকৃত করণ। ৩. অপরাধের দায়িত্ব। ৪. ইজতিহাদী চিন্তাধর্মের একটির ওপর অন্যটির প্রভাব বিস্তার। ৫. সূদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি।

এই লেকচার ও আলোচনাগুলো হয়েছিলো ফরাসী ভাষায়। প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্যে একটি করে দিন নির্ধারণ করা হয়েছিলো। প্রতিটি লেকচার শেষে আলোচক ও কনফারেন্সে আগত প্রতিনিধিদের মাঝে আলাপ-আলোচনা হতো। যা বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কখনো দীর্ঘ হতো, কখনো হতো সংক্ষিপ্ত। সেগুলোর সারসংক্ষেপ লিখে নেয়া হতো।

উক্ত আলোচনার মাঝপথে একজন সদস্য –যিনি প্যারিসের বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন– দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না যে, একদিকে একটি সাধারণ ধারণা আমাদের সবার মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে যে, ইসলামী ফিকহ হচ্ছে স্থবির। তার মাঝে আধুনিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণের যোগ্যতা নেই। অপরদিকে আজকের কনফারেন্সের ভাষণসমূহ ও আলোচনাসমূহের মাঝে মৌল নীতিমালা ও প্রমাণাদির আলোকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য প্রমাণিত হচ্ছে। কাজেই এ দু'টির মাঝে আমি কীভাবে সমন্বয় দেবো'?

কনফারেন্স শেষে সমস্ত প্রতিনিধির ঐক্যমত্যে একটি প্রস্তাবনা পাস হয়। যার ভাষ্য নিম্নরূপ–

'এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীগণ সে সকল আলোচনার প্রেক্ষিতে যা ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে উত্থাপন করা হয়েছে এবং সে সকল বিষয়াবলির ভিত্তিতে নিম্নের বিয়ষগুলো স্পষ্টাকারে প্রকাশ করেন যে,

ক. ইসলামী ফিকহ এর একটি বিশেষ (আইনী ও সাংবিধানিক) মূল্য রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

খ. এই বিশাল আইনী সম্পদের মাঝে ফিকহী মাযহাবগুলোর এই ইখতিলাফ, জ্ঞানভাণ্ডার, প্রমাণাদি ও আইনী নীতিমালাসমূহের বিপূল ভাণ্ডার রয়েছে, যা অবশ্যই প্রশংসা ও স্তুতির যোগ্য দাবীদার। যার মাধ্যমে ইসলামী ফিকহ আধুনিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করার সম্যক যোগ্যতা রাখে।

২২৪. এটি উলামায়ে আযহারের একটি বড় কাউন্সিল; যা অতি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি ও ইলমী সমস্যার সমাধান প্রদান করে থাকে।

আমরা এই ইচ্ছে ব্যক্ত করছি যে, এ ধরনের সপ্তাহ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হোক। উপরন্তু আমরা কনফারেন্সের সেক্রেটারীকে এই দায়িত্ব অর্পণ করছি যে, তিনি সেই বিষয়গুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন, যেগুলোকে আগামীর অধিবেশনে আলোচনা ও চিন্তা–ভাবনার ভিত্তিমূল বানানোর প্রয়োজন পড়বে এবং বিগত আলোচনার আলোকে যেগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

কনফারেন্সের প্রতিনিধিগণ এ আশাও পোষণ করছে যে, ইসলামী ফিকহ এর একটি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হোক। যার মাধ্যমে আইনের গ্রন্থাবলি থেকে উপকার গ্রহণ করা ও সেগুলোর শরণাপন্ন হওয়ার সুবিধা লাভ হবে। সেটি এমন এক ফিকহী বিশ্বকোষ হবে, যার মাঝে ইসলামী আইনের যাবতীয় তথ্য আধুনিক রীতিতে সংকলন করা হবে'।[২২৫]

পূর্বেকার যুগের তাকলীদ ও তার ধরন

ইতিহাস থেকে যতোদূর জানা যায়, হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে কেনো এক ইমাম বা কোনো এক (ফিকহী) মাযহাব অনুসরণ করার প্রচলন গড়ে ওঠেনি। লোকেরা দ্বীনের ওপর আমল করতো নির্দিষ্ট কোনো আলেমের তাক্বলীদ বা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে। তারা মনে করতো, তারা শরী'আর ওপর আমল করছে। তারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করছে। প্রয়োজন দেখা দিলে তারা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিতো এবং তার ওপর আমল করতো। চতুর্থ শতাব্দীতেও কোনো একটি মাযহাবের খালেস তাক্বলীদ করা, তার উসূল ও তরীকার ওপর ফিকহ হাসিল করা এবং ফতোয়া দেয়ার ব্যাপক প্রচলন গড়ে ওঠেনি। এ মর্মে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. তাঁর জগতবিখ্যাত রচনা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় লিখেছেন–

'চতুর্থ শতাব্দীতেও উম্মতের দু'টি শ্রেণির আচরণই ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। জনসাধারণ এ সমস্ত মাসআলার ক্ষেত্রে –যার ওপর সকলই একমত এবং যার মাঝে মুসলমানদের অভ্যন্তরে অথবা জমহুর মুজতাহিদদের মাঝে কোনো মতদ্বৈততা নেই –সেক্ষেত্রে صاحب شريعت [শরী'আ প্রণেতা] (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরই তাক্বলীদ করতেন। তারা ওযূ, গোসল, নামায, যাকাত ইত্যাদির পদ্ধতি নিজেদের পিতা-মাতা বা নিজের শহরের শিক্ষাগুরু ও মুরুব্বীদের কাছ থেকে শিখে সেই অনুযায়ী পালন করতেন। যদি কোনো অস্বাভাবিক চালচিত্রের সম্মুখীন হতেন তাহলে তার ব্যাপারে ধারে-কাছের কোনো মুফতীর কাছ থেকে জেনে নিতেন। সেখানে কোনো মাযহাবের বাধ্যবাধকতা ছিল না।

খাওয়াস বা বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্য যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন, তাদের কাছে যেহেতু সহীহ হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের আসার বিদ্যমান ছিলো, কাজেই তাদের আর অন্য কিছুর প্রয়োজন পড়তো না। কোনো মশহুর সহীহ হাদীস –যার ওপর কোনো ফকীহ আমল করেছেন এবং যার ওপর আমল না করার কারো কাছে কোনো ওযর নেই– অথবা জমহুর

২২৫. মুস্তফা আহমদ যারকা, *আল মাদখালুল ফিক্বহিল আম ইলাল হুকুকিল মাদানিয়্যা*, মাতবাআ জামেয়া সুরিয়া, দামেশক, ১৯৫৮, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫২ হিজরী, ১খ. পৃ. ৬ ও ৭

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈদের বাণীসমূহ –যেগুলো একে অপরের সম্পূরক– তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিলো। যদি কোনো এমন মাসআলার সম্মুখীন হতেন, যেক্ষেত্রে তারা সন্তোষজনক কিছু পাচ্ছেন না এবং সেই সন্তোষজনক উপায় বের না হওয়ার কারণ হয়তো বর্ণনাসমূহ পরস্পরে সাংঘর্ষিক হওয়া অথবা কোনোটাকে প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না এমন অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাহলে এক্ষেত্রে তারা মুতাক্বাদ্দিমীন ফুকাহায়ে কেরামের মধ্য হতে কারো কথার শরণাপন্ন হতেন। যদি সেই মাসআলায় বিপরীত দু'টি বক্তব্য পেতেন তাহলে যেটাকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে হতো, সেটিকেই বরণ করে নিতেন। এক্ষেত্রে তারা এ বাছ-বিচার করতেন না যে, কোনটি মদীনাবাসীর বক্তব্য আর কোনটি কূফানিবাসীদের অভিমত।

খাওয়াসদের মধ্য হতে যারা আহলে তাখরীজ হতেন তারা যেসব মাসআলায় স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না পেতেন **تخـريج واجتهـاد فى المـذهب** এর মাধ্যমে সমস্যার নিরসন করতেন। তাখরীজের যোগ্যতার অধিকারী লোকদেরকেও তার মাযহাবের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। কাউকে শাফেঈ বলা হয়। কাউকে হানাফী বলা হয়। সে মতে খোদ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্য হতে যার আকর্ষণ যেদিকে হতো অথবা যিনি অধিকাংশ মাসআলায় যেই মাযহাবের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন, তাকেও সেই মাযহাবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হতো। সে অনুযায়ী ইমাম নাসায়ী ও ইমাম বাইহাক্বীকে 'শাফেয়ী' বলা হতো। সে যুগে বিচারালয় ও ফতোয়ার পদে এমন লোককেই সমাসীন করা হতো, যিনি মুজতাহিদ হতেন এবং ফকীহ তাঁকেই বলা হতো, যার মাঝে ইজতিহাদের যোগ্যতা রয়েছে।[২২৬]

সাধারণ লোকেরা ধর্মীয় বিষয়ে এই শ্রেণির বিশেষজ্ঞ ফকীহদের তাকলীদ করতেন। অবশ্য তাক্বলীদকারী নির্দিষ্ট মাযহাবের ক্ষেত্রে বিশেষ ইমামের তাক্বলীদ করতেন এ কথা জ্ঞান করে যে, তিনি মূলত কুরআ'ন ও সুন্নাহর ওপর আমল করছেন এবং শরী'আদাতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরসণই করছেন। এক্ষেত্রে তাক্বলীদকারী তার নিজের ও শরী'আদাতার মাঝখানে ওই ইমামকে নিছক একজন শিক্ষাগুরু মনে করতেন। ইমামের অবস্থান হতো মুখপাত্র বা ব্যাখ্যাকারের মতো। তাক্বলীদকারী ওই ইমামকে শরী'আ প্রণেতা জ্ঞান করতেন না। বিষয়টিকে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

لا يدين إلا بقول النبى صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد حلالاً إلا ما أحلَّه الله ولا حرامًا إلا ما حرّمه الله ورسوله لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبى صلى الله عليه وسلم ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالماً راشدًا على أنه مصيب فى ما يقول ويفتى ظاهراً متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خالف ما يظنه اقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار.

২২৬. শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি.: ১ম খ. পৃ-১২২। বাবু হিকায়তে হালিন নাস কাবলাল মিআতির রাবিআ ওয়া বাদাহা

‘সেই তাক্বলীদকারী ব্যক্তি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনেরই অনুসারী ছিলেন। তাকেই হালাল জ্ঞান করতেন, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল হালাল অভিহিত করেছেন। একমাত্র সেটিকেই হারাম মানতেন যেটিকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম বলেছেন। কিন্তু যেহেতু তার সরাসরি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞান হতো না, নবীজি থেকে যেসকল বিপরীতধর্মী বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলোর মাঝখানে সমন্বয় সাধনের যোগ্যতাও তার নেই, নবীজির কথা থেকে কোনো মাসআলা প্রমাণিত করার উপযুক্ততাও তার মাঝে নেই; যার কারণে তিনি একজন হিদায়াতপ্রাপ্ত আলেমের আনুগত্য এ ভিত্তিতে করতেন যে, তিনি বাহ্যত সঠিক ফতোয়া দিয়ে থাকেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করে থাকেন। যদি তিনি তাকে তার ধারণার বিপরীত পেতেন তাহলে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে, পূর্বাপর না ভেবে, তৎক্ষণাৎ আনুগত্যের লাগাম ছুড়ে ফেলে দিতে।[২২৭]

তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া

সব ধরনের নিঃশর্ত ও মুক্ত তাক্বলীদের ওপর সর্বযুগের মুহাক্কিকীন উলামায়ে কেরাম আপত্তি তুলেছেন যাকে রাসূলের আনুগত্যের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী বানানো হচ্ছে। তারা কোনোভাবেই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি। তাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন ইবনে হযম ও তার মতো অন্যান্য কট্টরপন্থী আলেম। অবশ্য তারা গোটা তাক্বলীদকে একবাক্যে হারাম অভিহিত করেননি; তবে তারা সেই নিঃশর্ত তাক্বলীদকে জায়েয মনে করতেন না, যেটির সঙ্গে রাসূলের আনুগত্যের কোনো ফারাক নেই। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেন পূর্ববর্তীদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. ও পরবর্তীদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ। ইবনে তাইমিয়াহ একদিকে এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন, প্রকাশও করেছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্যে, গায়রে মুজতাহিদ আলেমদের জন্যে ফকীহ ও মুজতাহিদ ব্যক্তির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। কারণ তাক্বলীদ না করে সে যাবে কোথায়? এ ক্ষেত্রে ফকীহ মুজতাহিদ মধ্যস্থতাকারীর অবস্থানে থাকবেন। এই বাস্তবতাকে কোনোভাবে উপেক্ষা করা যায় না। তিনি তার এক লেখায় বিষয়টিকে এভাবে চিত্রিত করেছেন–

> ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে হালাল বলেছেন, সেটিকে হালাল জ্ঞান করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে হারাম বলেছেন, সেটিকে হারাম বিশ্বাস করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে ওয়াজিব অভিহিত করেছেন, সেটির সঙ্গে ওয়াজিবসুলভ আচরণ করা সমস্ত মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের ওপর ফরয। এটি প্রতিটি ব্যক্তির ওপর সর্বযুগেই ফরয। প্রকাশ্যেও ফরয, অপ্রকাশ্যেও ফরয। তবে যেহেতু এমন অনেক বিধি-বিধান রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন, সেহেতু তারা সেক্ষেত্রে এমন লোকদের দ্বারস্থ হতেন, যারা তাদেরকে শিক্ষা দিতেন। কারণ তিনি তাদের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা সম্পর্কে বেশি ওয়াকিফহাল। নবীজির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা তাদের চেয়ে অবশ্যই বেশি। কাজেই মুসলমানগণ যেসকল ইমামের অনুসরণ করছেন, তাদের সেটাই অবস্থান, যেটি একজন মধ্যস্থতাকারীর হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারা হচ্ছেন সেই পথপ্রদর্শক, যিনি তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২২৭ প্রাগুক্ত, ১ম খ. পৃ. ১২৪

ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। তিনি নবীজির বাণীরই প্রচার করছেন। তিনি নিজের ইজতিহাদী যোগ্যতা অনুযায়ী রাসূলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝেছেন। কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা কোনো আলেমকে এমন জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করে থাকেন, যা দ্বিতীয় আলেমের কাছে থাকে না। সেই দ্বিতীয় আলেমকেও আল্লাহ তা'আলা অপর একটি বিষয়ের এমন জ্ঞান দান করে থাকেন, যা প্রথম আলেমের কাছ হয় না। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ

দেখুন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম দু'জনই মহান আল্লাহর অতিসম্মানিত পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের দু'জনই একটি মুকাদ্দমায় রায় দিয়েছিলেন।[২২৮]

সেই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের একজন (হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম)-কে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রশংসা করেছেন তাদের দু'জনেরই। উলামায়ে কেরামও নবীগণের ওয়ারিস। শরয়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদের উদাহরণ হলো, ধরুন, কোনো একটি অজ্ঞাত স্থানে (অন্ধকারের কারণে বা অন্যকোনো কারণে) কয়েকজন লোক কা'বার সঠিক দিক সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে না। এখন তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব দলীল ও প্রবল অনুমানের ভিত্তিতে কা'বার দিক ঠিক করে নিলো। ধরুন, তাদের মধ্য হতে কা'বার ঠিক ঠাওরানোর কাজটি চারজন করেছেন। এখন প্রত্যেকের অনুমান ভিন্ন হওয়ার কারণে তারা তাদের দলের লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদের নিজস্ব প্রবল অনুমানের ভিত্তিতে চারটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে নামায আদায় করলেন। প্রত্যেকে নিজের প্রবল অনুমান সম্পর্কে বিশ্বাস করে আছেন যে, আমি যেদিকে ফিরে নামায পড়েছি সেটাই সঠিক দিক, তাহলে তাদের চারজনের নামাযই সহীহ হবে। যদিও প্রকৃত বিচারে একজনের অনুমানই বাস্তবাশ্রিত হবে। ইজতিহাদকারীদের অবস্থা ঠিক এমনই। সহীহ হাদীস অনুযায়ী যিনি দু'টি সাওয়াব পাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজতিহাদকারী সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন–

اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر

(যখন ফয়সালাকারী ইজতিহাদের আশ্রয় নেন আর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন সে দু'টি সাওয়াব পান। আর যদি তার ইজতিহাদ দিকভ্রান্তও হয় তবুও তিনি অন্তত একটি সাওয়াব পান)।[২২৯]'

তিনি আরো বলেন, এটাই আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা যে, প্রত্যেকেই বিশেষ কোনো মাযহাব বা ফিকহ এর কাঠামোতে বেড়ে ওঠবেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট তরীকা অনুসারে ইবাদত ও শরয়ী আহকাম পালন করবেন। প্রাচীন যুগ থেকে এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হলো, তিনি নিজেকে অন্য কারো নয়,

---

২২৮ আল-কুরআ'ন - ২১ : ৭৮

২২৯. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া, ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪২৫/২০০৪,, ২খ. পৃ-২০১-২০২

একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের-ই অনুগত বিশ্বাস করেন। যেকোনো মুসলমানই এর ওপর বদ্ধপরিকর যে, কুরআ'ন ও সুন্নাহর আলোকে যে কথা প্রমাণিত হবে নিঃশঙ্কোচে তার অনুসরণ করবেন। তিনি লিখেছেন,

'মানুষ সাধারণত তার পিতা-মাতা, তার অভিভাবক ও তার শহরের জনগণের দ্বীন ও মাযহাবের অনুগামী হয়ে থাকে। তাদের মতো করেই সে প্রতিপালিত হয়। যেমন, আমরা দেখতে পাই যে, একটি শিশু ওই বিশ্বাস ধারণ করেই বেড়ে ওঠে, যে বিশ্বাসে তার পিতা-মাতা, তার পৃষ্ঠপোষক ও তার স্বদেশের লোকজন বিশ্বাসী হয়ে থাকে। ওই শিশুটি যখন বালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তখন তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে যে, এখন থেকে আমাকে আল্লাহ ও তার রাসূলের-ই আনুগত্য করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র তাদেরই অনুসরণ করতে হবে। সে নিজেকে ওই শ্রেণির লোকদের কাতারে ফেলতে পারবে না, যাদের সম্পর্কে কুরআ'নুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيهِ اٰبَآءَنَا

(যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার আনুগত্য করো, তখন তারা বলে, আমরা বরং সে পথেরই অনুগামী হবো, যে পথের ওপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে পেয়েছি)। কাজেই আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য না করে যে নিজের অভিরুচি, পিতা-মাতার অভিপ্রায়, স্বজাতির কৃষ্টি-কালচারের আনুগত্য করবে সে ওই জাহেলী সমাজের পতাকাবাহী বিবেচিত হবে। যাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াতে কঠোর পরিণতির কথা বলা হয়েছে। কাজেই এখন যদি কোনো ব্যক্তির সামনে কোনো মাসআলায় সঠিক পথ বেরিয়ে আসে এবং সেই পথটি রাসূল নির্দেশিত শরী'আর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, এরপরও সে ওই পথকে বরণ না করে, আর নিজেকে পুরনো অভ্যাসের ওপরই রেখে দেয় তাহলে সে ব্যক্তির এই কাজ অবশ্যই নিন্দনীয় হবে এবং এর জন্যে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।'[২৩০]

এমন একজন আলেম; যার মাঝে গবেষণা ও প্রামাণিক শক্তি আহরণের যোগ্যতা রয়েছে, যিনি কোনো মাসআলায় কোন অভিমতটি প্রাধান্য পাবে, তা নিরুপণ করার জ্ঞান রাখেন; তার যোগ্যতার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন–

أما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقاً وقيل : يجوز مطلقًا وقيل : يجوز عند الحاجة كما إذا أضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل.

'আর যে ব্যক্তি ইসতিদলাল করার যোগ্যতা রাখেন তার সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ বলেন, তার জন্যে তাক্বলীদ করা সম্পূর্ণ হারাম। দ্বিতীয় অভিমত হলো, তার জন্যে তাক্বলীদ করা নিঃশর্তভাবে জায়েয। তৃতীয় অভিমত হলো, প্রয়োজনের সময় জায়েয। যেমন ধরুন, সরাসরি গবেষণা করে দলীল থেকে মাসআলা বের করার মতো সময় হাতে নেই। এই তৃতীয় অভিমতটিই সবথেকে

২৩০. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া, ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪২৫/২০০৪, ২খ. পৃ-২০২

ভারসাম্যপূর্ণ।'[২৩১]

পক্ষান্তরে যিনি পূর্ণ ইজতিহাদ করার যোগ্যতার অধিকারী, তার সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর ফয়সালা হলো, যদি কোনো ক্ষেত্রে তিনি শরী'আর বিভিন্ন নস দেখতে পান আর সেই নসগুলোকে পরস্পরে তুলনা করে কোনো একটি নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হন এভাবে যে, তা প্রত্যাখ্যান করার মতো কোনো কারণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, তাহলে সেই নসের ওপর আমল করা তার ওপর আবশ্যক হবে। তিনি লিখেছেন–

أَمَّا إِذَا قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ التَّامِّ الَّذِى يَعْتَقِدُ مَعَهُ أَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ النَّصَّ فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ النُّصُوصِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ مُتَّبِعًا لِلظَّنِّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ الْعُصَاةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

'একজন ব্যক্তির মাঝে পূর্ণ ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রয়েছে। তিনি নিশ্চয়তার সঙ্গে অবহিত যে, অমুক মাসআলার ব্যাপারে যেই নস (শরী'আর অকাট্য নির্দেশনা) এসেছে, সেই নসটিকে অকার্যকর করার মতো কোনো দলীল নেই, তাহলে ওই ব্যক্তির ওপর নসের আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে। যদি তিনি তা না করেন (অর্থাৎ নস পরিপন্থী কিয়াসের ওপর আমল করেন অথবা ওই মাসআলায় চোখ বুজে কারো তাক্বলীদ করে যান) তাহলে তিনি সেই অনুমানপন্থী প্রবৃত্তিপুজারী বিবেচিত হবেন, যার সম্পর্কে কুরআ'নুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسُ

ঐ সকল লোক অনুমান ও প্রবৃত্তির খায়েশের অনুগামিতা করছে। এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য প্রতিপন্ন হবে।[২৩২]

ইজতিহাদ ও তাক্বলীদের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদের মাঝখানে ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। এটি ছিলো তাঁর অন্যতম আল্লাহপ্রদত্ত গুণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বলা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর এই তাজদীদি কীর্তি তাঁকে স্বতন্ত্র অবস্থান দান করেছে। এটি ছিলো তাঁর স্বভাবজাত সুস্থিরতা, রুচির বিশুদ্ধতা ও বাস্তবপন্থী হওয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা যদি আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে এমন একদলকে পাবো যারা এক কথায় তাক্বলীদকে হারাম মনে করে। তাদের বক্তব্য হলো, প্রতিটি মুসলমান –সাধারণ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যা-ই হোক না কেনো– তাকে সরাসরি কিতাব ও সুন্নাহর ওপর আমল করতে হবে এবং সেখান

২৩১. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ- ৩৮৪

২৩২. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া, ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪২৫/২০০৪, ২খ. পৃ-৩৮৫

থেকেই তাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিধান হাসিল করতে হবে। হয়তো তাদের কর্মপন্থা ও রচনাবলি থেকে পরিস্কার এহেন সিদ্ধান্ত ফুটে ওঠে।

অন্যদিকে আমাদের সমাজে আরেকটি দল রয়েছে, যারা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর তাক্বলীদ করাকে অত্যাবশ্যক মনে করে। তাক্বলীদ বর্জনকারীর ওপর তারা ফিকহী গুরুদণ্ড 'ফাসেক' ও 'পথহারা' (ضال) সাব্যস্ত করে। মজার বিষয় হলো, প্রথম দলও কিন্তু, তাক্বলীদকারীদেরকে ও বিশেষ কোনো মাযহাবের অনুসারীদেরকে এমন 'ফাসেক' ও 'পথহারা' মনে করে।

দ্বিতীয় দলটি একটি জ্বলজ্যান্ত বাস্তবতাকে ভুলে গেছে। তারা ভুলে গেছে যে, তাক্বলীদ হলো সমাজের মাঝে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশলমাত্র। এর মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রবৃত্তিপুজা ও নিজ অভিমত কায়েমের একরোখা মানসিকতা থেকে রক্ষা করা যাবে। যার ফলে মুসলিম সমাজ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কবল থেকে রক্ষা পাবে। তাদের ধর্মীয় জীবনে ঐক্য ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে। সর্বোপরি তাক্বলীদ হলো, সম্মিলিতভাবে শরী'আর বিধি-বিধানের ওপর সহজে আমল করার একটি ব্যবস্থাপনামূলক কৌশলমাত্র। কিন্তু ওই দ্বিতীয় দলটি সেই ব্যবস্থাপনামূলক কৌশলকে শরী'আ-প্রণয়নমূলক-পদক্ষেপ (تشريعى عمل)এর স্তর দিয়ে ফেলেছে। বিষয়টির ওপর তাদের মনোভাব এতোটাই একরোখা হয়ে পড়েছে যে, এখন তাক্বলীদকে তারা একটি ফিকহী মাযহাব ও ইজতিহাদী মাসআলা মনে না করে শরী'আর অকাট্য নস ও স্বতন্ত্র ধর্মের মর্যাদা দিয়ে ফেলেছে।

এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী যেই মাযহাব অবলম্বন করেছেন এবং যেভাবে বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা অন্যদের অপেক্ষা শরী'আর মূল কাঠামোর অনেক কাছাকাছি। তাঁর কর্মপন্থা ইসলামের প্রাথমিক যুগের কৃষ্টির সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মানবপ্রবৃত্তির সঙ্গে সর্বাপেক্ষা যুৎসই ও আমলী যিন্দেগীর পূর্ণ উপযোগী। হযরত শাহ সাহেব রহ. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেকার কার্যপদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। বলতেন, সে সময়কার জনগণ যখন তাদের দ্বীনি জীবনে, ইবাদত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতেন তখন তারা কীভাবে তার সমাধান করতেন।

তাক্বলীদের জায়েয ও স্বাভাবিক ধরন

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) এর মতে যদি কোনো ব্যক্তি এমন হয় যে, সে কোনো ফিকহী মাযহাব ও নির্দিষ্ট ইমামের আনুগত্য করছেন এ নিয়তে যে, আমি মূলত শরী'আ-প্রণেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করছি। আর তার মাঝে এ যোগ্যতা নেই যে, তিনি শরী'আর বিধি-বিধানকে সরাসরি কুরআ'ন ও হাদীস থেকে আহরণ করবেন, তাহলে এ ব্যক্তি মাজুর বা নিরুপায়। তার তাক্বলীদ ছাড়া গত্যন্তর নেই। শরী'আর বিধি-বিধান সরাসরি কুরআ'ন ও হাদীস থেকে আহরণ করতে না পারার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। যেমন, তিনি নিরক্ষর মানুষ। অথবা তার হাতে সরাসরি গবেষণা করার মতো সুযোগ ও অবসর নেই। অথবা কুরআ'ন ও হাদীসের নস (টেক্সট) থেকে অবগত হওয়ার মাধ্যম ও উপকরণ তার আয়ত্বে নেই। অথবা সেখান থেকে মাসআলা ইসতিম্বাত করার যোগ্যতা নেই। ইবনে হযম রহ.-এর ওই বক্তব্য 'তাক্বলীদ হারাম; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাড়া অন্য কারো কথা বিনা দলীলে গ্রহণ করা কোনো মুসলমানের জন্যে জায়েয

নয়।' এর ওপর মন্তব্য করে শাহ সাহেব রহ. বলেন–

ইবনে হযম রহ.-এর মন্তব্য ওই ব্যক্তির ওপর প্রজোয্য হতে পারে না, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ছাড়া অন্য কারো কথাকে নিজের জন্যে আবশ্যক পালনীয় মনে করেন না। যিনি বিশ্বাস করেন, হালাল সেটাই যা আল্লাহ ও তার রাসূল হালাল বলেছেন। হারাম সেটাই, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল হারাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সরাসরি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া ইলম শিখতে পারেননি, যেহেতু নবীজি (সা) এর আপাত বিপরীত কথাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্যতা তার নেই, কাজেই তিনি খোদাভীরু কোনো আলেমের শরণাপন্ন হয়েছেন এ বিশ্বাস নিয়ে যে, যদি সাধারণত সঠিক কথা বলে থাকেন এবং সুন্নতে নববীর অনুগত মুখপাত্র হয়ে মাসআলা বলে থাকেন। যদি তিনি তাকে তার ধারণার বিপরীত পান তাহলে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে, পূর্বাপর না ভেবে, তৎক্ষণাৎ আনুগত্যের লাগাম ছুড়ে ফেলে দেবেন। এমন ব্যক্তি কখনই সমালোচিত ও দোষী হতে পারেন না। তাকে সুন্নত ও শরী'আর পরিপন্থী বলা ঠিক হবে না।

এ কথা কারো অজানা নয় যে, ফতোয়া চাওয়া ও ফতোয়া দেয়ার প্রচলন মুসলমানদের মাঝে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই চলে আসছে। এখন কোনো ব্যক্তি কি নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির কাছেই সবসময়ই ফতোয়া জিজ্ঞেস করলো নাকি কখনো এর কাছে জিজ্ঞেস করলো, অন্য সময় আরেক জনকে জিজ্ঞেস করলো; এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এটি তখন, যখন তার ভাবনা হবে পরিস্কার। নিয়ত হবে পরিশুদ্ধ। কামনা হবে স্রেফ শরী'আর অনুসরণ। এতে কোনো ধরনের আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা কোনো ফকীহর ওপর আমাদের এমন ঈমান নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ইলমে ফিকহ অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাদের জন্যে তার আনুগত্য ফরয করে দিয়েছেন। আমরা তাকে নিষ্পাপও মনে করি না। আমরা যখন সেই ফুকাহায়ে কেরাম বা সেই মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্য হতে কোনো একজনের আনুগত্য করি তখন আমাদের এ বিশ্বাস থাকে যে, তিনি আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের আলেম। কাজেই তিনি যে কথা বলছেন সেটি হয়তো কুরআ'ন ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট নির্দেশনার ভিত্তিতে বলছেন বা সেগুলো থেকে উদ্ভাবন করে বলছেন কিংবা তিনি কুরআ'নুল কারীম থেকে বুঝতে পেরেছেন যে, অমুক সূরতে শরী'আর যেই বিধানটি প্রজোয্য রয়েছে, সেটি অমুক علت-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিষয়টি নিয়ে তার মাঝে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা নেই। কাজেই তিনি مسئلة غير منصوص কে-مسئلة منصوص-এর ওপর কিয়াস করেছেন। কাজেই তিনি যেন বলছেন, আমার ধারণা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেখানে যেখানে উক্ত علت পাওয়া যাবে, সেখানে উক্ত বিধানটি প্রযোজ্য হবে। সেই সর্বাঙ্গীন ব্যাপকতার অধীনে তিনি উক্ত মাসআলাটিরও সমাধান দিয়েছেন। কাজেই তার রায় পক্ষান্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই রায়। তবে সর্বাবস্থায় তার পদ্ধতির মাঝে কিছুটা ظن তথা অপ্রত্যয়ী জ্ঞানের দখল রয়েছে। যদি এমনটি না হতো, (অর্থাৎ বিষয়টি শতভাগ শরয়ী নস থেকে প্রমাণিত হতো) তাহলে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি কোনো মুজতাহিদের তাক্বলীদ করতো না।

এখন যদি আমাদের কাছে আমাদের মহান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –যার আনুগত্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর ফরয করেছেন, তাঁর কোনো হাদীস বিশুদ্ধ সনদে এমন তথ্য নিয়ে এসে পড়ে যা ওই মুজতাহিদের মাযহাবের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। আর আমরা সেই হাদীস বিসর্জন দিয়ে শুধু তার (ফিকহী কিয়াস)-এরই অনুসরণ করি, যেই কিয়াসের মাঝে ظن তথা অপ্রত্যয়ী জ্ঞানের দখল রয়েছে; যা অনেকটা অনুমান নির্ভর, তাহলে আমাদের চেয়ে বড় জালিম আর কে থাকতে পারে? কাল কিয়ামতের দিন আমরা আমাদের এ কাজের জন্যে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবো'?[২৩৩]

চার মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

উক্ত ইনসাফপূর্ণ ও গবেষণাদীপ্ত নিরীক্ষণ শেষে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. মুসলিম-বিশ্বে ব্যাপকাকারে অনুসৃত চারটি ফিকহী মাযহাব তথা হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে মূল্যায়ন করে তাঁর অনবদ্য রচনা عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليد-এ অল্প কথায় ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ যেই আলোচনা পেশ করেছেন, তা এখানে তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন–

মনে রাখবেন, উক্ত চারটি মাযহাবকে নির্ধারণ করার পেছনে অনেকগুলো হিকমত রয়েছে। যদি চারটি মাযহাবকেই উপেক্ষা করা হয়, তাহলে ভয়াবহ ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রথমটি হলো, মুসলিম উম্মাহ এ কথার ওপর একমত যে, শরী'আ জানার জন্যে আমাদেরকে সালফে সালেহীনের ওপর নির্ভর করতে হবে। যেভাবে তাবেঈগণ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ওপর নির্ভর করেছিলেন। তাবয়ে তাবেঈগণ তাবেঈদের ওপর নির্ভর করেছিলেন। এভাবে প্রতিটি যুগের উলামায়ে কেরাম তাদের পূর্ববর্তীদের ওপর নির্ভর করেছেন। বিবেকের দৃষ্টিতেও এটি একটি সুন্দর ব্যবস্থা। কারণ হলো, শরী'আ সম্পর্কিত সকল শাস্ত্র نقل (বর্ণনা ও শ্রুতির্নিভর) ও استنباط (শ্রুতিবিদ্যার আলোকে উদ্ভাবন) নির্ভর। এই নকল তথা বর্ণনা হতে হলে পরবর্তী প্রজন্মকে পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে আহরণ করতে হবে। استنباط-এর ক্ষেত্রেও আবশ্যক হলো, পূর্ববর্তীদের মাযহাব জানতে হবে। যাতে করে তাদের নির্দেশনার বৃত্তের বাইরে গিয়ে ইজমা' লঙ্ঘিত না হয়। কাজেই তাদের নির্দেশনা জানা ও পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে সহায়তা নেয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই। এটি শুধু শরয়ী বিদ্যাতেই নয়, অন্য যে কোনো জ্ঞান, শাস্ত্র, শিল্প ও পেশার ক্ষেত্রেও আপনি এমন নিয়ম দেখতে পাবেন। যে কোনো ভাষার ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্যচর্চা সে ভাষার দক্ষ গুরুর কাছ থেকে শেখতে হয়। নাপিতের কাজও নাপিত থেকে শেখতে হয়। লৌহশিল্পের কাজও কর্মকারের কাছ থেকে শেখতে হয়। দেয়ালে রং প্রয়োগের কাজও রংমিস্ত্রি থেকে শেখতে হয়। পৃথিবীর সবগুলো ব্যবহারিক বিদ্যা সেই শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট

২৩৩. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর ২০০৫ খ্রি. ১খ. পৃ-১৫৫-১৫৬

ব্যক্তির সহচার্যে এসে অর্জন করতে হয়। এ পথে না হেঁটে দক্ষতা অর্জন করা কদাচিৎ হয়তো ঘটে। কিন্তু সাধারণত অসম্ভব। সম্ভাবনার দৃষ্টিতে হয়তো সম্ভব; কিন্তু বাস্তবতার দৃষ্টিতে সম্ভব নয়।

যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, সালাফ তথা পূর্বসূরীদের নির্দেশনা ও গবেষণার ওপর নির্ভর করা আবশ্যক, তখন এটাও আবশ্যক যে, তাদের নির্দেশনাগুলো যেই সূত্রে আমাদের হাতে এসেছে সেই সূত্রটিও নির্ভরযোগ্য হতে হবে। সেটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, প্রসিদ্ধ কিতাবে সংকলিত হতে হবে। সেই গ্রন্থটির ওপর এমনভাবে নিরীক্ষণ হতে হবে যে, তার কোন কথাটি প্রনিধানযোগ্য ও কোন কথাটি অবলুপ্ত, কোন কথাটি ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রজোয্য (عام)ও কোন কথাটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রজোয্য (خاص) তা যেনো আলাদা আকারে শ্রেণিভুক্ত হয়। কোন বিষয়টি বিনাশর্তে প্রজোয্য (مطلق) আর কোন কথাটি শর্তসাপেক্ষে প্রজোয্য (مقيد) তা যেনো সহজেই অনুমেয় হয়। কোনো বিষয়ে একাধিক নির্দেশনা আসলে সেগুলোর মাঝে কীভাবে সমন্বয় দিতে হবে? প্রতিটি বিধানের প্রয়োগের পেছনে কোন কার্যকারণ (علت) ভূমিকা রাখে, তার ওপরও আলোকপাত হতে হবে। যদি এ জাতীয় কাজগুলো না হয়ে থাকে তাহলে সেই কিতাব এবং তাতে বিবৃত মাযহাব ও ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করা যাবে না। অতীতে যতোগুলো (ফিকহী) মাযহাব দৃশ্যমান হয়েছে, সেগুলোর কোনোটির ওপর এ জাতীয় কাজ হয়নি, সেগুলোর কোনোটি-ই উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক নয়, সেগুলোর কোনোটিই উক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে পারেনি। একমাত্র এই চারটি মাযহাবই উক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে পেরেছে।[২৩৪]

এভাবে হযরত শাহ সাহেব রহ. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদের মাঝখানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি শরী'আর উদ্দেশ্য, মানবপ্রকৃতি ও বাস্তবতার সঙ্গে আদ্যেপান্ত সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি তাক্বলীদের ক্ষেত্রে এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তাক্বলীদ করার সময় অবশ্যই নিয়ত পরিস্কার হতে হবে। স্বচ্ছ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমার উদ্দেশ্য হলো, শরী'আ-প্রণেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ও কুরআ'ন -সুন্নাহ মেনে চলা। সাথে সাথে এ আস্থাও পোষণ করতে হবে যে, আমি যাকে মধ্যস্থতাকারী বানাচ্ছি তিনি কুরআ'ন ও হাদীসের সকল বিদ্যা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি ইসলামী শরী'আর একজন সত্যভাষী মুখপাত্র। সাথে সাথে নিজেকে এর জন্যেও প্রস্তুত রাখতে হবে যে, যখুনি অবস্থা বদলে যাবে এবং সুন্নতের ভাষ্য তার নির্দেশনার বিপরীতে যাবে, তখন ঈমানদার হিসেবে বিকল্প পথে হাঁটতে আমি একটুও দ্বিধা করবো না।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'আপনার প্রভুর শপথ, ওই সমস্ত লোক যখন নিজেদের সকল বিবাদে আপনাকে ফয়সালাকারী মেনে নেবে এবং আপনি যেই ফয়সালা করে দেবেন, তার ওপর নিজেদের মনে কোনো সংকীর্ণতাবোধ রাখবে না এবং নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করবে, তখুনি তারা মুমিন হতে পারবে। (এছাড়া তারা মুমিন হতে পারবে না।)[২৩৫]

---

২৩৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), *ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ*, মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলী, ১৩৪৪ হি; পৃ-৩৬-৩৮

২৩৫ আল-কুরআ'ন - ৪: ৬৫

ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক যুগে

চার মাযহাবের বৈশিষ্ট্য, ফুকাহায়ে কেরামের অবদান ও তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এ কথাও বলেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তাঁদের অবদান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে এটি তার জন্যে চরম বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। উক্ত বিষয়গুলো মেনে নিয়েই হযরত শাহ সাহেব রহ. বলতেন, ইজতিহাদ (সবগুলো শর্তসহকারে ও পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে) সর্বযুগের প্রয়োজন পূরণের যোগ্যতা রাখে। এটি মানবজীবন, সভ্যতা ও সামাজিকতার পরিবর্তনশীলতা, ক্রমোন্নতির মাঝে জীবন সঞ্চার করে। এটি মানবীয় প্রয়োজন, চলমান ঘটনাপ্রবাহ ও ধারাবাহিক পরিবর্তনশীলতার প্রাকৃতিক চাহিদার খোরাক জোগায়। এটি ইসলামী শরী'আর প্রসার এবং সেটির আল্লাহপ্রদত্ত হওয়ার অনেক বড় প্রমাণ। এটি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের পথপ্রদর্শন ও সমাজের বৈধ চাহিদা পূরণ করে। কাজেই ইজতিহাদের উক্ত শক্তির প্রমাণ রাখা প্রতিটি যুগের দ্বীনের বাহকদের দায়িত্ব। মুসোফ্ফা গ্রন্থের ভূমিকায় শাহ সাহেব লিখেছেন–

> 'ইজতিহাদ প্রতিটি যুগেই ফরযে কিফায়া। এখানে ইজতিহাদ দ্বারা সেই স্বতন্ত্র ইজতিহাদ উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি ইমাম শাফেয়ীর ইজতিহাদ ছিলো। যা জরাহ ও তা'দীল, ভাষাজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে কারো মুখাপেক্ষী ছিলো না। তদ্রুপ নিজের ইজতিহাদসুলভ প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে যেটি অন্যের অনুগত ছিলো না। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, ইজতিহাদে ইনতিসাব। যার সংজ্ঞা হলো, শরী'আর বিধি-বিধানকে তার বিশদ প্রমাণাদি সহকারে জানা এবং মুজতাহিদদের পথে চলে শাখা মাসআলাসমূহের ওপর কাজ করা এবং বিধানসমূহকে বিন্যস্ত করা। এটি যেকোনো মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতার অধীনে হতে পারে।
>
> আমরা যে বলে থাকি, ইজতিহাদ সেই যুগে ফরয ছিলো (যার ওপর মুহাক্কিকগণ একমত) তার ব্যাখ্যাযুক্ত কারণ হলো, মাসআলাগুলো প্রচুর পরিমাণে ঘটে থাকে। মাসআলাকে নির্দিষ্ট করা ও তার মুখে লাগাম দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কী? তা জানা ওয়াজিব। যতোগুলো মাসআলা লেখা হয়েছে, যতোগুলো মাসআলা সংকলন করা হয়েছে, শুধু সেগুলোই যথেষ্ট নয়। যে সমস্ত মাসআলার ব্যাপারে চরম মতদ্বৈততা রয়েছে সেগুলোকে দলীলের আওতায় না এনে সমাধান করা সম্ভব নয়। মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে মাসআলার যে সমস্ত রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে তার অধিকাংশই এমনভাবে বিচ্ছিন্ন যে, সেগুলোর ওপর প্রশান্তি সহকারে নির্ভর করা যাচ্ছে না। কাজেই সেগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত ইজতিহাদের নীতিমালার আলোকে পরখ না করা হবে এবং সেগুলোর ওপর বিস্তর গবেষণা করা না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সমাধান আসবে না'।[২৩৬]

এতখানি ভূমিকার পর এখন আমরা ফিকহশাস্ত্র এবং মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তি জীবন এবং সমাজ সভ্যতায় ফিকহ এর গুরুত্ব ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

---

২৩৬. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়াযীর, *আল মুসাফফা ফী উসুলিল ফিকহ*, দারুল ফিকর, বৈরুত,১৪১৭/১৯৯৬, পৃ. ১২

ফিকহশাস্ত্র

পারিভাষিক অর্থে ইলমুল ফিকহ এমন একটি বিদ্যা, যাতে কুরআ'ন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের দলিল- প্রমাণ দ্বারা ইসলামী শরী'আর যাবতীয় বিধি-বিধান স্থির করা হয়। আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র) বলেন,

اَلْفِقْهُ مَعْقُوْلٌ مِّنْ مَّنْقُوْلٍ.

'কুরআ'ন ও সুন্নাহ থেকে যে আহকাম বিবেকে ধরা পড়ে, তাই ফিকহ।'[২৩৭]

অর্থাৎ কুরআ'ন ও হাদীস অধ্যয়ন করে শরী'আর যেসব বিধান বিবেকসম্মত মনে হবে তাই ফিকহ।

এ ব্যাপারে مِفْتَاحُ السَّعَادَةِ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন,

هُوَ عِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ التَفْصِيْلِيَّةِ.

'ফিকহ এমন একটি বিদ্যা বা শাস্ত্র যা বিস্তারিত দলিল- প্রমাণের ভিত্তিতে শরী'আর নানান শাখা বিধি-বিধান আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা করে।'[২৩৮]

যারা ফিকহ চর্চা করেন তাদের নিকট এটাই ফিকহের সংজ্ঞা। তবে যারা ফিকহের পাঠক ও বর্ণনাকারী তাদের নিকট ফিকহের সংজ্ঞা অনেকটা সহজ। যেমন–

اَلْفِقْهُ هُوَ مَجْمُوْعَةُ الْأَحْكَامِ الْـمَشْرُوْعَةِ فِى الْإِسْلَامِ.

'ইসলাম-স্বীকৃত বিধি-বিধানের সমষ্টি হচ্ছে ফিকহ।'

ফিকহের আলোচ্য বিষয়

ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো, أَفْعَالُ الْعِبَادِ بِإِعْتِبَارِ النُّصُوْصِ

অর্থাৎ কুরআ'ন -সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে বান্দার কার্যাবলি আলোচনা করা। বান্দার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড দুভাগে বিভক্ত اَلْعِبَادَةُ (আল্লাহর গোলামী) ও اَلْـمُعَامِلَاتُ (দুনিয়ার যাবতীয় লেনদেন)। আর ইলমুল ফিকহ মানুষের এ দু'টি দিক নিয়েই আলোচনা করে।

---

২৩৭ জালাল উদ্দীন সুয়ূতি, *আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০০, ২খ. পৃ. ৩৪২

২৩৮ আহমদ ইবনে মুস্তাফা ইবনে খলীল, *মিফতাহুস সা'আদা ওয়া মিসবাহুস যিয়াদা ফী মাওযূ'আতিল উলূম*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৭, ২খ. পৃ. ১৭৩

ফিকহের উদ্দেশ্য

ইলমুল ফিকহের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরী'আর যাবতীয় হুকুম-আহকাম সর্বসাধারণের কল্যাণে প্রকাশ করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের কোনটা কর্তব্য বা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব বা কোন কোন বিষয় নিষেধ ও হারাম তা জানার মাধ্যম ফিকহ। ফিকহ বা আইনশাস্ত্র ব্যতিরেকে ইসলামী সমাজ এক মুহূর্তের জন্যও চলতে পারে না। কুরআ'ন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে ফিকহশাস্ত্রের এই গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ

'কী হলো মুমিনদের! তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একদল লোক দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে বেরুচ্ছে না কেন? যাতে তারা শিক্ষা শেষে ফিরে এসে স্বজাতির লোকদের সতর্ক করতে পারে।'[২৩৯]

এখানে মূলত لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ দ্বারা ইলমুল ফিকহ শিক্ষাই উদ্দেশ্য।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ».

'আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের (ইসলামের) সঠিক জ্ঞান দান করেন।'[২৪০]

ইমাম বায়হাকী হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন,

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ الدِّيْنِ الْفِقْهُ».

' প্রত্যেক কিছুর একটি ভিত্তি থাকে, আর দ্বীনের (ইসলামের) ভিত্তি হলো ইলমুল ফিকহ।'[২৪১]

কুরআ'ন ও হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম যে তাগিদ দেয়া হয়েছে এর মূল লক্ষ্য হলো দ্বীনের প্রয়োজনীয় আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। যারা কুরআ'ন ও হাদীস থেকে সরাসরি হুকুম-আহকাম উদঘাটন করার ক্ষমতা রাখেন না, তাদের জন্যে ইলমুল ফিকহ অধ্যয়ন করা ফরয। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ».

---

২৩৯ আল-কুরআ'ন - ৯ : ১২২

২৪০ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ১খ. ১, পৃ. ২৫

২৪১ আহমদ ইবনে হুসাইন আল বায়হাকী, *আল জামে শুয়াবুল ঈমান*, মাকতাবা আর রুশদ, বৈরুত, ১৪২৩/২০০৩, ৩খ. পৃ. ২৩১

'ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয।'[২৪২]

এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, এখানে ইলম দ্বারা সে ইলম উদ্দেশ্য যা তার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল, হারাম, পাক, নাপাক ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান। আর এসব জ্ঞান কুরআ'ন -হাদীস পড়ে সাধারণের পক্ষে অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই আমরা বলব যে, ইসলামী জিন্দেগী তথা দৈনন্দিন কার্যক্রম, ইবাদত বন্দেগী ছাড়াও ব্যবসায় বাণিজ্য, আইন-বিচার, প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন। কুরআ'ন মজীদে لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ 'যাতে তারা দ্বীনের ব্যাপারে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করতে পারে' বলে সে কথাই বলা হয়েছে। কাজেই সত্যিকার ইসলামী জীবন যাপনের রীতিনীতি জানার জন্য ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ফিকহের ক্রমবিকাশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইলমুল ফিকহের কোন স্বতন্ত্র রূপ ছিল না। কারণ, যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হত তখনই মানুষ স্বয়ং নবীজীর নিকট ছুটে যেত এবং তাঁর কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সমাধান পেয়ে যেত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর থেকে সাহাবীদের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হত। অবশ্য তখন সাধারণ সাহাবীগণ অভিজ্ঞ সাহাবীদের স্মরণাপন্ন হতেন, যারা কুরআ'ন ও সুন্নাহর ব্যাপারে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও ফিকহগত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশিদার শাসনামলে ইসলামের আলো আরবের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে, ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে বিভিন্ন দেশ, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন আবহাওয়া ও ভিন্ন সংস্কৃতির হাজার হাজার মানুষ। সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন আইনি জটিলতা। এরই আলোকে খলিফাগণ কুরআ'ন -সুন্নাহ বিশেষজ্ঞদের বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে এ সকল সমস্যার সমাধান করতে থাকেন।

খোলাফায়ে রাশিদার যুগ অতিক্রান্ত হলে উমাইয়া খলীফাদের শাসনামলে ইসলামের আলো পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানগণ ভারত, স্পেন, আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। একই সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে এবং কুরআ'ন ও হাদীসের ব্যাখ্যাগত ভিন্নতা হেতু শিয়া, খারিজী, রাফিযী, জাবরিয়া, কাদরিয়া, মুরজিয়া ইত্যাদি নানা মতবাদের উদ্ভব ঘটে এবং এ সকল মতের অনুসারীরা নিজেদের ইচ্ছার স্বপক্ষে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি করতে শুরু করে।

এদিকে নওমুসলিমদের অধিকাংশ অনারব হওয়াতে কুরআ'ন -সুন্নাহ অধ্যয়ন ও গবেষণা করে তা থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধারণ আরবদের পক্ষেও কুরআ'ন সুন্নাহ থেকে সরাসরি কোন সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করা সম্ভবপর ছিল না। ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের সহজলভ্যতার দারুণ অভাব দেখা দেয়। এ সুযোগে কোনো কোনো মুসলিম শাসক নিজেদের ক্ষমতা ও

---

২৪২ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজা আল-কাযবিনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া, বৈরুত, ২০০৯ খ্রি. ১ খ. পৃ. ৮১

মতাদর্শ টিকিয়ে রাখার মানসে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো আইন প্রণয়ন করে তা ইসলামী আইন বলে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে চালিয়ে দেয়।

বলাবাহুল্য ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতির ফলে মুসলমানদের জীবনে এমন কিছু সমস্যা এসে উপস্থিত হয় যার সুস্পষ্ট সমাধান কুরআ'ন কিংবা হাদীসে খোলাখুলি উল্লেখ নেই। ফলে এ সকল সমস্যার সমাধানে নানা মতের মুসলমানগণ নানা অভিমত পোষণ করে। এতে করে সাধারণ মুসলামানদের জন্যে ইসলামী আইনের যথার্থ অনুসরণ কঠিন হয়ে পড়ে।

ইসলামী বিশ্বের এ কঠিন মুহূর্তে ইমাম আবূ হানীফা (র), হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র), হযরত হাম্মাদ ইবনে সুলাইমান (র), হযরত রাবীয়াতুর রায় (র) [ইমাম মালিক (র)-এর শিক্ষক], ইমাম মালিক (র), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ মহামনীষীদের মনে ইলমুল ফিকহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও তা সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়ে ওঠেছিল। ফলে যিনি সর্ব প্রথম ফিকহুল ইসলামী নামক শাস্ত্রের প্রবর্তন করেন তিনি ইমাম আজম শাফেয়ীসহ অসংখ্য মুজতাহিদ ইলমুল ফিকহ নিয়ে কঠোর সাধনা করেন এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্যে একটি পরিপূর্ণ ফিকহশাস্ত্র উপহার দেন।

উমাইয়া যুগে হাদীস সংকলনের সূচনা হলেও তৎকালে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল ও পূর্ণাঙ্গ ফিকহগ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। আব্বাসীয় যুগে ফিকহ চর্চা, সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়ন প্রচেষ্টা সফল হয়। আব্বাসীয়গণ সরকারি নীতি হিসেবে ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হওয়ায় তাদের সময় হাদীস ও ফিকহ চর্চার তিনটি কেন্দ্রে যথাক্রমে ইমাম মালিক (র), ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আওযায়ী (র)-এর স্বতন্ত্র মাযহাবের উৎপত্তি হয়। পর্যায়ক্রমে এসব এলাকায় আবির্ভূত হন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম শাফিয়ী (র) প্রমুখ ফিকহী ইমামগণ।

ঐতিহাসিক সূত্রমতে, দ্বিতীয় হিজরীর তৃতীয় দশক থেকে সুগঠিতভাবে ইলমুল ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। তারপর থেকে অদ্যবধি ফিকহশাস্ত্রের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের কাজ নানাভাবে অব্যাহত রয়েছে। বর্ণনার সুবিধার্থে ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইলমুল ফিকহ সম্পাদনা ও এর ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন,নিম্নে এ তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা বিবৃত হলো।

প্রথম বা প্রাচীন যুগ (হিজরী ১৩০-৪০০)

যদিও হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়া থেকেই কেউ কেউ বিভিন্ন ফিকহী আহকাম নিজেদের নোটবুকে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন; কিন্তু সেগুলোর কোন সুনির্দিষ্ট নাম ও নীতি-কানুন ছিল না। মূলত হিজরী দ্বিতীয় শতকের তৃতীয় দশক থেকে ফিকহুল ইসলামী শিরোনামে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয় এবং তা হিজরী চতুর্থ শতকের প্রথম নাগাদ অব্যাহত থাকে। এ সময়ে ইলমুল ফিকহের মৌলিক নীতিমালা ও আহকামসমূহ সুবিন্যস্তভাবে সম্পাদিত হয়। এ সময়ে বহুসংখ্যক মুজতাহিদ ইলমুল ফিকহ নিয়ে তোড়জোড় গবেষণা শুরু করেন। এক্ষেত্রে যিনি প্রথম, প্রধান, অগ্রণী ও পথিকৃৎ ছিলেন তিনি হলেন নু'মান ইবনে সাবিত ওরফে আবূ হানীফা (র)। তাঁকে ইমাম আযম বলা হয়। তিনি ৪০ জন ইসলামী গবেষক (মুজাতাহিদ)-এর সমন্বয়ে একটি জেনারেল কমিটি গঠন করেন। এর মধ্য হতে দশজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে বিশেষ (উচ্চ পর্যায়ের) কমিটি গঠন করে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৩২ হিজরী থেকে ১৪২ হিজরী পর্যন্ত দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম

করে তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে এ কমিটি 'ফিকহে হানাফী' নামে একটি বিশাল গ্রন্থ সম্পাদন করে। এতে ৮৩ হাজার মাসয়ালা বা সমস্যার সমাধান উল্লিখিত হয়।

তাঁকে অনুসরণ করে কাছাকাছি সময়ে আরো কয়েকজন বিখ্যাত মুজতাহিদ নিজেদের চিন্তা-গবেষণার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন ফিকহের মূলনীতি ও গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই সফলতাও পান। তাঁরা নিজেদের গবেষণাকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণীয় করে তুলতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে চারজন মুজতাহিদকে ইমাম বলা হয়, যারা নিজেদের সম্পাদিত ফিকহের আলোকে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হলেন

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র); তাঁর মাযহাবের নাম হানাফী মাযহাব,

২. ইমাম আশ-শাফিয়ী (র); তাঁর মাযহাবের নাম শাফেঈ মাযহাব,

৩. ইমাম মালিক (র); তাঁর মাযহাবের নাম মালিকী মাযহাব ও

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র); তাঁর মাযহাবের নাম হাম্বলী মাযহাব।

এ চারজন ইমামের এমন অনেক সহচর ও সহযোগী ছিলেন, যাঁরা ইজতিহাদে পারদর্শী। ফলে তাঁরা স্ব-স্ব মাযহাবকে দৃঢ় ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গবেষণা অব্যাহত রাখেন। এ সময় সাধারণ লোকদের মাঝে মাযহাব অনুসরণের প্রিয়তা ব্যাপকতর হতে থাকে।

দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যযুগ (হিজরী ৪০০-৬৫০)

হিজরী চতুর্থ শতকের শুরু থেকে সপ্তম শতকের শেষ অবধি এ যুগের ব্যাপ্তি। এ যুগে এসে মুজতাহিদগণ স্বতন্ত্র ফিকহ সম্পাদনার খেয়াল ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠিত চার মাযহাবের উদ্ভাবিত মাসায়েলের ওপর জোর গবেষণা চালান। এ সময় তারা নিজ নিজ মাযহাবের সত্যতা, যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের লক্ষ্যে তথ্যনির্ভর বহুসংখ্যক বড় বড় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ যুগেই মাযহাব চতুষ্টয় মুসলিম উম্মাহর নিকট সর্বজনগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করা হয়। এ মর্মে মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, চারটি মাযহাবই সত্য ও অনুসরণযোগ্য।

ফলে সাধারণ মানুষ তাদের পছন্দমত মাযহাব গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি খলিফাগণও নিজেদের পছন্দসই মাযহাবের ফকীহদেরকে সরকারি কাযী নিয়োগ করত সংশ্লিষ্ট মাযহাবের প্রণীত আইনের আলোকে রাষ্ট্র ও বিচারকার্য পরিচালনা শুরু করেন। এতে করে ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণার দৃষ্টি কুরআ'ন-হাদীস থেকে ফিকহের প্রণীত মূলনীতি ও মাসায়েলের ওপর নিবদ্ধ হয়। আর সাধারণ জনতা প্রশ্নাতীতভাবে মাযহাব মেনে চলতে থাকে।

এ যুগে ইলমুল ফিকহের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ফিকহী মাসায়েলের টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা সম্বলিত শত শত গ্রন্থ রচিত হয়। ফলে এ যুগেই ইলমুল ফিকহ সর্বদিক থেকে পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলে পরবর্তী যুগে ইলমুল ফিকহের মূলনীতি নিয়ে আর কোন গবেষণা না হলেও ফকীহদের প্রণীত আহকামের কোন কোন ব্যাপারে নতুন নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ যুগ থেকেই বিশ্ব মুসলিম জীবন-যাপনের ব্যাপারে মূলত চার মাযহাবের অনুসরণ করতে যেয়ে দৃশ্যত চারটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় যুগ (হিজরী ৬৫০-আজ অবধি)

আব্বাসীয় খলীফাদের পতনকাল আনুমানিক ৬৫০ হিজরী সাল থেকে ইলমুল ফিকহের তৃতীয় যুগ শুরু হয়। এ যুগের আলিমগণ ফিকহী মাসায়েল অবগতির জন্যে কুরআ'ন -সুন্নাহর প্রতি ধাবিত হওয়া নিস্প্রয়োজন মনে করতেন। এমনকি অনেকে তা জায়েযও মনে করতেন না। তাদের যুক্তি হলো, যারা ফিকহী মাসায়েল সুন্দরভাবে লিখে গেছেন তাঁরা বর্তমান যুগের আলিমদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও যোগ্য ছিলেন। তাছাড়া চার মাযহাব সত্য ও অনুসরণীয় এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে বলেও তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন। কাজেই ফিকহী আহকামের কোন ব্যাপারে এমন কোন সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দেয়া জায়েয হবে না, যা চার মাযহাবের কোন একটিতেও নেই। তাদের ভাষায় মুসলমানদের ওপর মাযহাব মেনে চলা ফরয। এ জাতীয় প্রচারণা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়লে ইজতিহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন আলিমগণও শরয়ী আহকাম নিয়ে চিন্তা-গবেষণার ইচ্ছে পোষণ করতে পারেননি। তারা ফিকহের প্রণীত ফতোয়াগুলো যথার্থ কি-না অথবা একই ব্যাপারে যেখানে চার ইমাম চার রকম অভিমত পোষণ করেছেন ঐ চারটি অভিমতের মাঝে কোনটি অধিক বিশুদ্ধ ও সমাজসম্মত তা ভেবে দেখার সাহসও করতেন না। কেবল ফিকহের কিতাব নিজে মুখস্থ করতেন এবং অপরকে মুখস্থ করানোর কাজে সময় দিতেন। ফলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিশ্বের প্রায় ৮০ ভাগ মুসলিম এ যুগে মাযহাবের অনুসারী হয়ে পড়ে। এ জন্যে এ যুগকে তাকলীদের যুগ বলা হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগের পর থেকে আর কারো জন্যে ইজতিহাদের দরজা খোলা নেই; সবাইকে কোন না কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে।

তবে কুরআ'ন ও সুন্নাহের ভাষ্য মতে, ইজতিহাদের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। যোগ্য আলিমগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন। তাঁদের ওপর সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাব মেনে চলা আবশ্যক নয়।

প্রথম যুগে ফিকহী মাসায়েল সম্পাদনার পদ্ধতি

সুগঠিতভাবে সর্ব প্রথম যিনি ইলমুল ফিকহের সম্পাদনার কাজে হাত দেন তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)। তাঁর শিক্ষক হযরত হাম্মাদ (র)-এর মৃত্যুর পর তিনি এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু উমাইয়াগণ ইমাম সাহেবের বিরোধিতায় নামলে তিনি ফিকহ সম্পাদনার কাজ স্থগিত রেখে ফিকহ গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। ১৩২ হিজরী সালে উমাইয়া ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটলে তিনি তোড়জোড়ে ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু করেন।

প্রথমে তিনি সেকালের সেরা চল্লিশজন মুজতাহিদ নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এটার নাম ছিল মজলিসুল আম বা সাধারণ পরিষদ। এঁদের মধ্য হতে অভিজ্ঞ ও আইন বিশেষজ্ঞ দশজনকে নিয়ে মজলিসুল খাস বা বিশেষ উচ্চ পরিষদ গঠন করেন। এ উচ্চ বোর্ডের সদস্যদের মধ্য হতে ইমাম আবূ ইউসূফ (র), ইমাম যুফার (র), ইমাম দাউদ আততায়ী (র), ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (র), ইমাম ইউসূফ ইবনে খালিদ (র), ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আবূ যায়িদ (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম আযম (র) সমাজে সৃষ্ট সমস্যা বোর্ডের সদস্যদের সম্মুখে পেশ করতেন এবং সকলে মিলে এর যথার্থ সমাধান বের করতেন। কখনো বা বোর্ডের সদস্যদের কেউ প্রশ্নাকারে সৃষ্ট সমস্যা তুলে ধরতেন। এভাবে প্রশ্নোত্তর আকারে দিনরাত অধিবেশন চলতে থাকত। প্রতিদিন যে সকল সমাধানে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন তা ফাতোয় (রায়) হিসেবে লিখে রাখা হতো। পাশেই লিখে রাখা হতো দলিল- প্রমাণ।

এভাবে বছরের পর বছর গবেষণার সাথে সাথে সম্পাদনার কাজও চলতে থাকে। এ পর্যায়ে সমাজে সৃষ্ট যাবতীয় সমস্যার সমাধান লিপিবদ্ধকরণ শেষ হয়ে যায়। তখন ইমাম আযম ও তাঁর সম্পাদনা বোর্ডের সদস্যগণ অনাগত দিনে কিরূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং অনাগত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানও লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম আযম ছিলেন বোর্ডের মধ্যমণি। সকলেই যুক্তি-তর্কের সাথে কুরআ'ন -সুন্নাহর দলিল উল্লেখ করে ইমাম আযম সাহেবের ফতোয়ার অপেক্ষা করতেন। তাঁর প্রদত্ত ফতোয়ার সাথে বোর্ডের কোন সদস্যের তেমন মতৈক্য দেখা যেত না। কখনো যদি কোন সদস্য তার অভিমতের ওপর অটুট থাকতেন তখন তার অভিমতটিও দলিল- প্রমাণসহ লেখা হতো।

বলাবাহুল্য ইমাম আযম সবার সেরা ও তাঁদের মধ্যমণি, তাই বলে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তি মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হত এমনটি নয়। বরং কুরআ'ন সুন্নাহর দলিল ও যুক্তি-প্রমাণে যা সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হতো তাই হতো ফতোয়া। এর প্রমাণ আমরা হানাফী মাযহাবে পাই। যেখানে ইমাম আযম সাহেবের মতের ওপর ফতোয়া না হয়ে ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতের ওপর ফতোয়া হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন ইমাম আযম সাহেবের ছাত্র ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। কাজেই একথা বলার কোন অবকাশ নেই যে, ফিকহে হানাফীতে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর একচ্ছত্র প্রভাব ছিল, বরং তা ছিল দলিল- প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাচাই করা সমাধান সমষ্টি।

কোন সমস্যার সমাধান প্রথমে কুরআনে অন্বেষণ করা হত। কুরআনে পেলে তার আলোকেই ফতোয়া দেয়া হতো। কুরআনে কোন সমাধান সরাসরি না পেলে কুরআনের ইশারা ইঙ্গিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি দেয়া হত, এখানেও না পেলে বিশুদ্ধ হাদীসের আশ্রয় নিয়ে সমস্যার সমাধান করে ফতোয়া দেয়া হত। প্রয়োজনে ইজমা, কিয়াস ও ইসতিহসানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানপূর্বক রায় দেয়া হত।

বলাবাহুল্য, দলিল- প্রমাণ কেবল আক্ষরিক দাবির মাঝে বন্দি না রেখে এ পরিষদ সামাজিক বাস্তবতার সাথে মিল রেখে ফতোয়া প্রদান করেছে। যে কারণে মানুষের জন্যে দ্বীন পালন করা সহজ হয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশও যথাযথভাবে পালিত হয়েছে।

এভাবে ব্যাপক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সম্পাদনার কাজ একটানা প্রায় ১২ বছর (হিজরী ১৩২-১৪৪) ধরে চলে। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁরা ৮৩ হাজার সমস্যার সমাধানের ফতোয়া সম্বলিত একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এ সংকলনের নাম দেয়া হয় 'ফিকহে হানাফী' বা কুতুবে হানাফী।

এ সংকলনে ৩৮ হাজার মাসআলা ছিল ইবাদত সংক্রান্ত। বাকি ৪৫ হাজার মাসআলা-মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, আচার-বিচার, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত। ঐতিহাসিক সূত্রমতে, পরবর্তিতে ঐ সংকলনের মাসায়েল সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সুখের বিষয়, অদ্যাবধি মানুষ এমন কোন সমস্যায় পড়েনি যার সমাধান ফিকহে হানাফী তথা মাযহাবে হানাফীতে নেই। সঙ্গত কারণে ইমাম আযম সাহেবের জীবদ্দশায়ই এ মাযহাব বিশ্বের বুকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসীন হতে সক্ষম হয়। বর্তমান মুক্তচিন্তার যুগেও যে হানাফী মাযহাবের অনুসারীই পৃথিবীতে সর্বাধিক তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে বলে রাখা ভালো, ইমাম আযম সাহেবের সম্পাদিত ফিকহের সূত্র ধরে পরবর্তিতে বহুসংখ্যক ফকীহ নিজেদের স্বকীয়তা দিয়ে অনেক ফিকহ এর কিতাব রচনা করেছেন; মাযহাবও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু কালের বিচারে, চারটি মাযহাব ছাড়া বাকিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তাবাকাতুল ফুকাহা (ফকীহদের স্তর)

যেসব মনীষী ফিকহশাস্ত্রকে মুসলিম সমাজের আইন কানুন ও আচরণগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে *আল-জাওয়াহিরুল মুযীয়া ফীত-তবাকাতিল হানাফিয়া* নামক গ্রন্থে ফিকহ বিশেষজ্ঞদের সাতটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। আমরা স্তরগুলো এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথম স্তর

এ স্তরের ফকীহগণ সবাই মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁদেরকে 'মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন' বলা হয়। এঁদের মধ্যে চার ইমাম যথাক্রমে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফিয়ী (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রধান।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের ফকীহগণও ইজতিহাদের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। তবে তারা সরাসরি দ্বীনের মাঝে ইজতিহাদ না করে ইমাম চতুষ্টয়ের প্রণীত নীতির আলোকে গবেষণা করতেন, তাই তাঁদেরকে 'মুজতাহিদ ফিল-মাযাহিব' বলা হয়। এঁদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (র), ইমাম যুফার (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রমুখ প্রধান। উল্লেখ্য যে, তাঁরা কখনো কখনো ইমাম দের প্রণীত ফতোয়ার বিপরীতেও মত পোষণ করতেন এবং অনেকাংশে তা গৃহীতও হয়েছে।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের ফকীহদের ইজতিহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সরাসরি কুরআ'ন সুন্নাহতে (বা মাযহাবের বিষয়ে) ইজতিহাদ না করে ইমাম চতুষ্টয়ের প্রণীত মাসায়েল নিয়ে ইজতিহাদ করেছেন। তাই এ স্তরের ফকীহদেরকে 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল' নামে অভিহিত করা হয়। এঁদের মধ্যে ইমাম আবূ বকর আল-জাসসাস (র), ইমাম তাহাবী (র), ইমাম আবূল হাসান আল-কারখী (র), ইমাম শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (র), ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (র), ইমাম হালুয়ায়ী (র) প্রমুখ প্রধান। তাঁরা সকলেই ফিকহের বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের ফকীহদেরকে أَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ বলা হয়। তাঁরা ইমাম চতুষ্টয়ের প্রণীত ফিকহের মূলনীতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দলিল- প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে মাসআলার সমাধান তৈরি করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। তাঁরা চার ইমামের প্রণীত মাসায়েল ও মূলনীতির ওপর গবেষণা করে দৃষ্টান্তের সাহায্যে নতুন নতুন খণ্ড মাসয়ালা আবিষ্কার করতেন। তাই তাঁদের 'আসহাবে তাখরীজ' নামে অভিহিত করা হয়। ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকলেও তাদেরকে সরাসরি

মুজতাহিদ বলা হয় না। কারণ, তারা ইজতিহাদ করেছেন মাসায়েল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং তারা অনেক খণ্ড মাসআলা আবিষ্কার করেছেন বৈকি। তাঁরা হলেন, ইমাম আবূ বকর আল-রাযী (র), ইমাম খাসসাফ (র) ও তাঁদের সমসাময়িকগণ।

পঞ্চম স্তর

তবাকাত প্রণেতার মতে, এ স্তরের ফকীহদের মুজতাহিদ বলা হবে না। তবে কুরআ'ন -সুন্নাহ ও ইলমুল ফিকহ বিষয়ে তাঁরা যে দক্ষ ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁরা পূর্ববর্তী ফকীহদের প্রণীত মাসায়েল আকলী ও নকলী দলিলের আলোকে ব্যাখ্যা-বিশেণ্ডষণ করে কোন অভিমতটি অধিক শুদ্ধ ও অনুকূল তা নির্ণয় করতেন।

উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ফকীহগণ একই ব্যাপারে একাধিক অভিমত পোষণ করেছেন। এ স্তরের ফকীহগণ ঐসব অভিমত হতে একটিকে প্রাধান্য দিতেন অর্থাৎ যে অভিমতটি প্রাধান্য পেতে পারে সে অভিমতটির স্বপক্ষে উপযুক্ত দলিল- প্রমাণ উল্লেখ করে তা বর্ণনা করতেন। তাই তাদেরকে أَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ বলা হয়। এঁদের মাঝে ইমাম আবূল হাসান আল-কুদরী (র), ইমাম বুরহানুদ্দীন আল-মুরগীনানী (র) ও তাঁদের সমসাময়িক ফকীহগণ প্রধান।

ষষ্ঠ স্তর

এ স্তরের ফকীহগণ মুজতাহিদ ছিলেন না। তাঁরা দুর্বল-সবল, মাশহুর-বিরল, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইত্যাদি মাসায়েল নির্ণয় করেছেন। তাঁরা কোন মাসআলাকে অপর কোন মাসআলার ওপর প্রাধান্য দেননি'; বরং পূর্ববর্তী ফকীহগণ কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনা তাদের কিতাবে পাশা-পাশি উল্লেখ করে প্রমাণিত বা পার্থক্য নির্ণয় করেছেন মাত্র। তাই তাদেরকে أَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ তথ্য 'বাছাইকারী' বলা হয়ে থাক। এঁদের মধ্যে ফকীহ আল-কারওয়ারী (র), হযরত জামালুদ্দীন হুছাইনী (র), হযরত হাফেযুদ্দিন নাফাসী (র) প্রমুখ প্রধান। দুর্বল ও সবল অভিমত চিহ্নিত করার পূর্ণ যোগ্যতা তাদের ছিল। *কানযুদ দাকায়িক*, *আল-বকায়া*, *মাজমা*, *ফাতহুল কাদীর*, *বাহরুর রায়িক*, *মুখতাসারুল মাআনী* প্রমুখ গ্রন্থ প্রণেতা এ স্তরের ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম স্তর

এ স্তরের ফকীহগণ কেবল ইলমুল ফিকহ অধ্যয়ন করেন নিজে মাসায়েল জানার জন্যে এবং অপরকে জানানোর জন্যে। যোগ্যতা থাকা না থাকা বড় কথা নয়; ইলমুল ফিকহ যেহেতু পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই, তাই এ স্তরের ফকীহগণ ফিকহের কিতাব পড়ে মানুষকে শুনাবেন; ফিকহের কিতাব দেখে মাসায়েল বর্ণনা করবেন; নিজের খেয়াল-খুশি মতো ফতোয়া প্রদানের কোন অধিকার তাদের নেই। এ শ্রেণীর ফকীহগণ সাধারণ মানুষের মতই মুকাল্লিদ তথা মাযহাবের নিরংকুশ অনুসারী।

মুতাকাদ্দিমীনের পরিচয়

মুতাকাদ্দিমীন (اَلْـمُتَقَدِّمِيْنُ)-এর বাংলা হলো পূর্ববর্তীগণ। তারিখে ইলমুল ফিকহ গবেষকদের মতে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিকহ সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও তাঁদের সমসাময়িক ফকীহদের ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দিমীন বলা হয়। এঁদের মধ্যে চার ইমাম ও আবূ ইউসূফ, যুফার (র) প্রমুখ প্রধান।

মুতাআখখিরীনের পরিচয়

মুতাআখখিরীন (اَلْـمُتَأَخِّرِيْنُ)-এর বাংলা হলো পরবর্তীগণ। তারিখে ইলমুল ফিকহ বিশারদদের মতে, পরবর্তী তথা দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের ফকীহদের ফুকাহায়ে মুতাআখখিরীন বলা হয়। এঁদেরকে আবার দু'শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। যেমন–

ক. আকাবিরে মুতায়াখখিরীন যাদের জীবনকাল মুতাকাদ্দিমীনের পরপরই শুরু হয়। যেমন, ইমাম আবূ-বকর খাসসাফ (র), ইমাম জাসসাস (র), ইমাম সারাখসী (র), ইমাম হালুয়ায়ী (র), ইমাম তাহাবী (র), ইমাম রাযী (র) প্রমুখ ও তাঁদের সমসাময়িক ফকীহগণ।

খ. তাঁদের পরবর্তীতে যে সকল ফকীহ ইলমুল ফিকহ নিয়ে সৃষ্টিশীল উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাদেরকে সাধারণভাবে ফুকাহায়ে মুতাআখখিরীন বলা হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরের ফকীহগণ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

চার মাযহাব এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইসলামের ফিকহ ৪টি শাখায় বিকাশপাপ্ত হয়। এর প্রতিটি শাখাতেই হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের আইনবেত্তাগণের উদ্ভাবিত নীতির ভিত্তির ওপর স্বতন্ত্র আইনগ্রন্থসমূহ রচিত হয়। এ শাখা-চতুষ্টয় বা মাযহাবসমূহের মাঝে সামান্যই অমিল দেখা যায়। এসব মাযহাব যাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। মূলত হিজরী ১৩২ সাল থেকে গঠনমূলকভাবে ইলমুল ফিকহ সম্পাদনার কাজ শুরু হয়। এরপর কাছাকাছি সময়ে এ কাজে বহুসংখ্যক আলিম প্রাণ-পণ চেষ্টা চালিয়ে বহু মাযহাবের জন্ম দেন। কিন্তু কালের বিচারে এসব মাযহাবের প্রায় সবই গ্রহণযোগ্যতা হারায়। টিকে থাকে কেবল চারটি মাযহাব: ১. হানাফী মাযহাব, ২. শাফেঈ মাযহাব, ৩. মালেকী মাযহাব ও ৪. হাম্বলী মাযহাব।

এছাড়াও আহলুল হাদীস নামে একটি মাযহাব বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের প্রায় সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছে। বর্তমানে আরব এবং মিসরেও এদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এরা প্রাচীন আহলুল হাদীস ও যাহিরীগণের ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়। এরা নির্দিষ্ট কোন মাযহাব বা ইমামের তাকলীদ (تَقْلِيْدٌ) তথা অনুসরণ করে না বিধায় তাদেরকে غَيْرُ مُقَلِّدٍ (গাইরে মুকাল্লিদ) নামেও অভিহিত করা হয়।

আমরা এখানে চার মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই।

১. হানাফী মাযহাব–ইমাম আবু হানিফা

ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠতা, তাঁর উপনাম আবূ হানীফা (র)-এর 'হানীফা' শব্দের সাথে সম্পর্কি করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম দেয়া হয় হানাফী মাযহাব।নিম্নে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

পরিচিতি: নাম নু'মান, উপনাম আবূ হানীফা। এ নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। পিতার নাম সাবিত। তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন।

জন্ম

তিনি হিজরী ৮০ মুতাবিক ৭০০ খ্রিস্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন।

বংশধর

আবূ হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যুতী'আত-তায়মী। কারো কারো মতে, তাঁর দাদা যুতা' ছিলেন কাবুলের অধিবাসী এবং বনু তাইমুল্লাহ ইবনে সা'লাবার ক্রীতদাস। তাঁরা তাঁকে আযাদ করার পর তাঁর পিতা সাবিত স্বাধীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ সর্বদা আযাদই ছিলেন, কখনো ক্রীতদাস ছিলেন না। সাবিত ছোটবেলায় হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে আগমন করেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) তাঁর ও তাঁর বংশধরের জন্যে বরকতের দু'আ করেন।

বাল্যকাল

তিনি বাল্যকাল হতেই তীক্ষ্ম ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি আয় উপার্জনের দৈহিক কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। পরে একজন বিশিষ্ট আলিমের পরামর্শে জ্ঞানার্জনের উৎসাহ লাভ করেন। এক সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত খাদেম ও প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী কূফায় আগমন করলে তিনি অল্প বয়সে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তৎকালীন কূফায় প্রথানুযায়ী বিশ বছরের পূর্বে হাদীস বর্ণনার সুযোগ না থাকায় তিনি তাঁর নিকট থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। তবে তাঁকে দেখে বাল্য বয়সেই তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন

তিনি মাত্র সতের বছর বয়সে জ্ঞানার্জনে আত্ম নিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ইলমুল কালামে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর পবিত্র কুরআ'ন ও হাদীসের জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআ'ন ও হাদীসের বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হন। তিনি হাদীস, তাফসীর, নাসিখ-মানসূখ ইত্যাদি জ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন করে ছিলেন।

গুণাবলি

ইমাম আবূ হানীফা (র) অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, বিশিষ্ট আবিদ এবং অতিশয় বুদ্ধিমান। তিনি একাধারে ৩০ বছর রোযা রেখেছেন এবং ৪০ বছর যাবত রাতে ঘুমাননি। ইবাদত-বন্দেগীতে রজনী কাটিয়েছেন। প্রতি রমযানে ৬১ বার কুরআ'ন মাজীদ খতম করতেন। অনেক সময় এক রাকাতেই কুরআ'ন মাজীদ এক খতম দিতেন। তিনি ৫৫ বার হজ্জ করেছেন। জীবনের শেষ হজ্জের সময় কা'বা শরীফে দু'রাকাআত নামায এভাবে পড়েন যে, প্রথম রাকাতে এক পা উঠিয়ে প্রথম অর্ধাংশ কুরআ'ন মাজীদ পাঠ করেন, তারপর দ্বিতীয় রাকাআতে অপর পা উঠিয়ে বাকী অর্ধাংশ কুরআ'ন পাঠ করেন। যে স্থানে তাঁর ইন্তাকাল হয়েছে সেখানে এক হাজার বার কুরআ'ন মাজীদ খতম করেছেন।[২৪৩] তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছেন।

তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও খোদাভীরু ছিলেন। একদিন কূফায় ছাগল চুরি হয়ে গেলে তিনি সাত বছর পর্যন্ত ছাগলের গোশত ভক্ষন করেননি। কেননা, ছাগলের বয়স সাত বছর হয়ে থাকে।[২৪৪] তাঁর ইবাদতের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি চল্লিশ বছর যাবত ইশার নামাযের অযূ দ্বারা ফযরের নামায আদায় করেছেন। তিনি প্রতি মাসে কুরআ'ন মাজীদ ষাট খতম দিতেন।

---

২৪৩ মিফতাহুস সা'আদা ওয়া মিসবাহুস যিয়াদা ফী মাওযূ'আতিল উলূম, আ্হমদ ইবনে মুস্তাফা ইবনে খলীল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৭, আবুল ফযল শাহাবুদ্দীন ইবনে হাজর আসকালানী, মুদ্রণে দারুল কিতাবিল ইসলামী, কায়রো, পৃ-১৩

২৪৪ প্রাগুক্ত

ইমাম আজম সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি

তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। যেমন–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন,

لَوْلَا أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَغَاثَنِيْ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ كُنْتُ كَسَائِرِ النَّاسِ.

'আল্লাহ তা'আলা যদি ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সুফিয়ান সওরী (র) দ্বারা আমাকে সহায়তা না করতেন, তবে আমি অন্যান্য মানুষের মত থাকতাম।'[২৪৫]

২. ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, اَلنَّاسُ عِيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَىٰ أَبِيْ حَنِيْفَةَ.

'মানুষ ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পরিবার।'[২৪৬]

৩. তিনি অন্যত্র বলেন, مَنْ أَرَادَ الْفِقْهَ فَعَلَيْهِ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ.

'যে ব্যক্তি ফিকহশাস্ত্র শিখতে চায় সে যেন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ছাত্রদেরকে আঁকড়ে ধরে।'[২৪৭]

৪. হযরত ইবনে মুবারক (র) আরও বলেন, أَفْقَهَ النَّاسِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مَا رَأَيْتُ فِي الفِقْهِ مِثْلَهُ.

'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকহ-বিশারদ হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র), আমি ফিকহশাস্ত্রে তাঁর ন্যায় যোগ্য কাউকে দেখিনি।'[২৪৮]

৫. হযরত ইবনে মঈন (র) বলেন, كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ثِقَةً فِي الْحَدِيْثِ.

'ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীসে সেকাহ ছিলেন।[২৪৯]

৬. হযরত সুলায়মান ইবনে আবূ শায়খ বলেন, كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَرَعًا سَخِيًّا.

'ইমাম আবূ হানীফা (র) একজন বুযুর্গ ও দানশীল ছিলেন।'[২৫০]

---

২৪৫ তাহযীবুত তাহযীব, আবুল ফযল শাহাবুদ্দীন ইবনে হাজর আসকালানী, মুদ্রণে দারুল কিতাবিল ইসলামী, কায়রো, ১৩২৭ হিজরি, ১০খ. ১০, পৃ. ৪৫০

২৪৬ তারীখু বগদাদ, আলী ইবনে সাবেত আল-খতীবুল বগদাদী, আল মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২/২০০১ ২২খ. পৃ. ৮২

২৪৭ প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৫১

২৪৮ ইবনে হাজর আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব,, খ. ১০, পৃ. ৪৫০

২৪৯ সিয়ারু আ'লামিন নুবুলা, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আবু আব্দিল্লাহ, বায়তুল আফকারিদ দুয়ালিয়া, ২০০৯, ৬খ. পৃ. ৩৯৫

২৫০ ইবনে হাজর আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ১০, পৃ. ৪৫০

৭. হযরত আবূ নুয়াইম (র) বলেন, كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ صَاحِبَ غَوْصٍ فِي الْمَسَائِلِ.

'ইমাম আবূ হানীফা (র) মাসআলায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।'[২৫১]

৮. হযরত আহমদ ইবনুস সাব্বাহ (র) থেকে বর্ণিত,

سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ قِيْلَ لِمَالِكٍ هَلْ رَأَيْتَ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَجُلًا لَوْ كَلَّمَكَ فِي هَذِهِ السَّارِيَةِ أَنْ يَجْعَلَهَا ذَهَبًا لَقَامَ بِحُجَّتِهِ.

'ইমাম শাফেঈ (র) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইমাম মালিক (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কি ইমাম আবূ হানীফ (র)-কে দেখেছেন'? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, 'হ্যাঁ! আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি যদি এ স্তম্ভটিকে স্বর্ণ বলে সাব্যস্ত করতে চান, তবে যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করতে পারেন।''[২৫২]

সাহাবীর সাথে সাক্ষাত ও সাহচর্য লাভ

ইমাম আবূ হানিফা (র) একাধিক বার প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সুতরাং তিনি তাবিয়ী। হাফেয ইবনে হাজার মক্কী (র), হযরত ইবনে জওযী (র) ও ইমাম দারে কুতনী (র) প্রমুখের মতে তিনি হযরত আনাস (রা) ছাড়াও আরও কতিপয় সাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য, তখন চারজন সাহাবী জীবিত ছিলেন,

১. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) কূফায়,

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) কূফায়,

৩. হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) মদীনায় ও

৪. আবূ তুফায়ল আমর ইবনে ওয়াসিলা (রা) মক্কায়।

ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার অবদান

তিনি ফিকহশাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনি তাঁর চল্লিশ জন সুদক্ষ ছাত্রের সমন্বয়ে একটি 'ফিকহ সম্পাদনা বোর্ড' গঠন করেন। এ বোর্ডের মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ বছর কঠোর পরিশ্রম করে ফিকহশাস্ত্রকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র এর রূপ দান করেন। বোর্ডের চল্লিশ জন সদস্য থেকে আবার দশ জন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করেন। ফিকহশাস্ত্র প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ বিশেষ বোর্ডের অবদান সবচেয়ে বেশি। বোর্ডের সামনে কোন একটি মাসয়ালা পেশ করা হত। অতঃপর সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা লিপিবদ্ধ করা হত। এভাবে ৯৩ হাজার মাসয়ালা 'কুতুবে হানাফিয়াতে' লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠতা, তাঁর নামানুসারে এ মাযহাবকে হানাফী মাযহাব বলা হয়।

---

২৫১ তাহযীবুল আসমা ওয়াল লোগাত, ইয়াহয়া ইবনে শরফ আন নববী, দারুল কুতুবিল ইসলমিয়া, বৈরুত ২০০৮, ২খ. পৃ. ২২০

২৫২ মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া সাহিবায়হি, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আবু আব্দিল্লাহ, লাজনাতু ইহয়াইল মাআরিফিন নোমানিয়া, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ২০০৯, পৃ. ৩১

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

তিনি ফিকহশাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক মনোনিবেশ করার দরুন হাদীস শাস্ত্রে তেমন অবদান রাখতে পারেননি। ইমাম যুরাকী (র) বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন– ৫০০, ৬০০, ৭০০, ১১০০। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো 'মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা (র)।

বিচারকের দায়িত্ব পালনে অনীহা

খলীফা মনসূর তাঁকে কূফা হতে বাগদাদে ডেকে এনে ইরাকের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে প্রথমে অনুরোধ এবং পরে চাপ প্রয়োগ করেন; কিন্তু ইমাম আযম তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তাঁকে জেলখানায় বন্দি করা হয় এবং দশদিন যাবত দৈ নিক দশটি করে চাবুকও মারা হয়।

শিক্ষকবৃন্দ

তাঁর ৪ হাজারের অধিক শিক্ষক ছিলেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন: আতা ইবনে আবূ রাবাহ (র), আসিম ইবনে আবূ নুজুদ (র), আলকামা ইবনে মারসাদ (র), হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলায়মান (র), হাকাম ইবনে ওতাইবা (র), সালামা ইবনে কুহাইল (র), আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (র), আলী ইবনে আকরাম (র), যিয়াদ ইবনে আলকাহ (র), সাঈদ ইবনে মাসরূফ সাওফী (র), আদী ইবনে সাবিত আনসারী (র), আবূ সুফিয়ান সা'দ (র), হিশাম ইবনে ওরওয়া (র) প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রগণ হলেন ইমাম আবূ ইউসূফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম যুফার (র), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র), ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র), আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র), হাফস ইবনে গিয়াস (র), যাকারিয়া ইবনে আবূ যায়িদা (র), হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা (র), ঈসা ইবনে ইউনূস (র), খারিজা ইবনে মুসয়াব (র), মুসয়াব ইবনে মিকদাম (র), আবূ আসিম (র) প্রমুখ।

রচনাবলি

তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো

১. مُسْنَدُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ

২. اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ

৩. وَصِيَّةُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ

কারো কারো মতে, তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর শিষ্যরোই তার নামে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন।

ইন্তিকালঃ

তিনি হিজরী ১৫০ সন মুতাবিক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মনসূর কর্তৃক প্রয়োগকৃত বিষক্রিয়ার ফলে কারাগারে ইন্তিকল করেন।

জানাযা ও অন্তীম শয়ান

তাঁর জানাযায় এতলোক জমায়েত হয়েছিল যে, পাঁচ বার জানাযা পড়তে হয়েছিল। তাঁর জানাযার সর্বশেষ ইমামতি করেন তাঁর পুত্র হাম্মাদ। তাঁকে গোসল দেন কুফার প্রধান কাযী হাসান ইবনে ওমারা (র)। তাঁকে খাইযারান নামক স্থানে তাঁর প্রিয়শিষ্য ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মাঝখানে সমাহিত করা হয়।

২. মালিকী মাযহাব-ইমাম মালিক (র)

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারে মাযহাবের নামকরণ হয় 'মালিকী মাযহাব।' তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

নাম

তাঁর নাম-মালিক, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, উপাধি ইমামু দারিল হিজরত। পিতার নাম আনাস।

বংশধারা

আবূ আবদুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক ইবনে আবূ আমর ইবনে আমর ইবনে হারিস ইবনে উসমান (মতান্তরে গাইমান) ইবনে জুসাইল ইবনে আমর ইবনে হারিস যিল আসাবাহ আল-আসবাহী।

জন্ম

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাতৃগর্ভে তিন বছর ছিলেন।

শিক্ষা জীবন

তৎকালীন সময়ে মদীনা ছিল কুরআ'ন ও হাদীস শিক্ষার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হয়। এটি হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় শহর। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ ইন্তিকাল করলেও তাঁদের বংশধরের অধিকাংশ এখানেই বসবাস করেন। অতঃপর ইমাম যুহরী (র), নাফে (র), ইবনে যাকওয়ান (র) এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র)-এর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। হিজাযের ফকীহ, রবীয়াতুর রায় (র)-এর নিকট তিনি ফিকহশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। স্বীয় উস্তাদগণ হতে রিওয়ায়েত ও ফতোয়া দানের সনদ প্রাপ্তির পর ফতোয়ার আসনে সমাসীন হন।

অধ্যাপনা

সতের বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। মসজিদে নববী ছিল তাঁর পাঠদানের জায়গা। বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য জ্ঞান-পিপাসু তাঁর দরবারে এসে জড়ো হতো।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) অসংখ্য জ্ঞানী পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন। উল্লিখিত শিক্ষকগণ ব্যতীত তাঁর উল্লেখযোগ্য আরো শিক্ষক হলেন: ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ ইবনে হরমুয (র), ২. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র), ৩. শায়খ আবূ যুবাইর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (র), ৪. শায়খ আবূ আবদুল্লাহ জাফর আস সাদিক (র) প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ

হযরত মালিক ইবনে আনাস (র) দীর্ঘকাল মসজিদে নববীতে শিক্ষার মজলিস পরিচালনা করেন। মদীনা নগরী তথা দূর দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করার দুর্বার স্পৃহা নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হত। তিনি এ সকল অনুরাগী শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞানের আলো দান করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন: ১. হযরত আবূ তাম্মা আবদুল আযীয ইবনে আবূ হাকেম (র), ২. হযরত উসমান ইবনে ঈসা ইবনে কানানা (র), ৩. হযরত মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান আল-মাখযুমী (র), ৪. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র), ৫. ইমাম আবূ ইউসূফ (র), ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র), ৭. ইমাম শাফিয়ী (র) প্রমুখ।

ব্যক্তিগত গুণাবলি

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফিকহ বিশারদ ও মুজতাহিদ ছিলেন। স্বয়ং ইমাম মালিক (র) বলেন, আমার এরূপ রজনী যায়নি, যে রজনীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিনি। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, 'ইমাম মালিক ইবনে আনাস না থাকলে হিজাযবাসীদের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেত। হাদীসের পাঠদানে ইমাম মালিক (র) খুবই আগ্রহবোধ করতেন এবং এটাকে তিনি ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে পাঠদান করতেন। পাঠদানের প্রারম্ভে গোসল করা, পরিস্কার জামা-কাপড় পরিধান করা ও খুশবু ব্যবহার ইত্যাদি ছিল তাঁর নৈমিত্তিক অভ্যাস। তিনি সুদীর্ঘ ৫০ বছর শিক্ষা ও ফতোয়া দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে তিনি মদীনায় পাদুকা ব্যবহার করতেন না এবং বাহনে চড়তেন না। তিনি বলতেন, যে জমিনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত আছেন, সে জমিনে আমি বাহনে চড়া লজ্জাবোধ করি।

নির্যাতন ভোগ

খলীফা মানসূর হিজরী ১৪৫ সন মুতাবিক ৭৬২ খিস্টাব্দে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মদীনার শাসক হলে ইমাম মালিক (র)-এ মর্মে ফতোয়া প্রদান করেন যে, খলিফা মানসুরের প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়, কেননা এ আনুগত্য জোরপূর্বক নেয়া হয়েছিল। এ ফতোয়ার ফলে অনেকে মুহাম্মদ (র)-এর দলে যোগদান করে। উক্ত

বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে গেলে তিনি মদীনার গভর্নর জাফর ইবনে সুলায়মান কর্তৃক বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন। এ আঘাতের কারণে তাঁর কাঁধের একটি অংশ স্থানচ্যুত হয়।

ফিকহের ইতিহাসে ইমাম মালেক (র)-এর স্থান

ফিকহের ইতিহাসে ইমাম মালিক (র)-এর স্থান অতি উর্ধ্বে। কেননা তিনি ফিকহের ক্রম বিকাশের এমন এক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেন যখন কিয়াস ব্যাপক এবং অত্যাবশ্যক ছিল না, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সময় সময় কিয়াসের আশ্রয় নেয়া হত এবং যখন বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের চিন্তাধারা আইন-বিজ্ঞানের রূপ লাভ করেনি। স্থানের বিবেচনায় তিনি মদীনায় প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনার ফসল হিসেবে মুয়াত্তা রচনা করেন। যা তাঁকে মর্যাদার শীর্ষে স্থান দিয়েছে।

রচনাবলি

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন।নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো,

১. تَفْسِيْرُ غَرِيْبِ الْقُرْآنِ

২. كِتَابُ الْـمُجَاسَاتِ عَنْ مَالِكٍ

৩. رِسَالَةُ مَالِكٍ إِلَى ابْنِ وَهَّابٍ

৪. رِسَالَةُ مَالِكٍ إِلَى اللَّيْثِ فِيْ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْـمَدِيْنَةِ

৫. اَلْـمُؤَطَّا

৬. كِتَابُ الْـمَسَايِلِ وَأَجْوَابُهَا

৭. اَلْـمَدَوَّنَةُ الْكُبْرَىٰ

৮. أَحْكَامُ الْقُرْآنِ

৯. كِتَابُ السِّيَرِ

১০. كِتَابُ الْـمَنَاسِكِ

১১. كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

১২. رِسَالَةُ مَالِكٍ إِلَى ابْنِ مَطْرَفٍ

ইন্তিকাল

তিনি ১৭৯ হিজরীর ১১/১৪ই রবিউল আউয়াল (৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন) বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ মতান্তরে ৮৬/৮৭/৯০ বছর। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

৩. শাফেঈ মাযহাব- ইমাম শাফেঈ (র)

শাফেঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠতা ইমাম সাহেবের নামের শেষে উদ্ধৃত 'আশ-শাফিয়ী' শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম করা হয় 'শাফিয়ী মাযহাব' ।নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

নাম

নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, মাতার নাম উম্মুল হাসান। নিসবতী নাম শাফিয়ী, পিতার নাম ইদরিস, তাঁর পূর্বপুরুষ শাফিয়ী-এর নামানুসারে তিনি শাফিয়ী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

বংশধারা

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস ইবনে আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাফিয়ী ইবনে সায়িব আল-কারশী আল-হাকেমী। তাঁর পিতা ছিলেন কুরাইশ বংশের আর মাতা ছিলেন আযদ বংশের।

জন্ম

তিনি ১৫০ হিজরী মুতাবিক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তানের আসকালান প্রদেশের গাযাহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কারো কারো মতে যেদিন ইমাম আবূ হানীফা (র) ইন্তিকাল করেন সে দিনই ইমাম শাফিয়ী (র) জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল

দু'বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। ফলে তাঁর মাতাই তাঁকে লালন-পালন করেন। বাল্যকালে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে পবিত্র মক্কা শরীফে গমন করেন। অতপর পবিত্র ভূমিতেই তাঁর বাল্যকাল অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত হয়। বাল্যকালে তিনি সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হতে প্রাচীন আরবী কবিতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন করেন।

শিক্ষাজীবন

সাত বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআ'ন মাজীদ হিফয করেন এবং দশ বছর বয়সে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক মুখস্ত করেন। অতপর মক্কা শরীফের বিশিষ্ট জ্ঞানী পণ্ডিত মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী (র) ও সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (র)-এর নিকট ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করেন। পনের বছর বয়সে তাঁর ওস্তাদ তাঁকে ফতোয়া দানের অনুমতি দেন, তবে তিনি ওস্তাদের সনদ নিয়ে ইমাম মালিক (র)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি তাঁকে মুয়াত্তা শোনান এবং তাঁর নিকট ফিকহশাস্ত্র শিক্ষা করেন। হিজরী ১৭৯ মুতাবিক ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইমাম মালিকের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর নিকট অবস্থান করেন।

উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, মিশর ইত্যাদি দেশ সফর করেন। ইরাকে গিয়ে তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকট ফিকহে হানাফী শিক্ষা করেন। এভাবে তিনি মালিকী ও হানাফী মাযহাবের নিয়ম-কানুন আয়ত্ত করে ত্রিমুখী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মক্কায় আগত মিশরী, স্পেনীয় ও আফ্রিকান আলিমের সাথেও ভাবের আদান- প্রদান করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

অধ্যাপনা

শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি অধ্যাপনার কাজে মনোবিবেশ করেন। অতপর তিনি প্রথমে ইরাক গমন করেন এবং সেখানকার আলিমগণ তাঁর নিকট হাদীস ও ফিকহশাস্ত্র শিক্ষা করেন।

তিনি হানাফী, মালিকী ও মুহাদ্দিসগণের মাযহাব মিলিয়ে মধ্যপন্থী এক মাযহাব তথা শাফিয়ী মাযহাব প্রবর্তন করেন। তিনি সে মতে গ্রন্থ রচনা করেন, লোকদেরকে শিক্ষা দেন এবং এ মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করেন। তাঁর এ মাযহাবকে কাদীম বা পুরাতন মাযহাব বলা হয়। মিশরে গমন করার পর তাঁর ইরাকী ফিকহের কিছু পরিবর্তন করে নতুন মিশরী ফিকহ প্রবর্তন করেন এবং এ মতানুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এ মাযহাবকে 'মাযহাবে জাদীদ' বা নতুন মাযহাব বলা হয়।

ইমাম শাফিয়ী (র) নিজেই তাঁর মাযহাব প্রচার করেন। তাঁর ছাত্রগণও লেখনীর মাধ্যমে দলে দলে প্রচারকার্যে যোগদান করেন। ফলে বিভিন্ন দেশে তাঁর মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে। মিশরে তাঁর মাযহাব সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে।

রচনাবলি

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো

১. اَلرِّسَالَةُ فِيْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَام

২. كِتَابُ الْأُمِّ

৩. إِخْتِلَافُ الْـحَدِيْثِ

গভর্নরের দায়িত্ব পালন

আব্বাসীয় সম্রাট হারূন-উর-রশীদের খিলাফতকালে তিনি নাজরান প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। হযরত আলী (রা.) এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে হিজরী ১৮৪ সনে সম্রাটের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ফযল ইবনে রবী-এর সুপারিশক্রমে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বপদে বহাল থাকেন। কিছুকাল চাকরি করার পর তিনি ফিকহশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইরাক চলে যান।

গুণাবলি

ইমাম শাফিয়ী (র) একজন শীর্ষস্থানীয় ফিকহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর মধ্যে বহুগুণের সমাহার ছিল। তিনিই উসূলে ফিকহশাস্ত্রের সংকলক। তিনি এ প্রসঙ্গে 'আর-রিসালা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

'মিফতাহুস সাআদা'-এর গ্রন্থকার বলেন, ইমাম শাফিয়ী (র) সমগ্র বিশ্বের ইমাম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে এরূপ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা একত্রিত করেন যা তাঁর পরে কোন ইমামের মধ্যে একত্রিত করেননি।' তিনি আরবী কাব্যেও সুদক্ষ ছিলেন। কিতাবে উম্মে যুহাইর, ইমরুল কাইস, জারীর প্রভৃতির কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ভাষাবিশারদ আল আসমায়ী তাঁর নিকট হতে বনু হুযাইলের কবিতা ও শানফারার দিওয়ান শ্রবণ করেছেন। যাফরানী (র) বলেন, হাদীস বিশারদগণ ঘুমিয়ে ছিলেন, ইমাম শাফিয়ী (র) তাদেরকে জাগিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, এরূপ কোন জ্ঞানী নেই, যার প্রতি ইমাম শাফিয়ীর অবদান নেই। কারাবেসী বলেন, আমরা কুরআ'ন , সুন্নাহ ও ইজমার জ্ঞান ইমাম শাফিয়ী (র) থেকেই লাভ করেছি, আমি তাঁর থেকে জ্ঞানী এবং তাঁর থেকে বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।' ইমাম শাফিয়ী (র) ছিলেন সর্ব বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার জন্যে ইরাকবাসী তাকে نَاصِرُ السُّنَّةِ বা 'হাদীসের সহায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মুহাম্মদ ইবনে হাকীম বলেন, ইমাম সাহেবের মাতা গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, তাঁর গর্ভ হতে 'মুশতারী' তারকা বের হয়ে উহা বিচূর্ণ হয়ে বিভিন্ন শহরে নগরে ছড়িয়ে পড়েছে। কোন একজন বুযুর্গকে স্বপ্নের কথা জানালে তিনি বললেন, তোমার গর্ভ হতে এমন এক বড় আলিম জন্মগ্রহণ করবে, যার ইলম সবখানে বিস্তার লাভ করবে। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, একদিন আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে কাছে ডেকে পরিচয় জানতে চাইলেন, আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, 'আমি আপনার বংশের সন্তান।' তখন তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি স্বীয় থুথু নিয়ে আমার ঠোঁটে, মুখে লাগিয়ে বললেন, যাও! আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন।

শিক্ষকবৃন্দ

তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ হলেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী (র), আবদুল আযীয ইবনে মাজেশুন (র), ইমাম মালিক (র) মুহাম্মদ ইবনে হাসান (র), মুসলিম ইবনে খালিদ যানজী (র), সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (র) প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ছাত্রগণ হলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র), ইবরাহীম ইবনে খালিদ (র), আবদুল হুসাইন ইবনে আলী আল-কারাবিসী (র), আবূ সুলায়মান দাউদ ইবনে আলী (র), আহমদ ইবনে ইয়াহহিয়া (র), আবূ উসমান ইবনে সাঈদ (র), আবূল আব্বাস আহমদ ইবনে ওমর (র), ইবনে জরীর তাবারী (র), ইবনে কাইস (র), ইউসূফ ইবনে ইয়াহয়া (র), আবূ ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহয়া (র), রবী ইবনে সুলায়মান (র), হুরমুল্লাহ ইবনে ইয়াহয়া (র) প্রমুখ।

শাফিয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলিমগণ হলেন, ১. ইমাম নাসায়ী (র), ২. ইমাম আশআরী (র), ৩. ইমাম মাওয়ারদী (র), ৪. ইমাম আস-সীরাযী (র), ৫. ইমামুল হারামাইন (র), ৬. ইমাম গাযযালী (র) ও ৭. ইমাম আন-নাওয়াবী (র)।

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ২০৪ সনের রজব মাসের শেষ দিন মুতাবিক ৯২০ খ্রিস্টাব্দে ২০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মিশরের ফুসতাতে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। জুমাবার আসরের পর তাঁকে মিশরের ফুসতাতে সমাহিত করা হয়।

৪. হাম্বলী মাযহাব–ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে স্বীকৃত চার মাযহাবের অন্যকতস হাম্বলী মাযহাব। হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)। তাঁর পিতার নামানুসারে মাযহাবের নাম করা হয় হাম্বলী মাযহাব। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

নাম

তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, উপাধি শাইখুল ইসলাম ও ইমামুস সুন্নাহ, বংশগত পরিচয় শাযবানী। পিতার নাম মুহাম্মদ, দাদার নাম হাম্বল।

বংশধারা

হযরত আহমদ ইবনে মুহাম্মমদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ ইবনে ইদরিস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস ইবনে আওফ ইবনে কাসিত ইবনে মাযিন ইবনে শায়বান। বংশগতভাবে তিনি আরবী।

জন্ম

তিনি হিজরী ১৬৪ সালের রবিউল আউয়াল মাস মুতাবেক ৭৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল

তাঁর ৩ বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা যান। তখন তাঁর মাতা ইয়াতিম বালক আহমদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। মাতার তত্ত্বাবধানে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তাঁর মাতাই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি স্বীয় মাতার তত্ত্বাবধানে প্রথমে কুরআ'ন মাজীদ হিফয করেন। সাত বছর বয়স থেকে তিনি হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে বাগদাদ নগরী ছিল পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরী। এ নগরী তখন বহু জ্ঞানী, গুণী, ফকীহ ও হাদীস শাস্ত্রবিদের পদচারণায় মুখরিত ছিল। ফলে দ্বীনী জ্ঞান লাভ করা তার জন্যে খুবই সহজ ছিল। স্থানীয় বড় বড় আলিমদের নিকট নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভের পর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ইয়ামেন, কূফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

তিনি অসংখ্য প্রথিতযশা আলিমের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন,

১. ইমাম ওয়াকী ইবনে যরারাহ

২. ইমাম আবূ ইউসূফ

৩. ইমাম বিশর ইবনে মুফাসসাল

৪. ইমাম মু'তামিম ইবনে সুলায়মান

৫. ইমাম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না

৬. শায়খ আব্বাদ ইবনে আব্বাদ (র)

৭. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আবূ যায়িদা

৮. ইমাম ইবরাহীম ইবনে সাদ আলসালী (র)

৯. ইমাম শাফিয়ী (র)

ছাত্রবৃন্দ

অগণিত জ্ঞানপিপাসু তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন

১. ইমাম বুখারী (র)

২. ইমাম মুসলিম (র)

৩. আবূ বকর আল-আসলাম (র)

৪. আল-কিরমানী (র)

৫. আবদুল মালেক আল-মায়মূনী (র)

৬. আবূ যুরআ আদ-দিমাশকী (র)

৭. বাকী ইবনে মুখাল্লাদ (র)

৮. শাহীন ইবনুস সামীদ (র) প্রমুখ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ফিকহ অত্যন্ত সহজ ও সরল। তাতে দিরায়াত, বিচার-বুদ্ধি ও তর্ক-বিতর্কের খুব কমই সাহায্য নেয়া হয়েছে। আহলে হাদীসরা সময় সময় নিজেদেরকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে দাবি করে থাকে।

স্মৃতিশক্তি

তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বহু ছাত্র তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তির ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। 'তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি মাত্র চার বছর বয়সে কুরআ'ন মাজীদ হিফয করেন। তাঁর প্রখ্যাত শিষ্য ইমাম আবূ যুরআ (র) বলেন, 'আমার শায়খগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে বড় হাফিযে হাদীস আর কেউ নেই'।

গুণাবলি

তিনি একাধারে ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ, খোদাভীরু পরহেযগার; মুত্তাকী এবং বড় আবিদ।সত্যের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। তিনি ছিলেন একজন দানশীল ও অতিশয় বুদ্ধিমান। এককথায় তিনি ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত এক মহৎপাণ ব্যক্তি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি দিনে ও রাতে একশত পঞ্চাশ থেকে তিনশ রাকাত পর্যন্ত নফল নামায পড়তেন। তিনি ইশার নামাযের পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বাকি রাত নামায ও কুরআ'ন তিলাওয়াত করে কাটিয়ে দিতেন। তিনি খলিফা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাহচর্য লাভ করতে পছন্দ করতেন না। তিনি দরিদ্রদেরকে অকাতরে দান করতেন এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। পার্থিব লোভ-লালসার প্রতি তাঁর মোটেও আগ্রহ ছিল না।

নির্যাতনের শিকার

দ্বীনের হিফাযতের জন্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) খলীফা মামূনের উত্তরসূরী কর্তৃক অনেক যাতনা সহ্য করেছেন। (কুরআ'ন নশ্বর কি অবিনশ্বর) এ বিষয়ে মত পার্থক্যের কারণে তিনি চাবুকের আঘাত খেয়েছেন এবং জেল খেটেছেন।

পরবর্তীতে খলীফা মুতাওয়াককিল তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। খলিফা তাঁকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান ও সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর পরিবারকে একটি বৃত্তিও প্রদান করেন।

রচনাবলি

তিনি জীবনে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রসিদ্ধ কতিপয় গ্রন্থ হলো

১. مُسْنَدُ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَل

২. كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

৩. كِتَابُ النَّاسِخِ وَالْـمَنْسُوْخ

৪. اَلْعِلَلُ وَمَعْرِفَةُ الرِّجَالِ

৫. كَتَابُ الْإِيْمَانِ

৬. اَلزُّهْدُ

৭. كَتَابُ طَاعَةِ اللهِ

৮. كِتَابُ الْفَرَائِضِ

৯. كِتَابُ الْـمَسَائِلِ

১০. كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْـجَهْمِيَّةِ

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ছিলেন একজন সুদক্ষ হাদীস বিশারদ। হাদীসের দোষ-গুণ বিচার শক্তি, বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি ছিল তাঁর নখদর্পণে।

তাঁর হাদীস সংকলনের প্রচেষ্টা ছিল শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ প্রস্তুতকল্পে তিনি অকল্পনীয় পরিশ্রম করেন। এ মর্মে তিনি প্রথমে বিভিন্ন সূত্রে সাড়ে সাত লক্ষাধিক হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করেন। অতঃপর দীর্ঘ সময় ব্যয় করে যথেষ্ট যাচাই-বাছাই করে একটি হাদীস গ্রন্থ রচনা করেন। যা 'মুসনাদে আহমদ' নামে সুপরিচিত। এ গ্রন্থের হাদীস নির্বাচনে তিনি প্রথমত বর্ণনাকারী গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি দেন। এক্ষেত্রে যেসব বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, ধর্মভীরুতা তথা নির্ভরযোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত নয়, তিনি তাদের সমূদয় বর্ণনা বর্জন করেছেন। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল সহীহ হাদীস চয়নের প্রতি। সহীহ হাদীসের সাথে যাতে কোনক্রমেই যয়ীফ, মওযূ ইত্যাদি হাদীস সংমিশ্রিত না হয় এ ব্যাপারে তিনি সজাগ ছিলেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ধারণে তিনি কোন শাইখ বা প্রখ্যাত আলিম দ্বারা প্রভাবিত হননি।

তাঁর গ্রন্থটি ১৭২ খণ্ডে বিভক্ত, এর সর্বমোট হাদীস ৩০ হাজার, অন্য বর্ণনা মতে, এর হাদীস সংখ্যা ৪০ হাজারেরও অধিক। শাহ আব্দুল আযীয বলেন, এ গ্রন্থে ইমাম আহমদ কর্তৃক সন্নিবেশিত হাদীস সংখ্যা ৩০ হাজার। বাকি ১০ হাজারেরও অধিক হাদীস তাঁরই সুযোগ্য পুত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ কর্তৃক সংযোজিত। এতে মুসনাদের প্রচলিত রচনা-রীতি অনুসরণ পূর্বক সাহাবীদের নামভিত্তিক হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তার সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি

তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণ বিভিন্ন প্রশংসা মূলক উক্তি করেছেন। যেমন–

১. ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, 'আমি একদিন বাগদাদ থেকে বের হয়েছি। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে মুত্তাকী, পরহেযগার, বড় ফিকহবিদ এবং বড় আলিম প্রত্যক্ষ করিনি।'

২. হযরত ইয়াহহিয়া ইবনে মাঈন (র) বলেন, 'ইমাম আহমদ এরমন গুণের অধিকারী ছিলেন, যেসব গুণ আমি কখনো কারো মধ্যে দেখিনি; তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, হাফিযে হাদীস, শীর্ষস্থানীয় আলিম, পরহেযগার দুনিয়া বিমুখ এবং বিবেকবান।'

৩. হযরত ইসহাক ইবনে রাহবিয়া (র) বলেন 'তিনি আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে হুজ্জত (দলিল) ছিলেন।'

৪. হযরত আলী ইবনে মাদীনী (র) বলেন, 'ইমাম আহমদ (র) ইসলামের যে মর্যাদায় অবস্থান করেছেন, সে মর্যাদায় কেউ অবস্থান করতে পারেনি।'

ইন্তিকাল

তিনি ২৪১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জুলাই ৭৭ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযায় এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে, লোকের সমাগম দেখে তিন হাজার ইহুদী ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাঁর দাফনের ২৩০ বছর পর তাঁর কবরের পার্শ্বে আরেকটি কবর খনন করতে গিয়ে তাঁর লাশ অক্ষত অবস্থায় দেখা যায়।

এই চার মাযহাব বা আন্যান্য ফিকহী মাযহাবের উৎপত্তি ও বিকাশের পশ্চাতে রয়েছে কুরআ'ন ও হাদীসের হুকুম-আহকাম নিয়ে নিরন্তর গবেষণা ও ইজতিহাদ। ফিকহ এর ইমাম ও মুজতাহিদগণ যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর জন্য সঠিক ও সহজ সিরাতুল মুস্তাকীম-এর পথ রচনার জন্য দিবা নিশি সাধনা করেছেন। ইজতিহাদই ছিল তাদের পথ চলার দিকদর্শন। আমরা এখন ইজতিহাদের গুরু নিয়ে আলোচনা করব এবং ইজতিহাদ সম্পর্কে লা-মাযহাবীগণ যেসব আপত্তি তোলেন তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করব, যাতে মুসলিম উম্মাহ একটি সমাজ শৃঙখলার আওতায় ঐক্যের ভিত্তিতে ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বাতাবরনে বিশ্বের বুকে উন্নত শিরে অতীতের গৌরব ফিরে পাওয়ার পথ খুঁজে পেতে পারে।

ফিকহী পরিভাষার ওপর রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

বলা যায়, ইসলাম ধর্মের 'সরকারী ভাষা' হলো, আরবী ভাষা। সেই আরবী ভাষায় ফিকহী পরিভাষার ওপর অনেকগুলো ছোট-বড় কিতাব রচিত হয়েছে। আলাদা মান ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ গ্রন্থগুলো কয়েক শতাব্দী যাবত সর্বমহলে সমাদৃত হয়ে আসছে। যেমন, সাইয়্যেদ শরীক জুরজানী রহ. (মৃত ৮১৬ হিজরী)-এর লেখা **كتاب التعريفات** শায়খ মুহাম্মদ আ'লা থানভী রহ.-এর **كشاف اصطلاحات الفنون** এর একটি খণ্ড, কাযী আবদুন নবী আহমদনগরীর লেখা **دستور العلماء** এবং আল্লামা আবূ হাফস নাসাফীর লেখা **الطلبة فى اصطلاحات الفقهية**

الحنفيـة। তবে এবিষয়ে শায়খ নাসিরুদ্দীন আবদুস সাইয়্যেদ আবুল মাকারিম আবুল ফাতাহ আল হানাফী (মৃত ৬১৬ হিজরী)-এর লেখা المغـرب গ্রন্থটি যেই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা, প্রসিদ্ধি ও জ্ঞানগুরুত্ব লাভ করেছে, তা অন্য কোনো রচনা পায়নি। সংক্ষিপ্ত কলেবরের এ গ্রন্থটিকে এ শাস্ত্রের অভিধান বলা যেতে পারে। যারা বিশদ বিবরণের সন্ধ্যানী, তারা হয়তো এথেকে পূর্ণ তৃপ্তি পাবে না, তবে তাদের অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এর মাধ্যমে পূরণ হবে।

বর্তমান যুগটিকে যদি বিশ্বকোষের যুগ বলা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তা অত্যুক্তি হবে না। এ যুগে প্রতিটি শাস্ত্রের ন্যায় ফিকহশাস্ত্রের ওপরও ইনসাইক্লোপিডিয়া বা আরবীতে دائرة المعارف এবং বাংলায় বিশ্বকোষ জাতীয় কাজ হয়েছে। মিসরের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেমের তত্ত্বাবধানে موسوعة جمال عبد الناصر নামে একটি তথ্যকোষ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে ব্যাপক তথ্যবহুল, সর্বাধিক উপকারী ও সর্বব্যাপী তত্ত্বসমৃদ্ধ তথ্যকোষটি কয়েক বছর পূর্বে মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন আল্লামা মুসতফা আহমদ আয যরকা'-এর তত্ত্বাবধানে কুয়েতে সংকলিত হয়েছে। যার প্রাথমিক কয়েকটি খণ্ড ইতোমধ্যে মুদ্রিত হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডগুলোও যদি আগের গুলোর মাণে সংকলিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সুবিন্যস্ত ও স্বকীয় বৈশিষ্টের অধিকারী এবং এ বিষয়ের অন্যান্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তকারী তথ্যকোষ বলে বিবেচিত হবে।

কতিপয় প্রাজ্ঞ ফিকহবিদ ও তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর

আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের সাধনার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী যুগে অসংখ্য ফকীহ জন্ম নিয়েছেন এবং তারা তাদের সময়ে এই কিশতীর হাল ধরেছেন। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকজন প্রাজ্ঞ ফিকহবিদ ও জ্ঞানচর্চায় তাদের অবদানমূলক রচনার নমোল্লেখ করছি–

خزانة الفقه : রচয়িতা ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দী (মৃত ৩৮৩ হিজরী)।

عيـون المسـائل নয় খণ্ডে উয়ুনুল মাসাইল রচয়িতা আবুল কাসেম আবদুল্লাহ বিন আহমদ আল বলখী (মৃত ৩১৯ হিজরী)।

الواقعات للناطفى রচায়িত আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন উমর আন নাতেফী। যিনি ইমাম জাসসাস রাযী রহ.(মৃত ১৪৬ হিজরী)-এর শিষ্য।

المبسوط প্রণেতা শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (মৃত ৪৮৩ হিজরী)।

فتاوى خانية প্রণেতা ইমাম ফখরুদ্দীন হাসান বিন মানসূর আল আউযজুন্দী (মৃত ৫৫২ হিজরী)।

بـدائع الصـنائع ৭ খণ্ডে বাদায়েউস সানায়ে রচয়িতা মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন আল কাসানী (মৃত ৫৮৭ হিজরী)।

كفاية ৮০ খণ্ডে আল কিফায়া প্রণেতা আলী বিন আবূ বকর বুরহানুদ্দীন আল মারগীনানী (মৃত ৫৯৩ হিজরী)।

الهداية হল তার সংক্ষেপিত রূপ।

المحيط البرهانى ৪০ খণ্ডে প্রণিত। এর রচায়িতা আল্লামা বুরহানুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃত ৬১৬ হিজরী)।

الفتاوى الحنفية রচয়িতা সা'দুদ্দীন মাসঊদ (মৃত ৭৯৩ হিজরী)।

الفتـاوى التاتارخانيـة : আলিম বিন আল আনসারী (মৃত ৭৮৬ হিজরী)। কিতাবটি এতো দিন অপ্রকাশিত ছিলো। সম্প্রতি কাযী সাজ্জাদ হুসাইন কারাতপূরীর টিকা সংযোজন ও তাহক্বীক সহকারে দায়েরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ থেকে এর ৫টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এটি আনুমানিক ১০ খণ্ডে পূর্ণতা পাবে। প্রতিটি খণ্ড কম-বেশ সাত শো থেকে আট শো পৃষ্ঠার কলেবর সমৃদ্ধ। এর ৫ম খণ্ডটি ৯ শো পৃষ্ঠারও অধিক।

فتح القدير ৫ খণ্ডে ফাতহুল কাদীর প্রণিত কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (মৃত ৮৬১ হিজরী)।

البحر الرائق ৭ খণ্ডে বাহরুর রায়েক প্রণেতা যায়নুদ্দীন ইবনুন নুজাইম মিসরী (মৃত ৯৭০ হিজরী)।

الدر المختار রচয়িতা আলাউদ্দীন হাসকাফী (মৃত ১০৮৮ হিজরী)।

الفتـاوى الهنديـة যা ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি নামে পরিচিত। বিশাল এই ফতোয়া এ সংকলনটি বাদশাহ আলমগীর আওরঙ্গজেব (মৃত ১১১৮ হিজরী)-এর নির্দেশে সেই যুগের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম সংকলন করেন। এটিকে 'তৎকালীন ভারতের সংবিধান' বলা যেতে পারে। এর প্রায় এক শো বছর পর তুরস্কের উসমানী খেলাফত –যা শত শত বছর দুনিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ সম্রাজ্য (ঊসঢ়রৎব) ছিলো, যার অধীনে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেকগুলো দেশ শাসিত ছিলো– তাদের প্রথাগত আইনের সংকলন হিসেবে **مجلـة الأحكام العدلية** প্রস্তুত করে।

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (মৃত ১২৫২ হিজরী) **رد المحتار شرح الدر المختار** রচনা করেন। কিছু দিনের মধ্যেই এটি ফিকহ এর বুনিয়াদী গ্রন্থ ও ফতোয়ার উৎসগ্রন্থ হিসেবে ব্যাপক সমাদর লাভ করে।

ফিকহশাস্ত্রের উল্লেখিত গ্রন্থগুলো হানাফী উলামায়ে কেরামের রচিত। হানাফী ফিকহ ছাড়াও মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও যাহেরী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামও অনুরূপ অবদান রেখেছেন তন্মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির রচনা নিম্নরূপ:

المحلى রচায়িতা ইবনে হযম যাহেরী (মৃত ৪৫৬ হিজরী)

المقدمات রচয়িতা ইবনে রুশদ মালেকী আওয়াল (মৃত ৫২০ হিজরী)।

بداية المجتهد রচয়িতা ইবনে রুশদ সানী [যিনি সম্পর্কে প্রথমজনের নাতী হন] (মৃত ৫৯৫ হিজরী)।

المغـنى : ফিক্বহে হাম্বলীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি রচনা করেছেন ইবনে কুদামাহ মাক্বদিসী (মৃত ৬২০

হিজরী)।

المهـذب রচয়িতা আবূ ইসহাক সিরাজী শাফেঈ (মৃত ৪৪৪ হিজরী)। তার শরাহ লিখেছেন ইমাম নববী (মৃত ৬৭৬ হিজরী)

شرح منهاج প্রণেতা জালালুদ্দীন আল মহল্লী শাফেঈ (মৃত ৮৬৪ হিজরী)।

ফিকহশাস্ত্রে ভারতবর্ষের উলামায়ে কেরামের অবদান

উপরে যেসব কিতাব ও ফুকাহায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছিলেন অনেক পূর্বেকার। যাদের সিংহভাগই হিন্দুস্তানের বাইরের। এখন আমাদের কাছাকাছি যুগের ভারতীয় উপমহাদেশের উলামায়ে কেরামের অবদানের ওপর আলোকপাত করা সঙ্গত মনে করছি। সম্ভবত এ কথা বলা ভুল হবে না যে, ভারতীয় উপমহাদেশীয় উলামায়ে কেরামের অবদান আরব ও আজমের কোনো ভূখণ্ডের উলামায়ে কেরামের চেয়ে কম নয়। বরং কিছু কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক উজ্জ্বল। নিম্নে তাদের কয়েকজনের নাম পেশ করা হচ্ছে।

১. মাওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গীমহল্লী (মৃত ১৩০৪ হিজরী)। যিনি খুব স্বল্প হায়াত পেয়েছিলেন। মাত্র ৩৯ বছর। কিন্তু এই স্বল্প জীবনে তিনি বিভিন্ন ইলমী, দ্বীনি, ঐতিহাসিক বিষয়, বিশেষত হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রদ্বয়ের ওপর এতো প্রচুর ও মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন যে, তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মুসলিম জাহানে খুঁজে বের করা মুশকিল। তন্মধ্যে سعاية এবং حاشـية هدايـة দুটি অনবদ্য কীর্তি। এছাড়াও তাঁর হাজারো ফতোয়া সমৃদ্ধ 'ফতোয়া সংকলন' তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে হাজারের অধিক ফিকহী প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ের অনেকগুলো জীবন্ত জটিলতার জ্ঞানদীপ্ত সমাধান দিয়েছেন। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা।

২. মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান উসমানী (মৃত ১৩৪৭ হিজরী)। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী সময় দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর কলম থেকে হাজারেরও অধিক ফতোয়া লিখিত হয়েছে। যার উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমান সময়ের সৃষ্ট অসংখ্য মাসআলার জবাবে লেখা। তাঁর দেয়া ফতোয়াগুলো দারুল উলূম দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে এখন পর্যন্ত ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (মৃত ১৩৬২ হিজরী)। তাঁর ইলমী ও ফিকহী অবদানের ব্যাপকতা বিশাল। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তাঁর ছোট-বড় রচনা প্রায় এক হাজার। তাফসীর, তাসাওউফ, ফিকহ, হাদীসের ব্যাখ্যা ও ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ প্রামাণিকতা ইত্যকার তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়য়ের ওপর প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছে। এখানে আমরা শুধু 'ফিকহী অবদান'-এর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরবো। থানভী রহ.-অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রচনা হলো, 'বেহেশতী যেওর'। তাঁর ফতোয়াগুলো 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' নামে ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ইবাদত, সামাজিকতা, কৃষ্টি, সভ্যতা, লেনদেন প্রভৃতি বিষয়ক সহস্র প্রশ্নের মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ উত্তর উঠে এসেছে। বিশেষত, বর্তমান সময়ের অসংখ্য জটিল ও জনবিপত্তিকর মাসআলাগুলোর সঠিক সমাধান জানিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তার ওপর এমন

উসূলী হিদায়াত তথা নীতিগত নির্দেশনাও প্রদান করেছেন যে, যারা আগামীতে এ বিষয়ের ওপর কাজ করতে ইচ্ছুক, তারা প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও পেয়ে যাবেন।

থানভী রহ.-এর যুগ চাহিদার সচেতনতা, কালের ভাষা বুঝার পারঙ্গমতা, দায়িত্ববোধের অনুভূতি ও চিন্তাশীল মনোবৃত্তির উজ্জ্বল প্রমাণ তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'আল-হীলাতুন নাজিযাহ'। যেখানে তিনি গোটা দুনিয়ার নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের অভিমত একত্র করে বর্তমান সময়ের নিপীড়িত বিবাহিত মহিলাদের অসংখ্য সমস্যার সহজ সমাধান পেশ করেছেন।

৪. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (মৃত ১৩৭২ হিজরী)। মুফতী সাহেবে দৃষ্টির গভীরতা ও প্রশস্ততা, ফতোয়ার প্রতিটি শব্দ লেখার সময় সতর্ক পদচারণা ও ফকীহসুলভ রচনাশৈলী, সময়ের গতি-প্রবাহ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি, মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা নিরসনের সদা ভাবনামুখর মন ও মনন, জনকল্যাণমূখী মানসিকতা; ইত্যকার বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দান করেছে। যার ফলে ছোট-বড় সর্বশ্রেণির গুণীজন তাঁকে বরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছেন।

৫. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী উসমানী (মৃত ১৩৯৬ হিজরী)। মুফতী সাহেব ছিলেন হযরত থানবী রহ.-এর হাতেগড়া শিষ্য। তাঁর লেখা ফতোয়া সংকলন 'ইমদাদুল মুফতিয়্যীন' এবং ৫ খণ্ডে প্রকাশিত 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' তাঁর সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তা-ভাবনার স্বচ্ছতা, সময়ের প্রবাহ সম্পর্কে সচেতনতা, মুসলমানদের সমস্যাবলি সম্পর্কে পরিস্কার অবগতি এবং সেগুলোর সমাধান বের করার আকুলতার প্রমাণ। বিশেষত আধুনিক বিশ্বের অসংখ্য জটিল মাসাইল ও জটিল সমস্যার সমাধান বের করা, প্রতিটি সমস্যার ওপর ব্যাপক অধ্যয়ন করা ও সেগুলোর তাহক্বীক্বি, ফিকহী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধান উদ্ভাবন করা এবং তা প্রাঞ্জল ও সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার পারঙ্গমতা তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তাঁর সেই বৈশিষ্ট্যাবলি তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী দা.বা.-এর মাঝেও বিমূর্ত হয়েছে।

৬. আমাদের সমকালে আরো যেসকল উলামায়ে কেরাম –যারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা, যাঁদেরকে তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যে বিত্তবান বানিয়েছেন, সহীহ হাদীসে যাঁদেরকে **من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين** এর গভীর ও ব্যাপক শব্দে চিত্রিত করা হয়েছে– তাঁদের মাঝে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী সবিশেষ মর্যাদায় ভাস্বর। তাঁর অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ও অনন্য গুণাবলী সন্দোহাতীতভাবে তাঁকে 'ফক্বীহুন নফস'-এর অত্যুচ্চ আসনে সমাসীন করেছে। ফিকহশাস্ত্রে তাঁর সেই মর্যাদাশ্রিত যোগ্যতাকে প্রাচীন ক্বিতাবসমূহের পরিভাষা ব্যক্ত করতে হলে 'ফিক্বহুন নফস'-এর অভিধায় ভূষিত করতে হবে। এ সম্পর্কীয় বিশদ বিবরণ হযরত মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী রহ.-এর লেখা 'তাযকিরাতুল খলীল' ও প্রিয় সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সানী মরহুমের লেখা 'হায়াতে খলীল' গ্রন্থদ্বয়ে আলোচিত হয়েছে। একজন ফিকহবিদের মাঝে কোন কোন যোগ্যতার সমাবেশ থাকতে হয়, তাকে কোন কোন নীতির আলোকে পথ চলতে হয়, তার মাঝে কোন কোন শিষ্টাচারের স্বচ্ছ চিত্রায়ণ ঘটতে হয় –আমাদের জ্ঞান ও অবগতি অনুযায়ী– হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী রহ.-এর মাঝে তা পরিস্কার বিমূর্ত হয়েছে।

মাযহাবের গুরুত্ব

আমরা এখন এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই যে, কুরআ'ন মজীদের মর্ম উদ্ঘাটনে ফিকহ এর চর্চা বা ইজতিহাদ ও তাকলীদের অনিবার্য গুরুত্ব রয়েছে। যারা তাকলীদ মানাকে কুরআ'ন হাদীস বাদ দিয়ে কোনো ইমামকে মান্য করা বলে অপবাদ দেয় তাদের কাছে স্পষ্ট করতে চাই যে, ইসলামী জীবনের মূল কথা হচ্ছে দ্বীন ও শরী'আর ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে যেতে হবে সমর্পিত চিত্তে, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে এই আনুগত্যের হকদার মনে করার অপর নাম শিরক। অন্যকথায় হালাল-হারামসহ শরী'আর যাবতীয় আহকাম ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কুরআ'ন ও সুন্নাহই হল মাপকাঠি। আর এ দুইয়ের অভিন্ন আনুগত্যই হল ঈমান ও তাওহীদের দাবি। তবে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, কুরআ'ন ও সুন্নায় বর্ণিত আহকাম দুধরনের। কিছু আহকাম যাবতীয় অস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততাও দৃশ্যমান বিরোধ হতে মুক্ত এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও মর্ম এতই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট যে, বিশেষজ্ঞ বা সর্বসাধারণ মানুষ সর্বস্তরের সবার পক্ষেই নির্দ্বিধায় তা অনুধাবন করা সম্ভব।

কুরআ'ন এর মর্ম উদঘাটনে মাযহাবের গুরুত্ব

এখানে আমরা কুরআ'ন এর বিভিন্ন আয়াতের মর্ম উদ্ঘাটনে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তার দু'টি উদাহরণ পেশ করছি। যেমন

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

"তোমরা কেউ অপর কারো গীবত বা পরচর্চায় লিপ্ত হইও না।'[২৫৩]

এই হুকুমের মর্ম অনুধাবনে কোনো অস্পষ্টতা ও জটিলতা নেই।

কিন্তু কিছু হুকুম-আছে যার মর্ম সকলের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সেগুলোর মর্ম অনুধাবনে সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থবোধক উপস্থাপনা কিংবা আয়াত ও হাদীসের দৃশ্যত বৈপরিত্যের কারণে এমন জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, যা কেবল বিশেষজ্ঞ আলেমদের পক্ষেই সম্ভব। যেমন কুরআ'নুল করিমের নিম্নোক্ত আয়াত–

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"তালাকপাপ্তরা তিন কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।'[২৫৪]

তালাকপাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতের সময়সীমা নির্দেশ প্রসঙ্গে এখানে قروء শব্দটির ব্যবহার এসেছে। কিন্তু মুশকিল হল قروء বলতে আরবি ভাষায় ঋতু অবস্থা বা ঋতুহীন পবিত্র অবস্থা উভয়ই বুঝায়। যদি মনে করা হয় যে قروء অর্থ হায়েয বা ঋতুকালীন অবস্থা তাহলে তালাকপাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতের সময়সীমা হবে তিন হায়েয। কিন্তু যদি এর অর্থ

---

২৫৩ আল-কুরআ'ন - ৪৯ : ১২

২৫৪ আল-কুরআ'ন - ২ : ২২৮

ধরা হয় তহুর বা ঋতুহীন পবিত্র অবস্থা, তাহলে ইদ্দতের সময়সীমা দাঁড়াবে তিন তহুর। قروء কুরু শব্দের দ্ব্যর্থতাই এই জটিলতার কারণ। প্রশ্ন হল, এমতাবস্থায় কুরআনের আয়াত পড়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান নেই এমন লোকেরা কোন অর্থটি গ্রহণ করবে? উল্লেখ্য যে, হায়েয অর্থ মহিলাদের ঋতুস্রাব। আর তহুর অর্থ দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়কাল।

কুরআ'ন মাজীদ হতে এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ হল,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী–তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না, মু'মিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।' (সূরা নূর আয়াত-৩)

এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হলে বিয়ের আগে প্রত্যেক নারী বা পুরুষকে পরীক্ষা করতে হবে ব্যভিচারি কিনা। অথচ তাতে নানা সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। কাজেই এর মর্মার্থ নিয়ে অবশ্যই গবেষণার প্রয়োজন আছে, যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই নিষেধাজ্ঞা কি অকাট্য হারাম অর্থে, নাকি অনুচিত্য অর্থে। কিংবা এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা। বস্তুত এখান থেকেও ইজতিহাদ এবং ইজতিহাদ লব্ধ ফিকহচর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।

হাদীস এর মর্ম উদ্ঘাটনে মাযহাবের গুরুত্ব

হাদীস শরীফের মর্ম উদ্ঘাটনেও আমরা ইজতিহাদ এবং বিশেষজ্ঞ ইমামগণের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত এর মুখাপেক্ষী। যেমন নিম্নের হাদীসখানি।

مَنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ

'যে ব্যক্তি বর্গা ব্যবস্থা পরিহার করে না তাকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ঝুঁকি নিতে হবে।'

আলোচ্য হাদীসে কঠোর ভাষায় বর্গা প্রথা নিষিদ্ধ করা হলেও উপস্থাপনার কারণে এটা অস্পষ্ট যে, বর্গা প্রথার সব ক'টি পদ্ধতিই নিষিদ্ধ না বিশেষ কোনো পদ্ধতি উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত– এ প্রশ্নের সমাধান পেতে রীতিমত গবেষণার প্রয়োজন। আরেকটি উদাহরণ হল, নবী করিম (সা)-এর ইরশাদ-

যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে ইমামের কিরাত তার কিরাতরূপে গণ্য হবে।'

এই হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে যে, ইমামের পেছনে মুকতাদির কিছুতেই কিরাত পড়া যাবে না। অথচ অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

"যে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায শুদ্ধ হয়নি।' (বুখারী)

এই হাদীসের আলোকে ইমাম মুক্তাদি উভয়ের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করা বাধ্যতামূলক। হাদীসদ্বয়ের দৃশ্যমান বিরোধ নিরসনকল্পে প্রথম হাদীসকে মূল ধরে দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এই হাদীসে ইমাম ও মুনফারিদের কথা বলা হয়েছে। যে একাকী নামায পড়ে তাকে মুনফারিদ বলা হয়। এখানে মুক্তাদি বা ইমামের

পেছনে যে নামায পড়ে তার কথা বলা হয়নি। সুতরাং ইমাম ও মুনফারিদের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া বাধ্যতামূলক হলেও মুক্তাদির জন্য তা নিষিদ্ধ। কেননা, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী ইমামের কিরাত মুক্তাদির কিরাত বলে গণ্য হবে।

আবার দ্বিতীয় হাদীসকে মূল ধরে প্রথমটির ব্যাখ্যা এরূপ হতে পারে যে, এখানে ০০ এর অর্থ হল, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা যোগ করা। অর্থাৎ ইমাম, মুনফারিদ ও মুক্তাদি সবার জন্য সূরা ফাতিহা বাধ্যতামূলক হলেও অন্য সূরা যোগ করার ক্ষেত্রে মুক্তাদির জন্য ইমামের কিরাতই যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন হল, এ ব্যাখ্যাদ্বয়ের কোনটি আমরা গ্রহণ করব এবং কোন যুক্তিতে একটি ব্যাখ্যা পাশ কেটে আরেকটিকে প্রাধান্য দেব?

কুরআ'ন হাদীস থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সমাধানকল্পে আমরা দুটি পন্থা অনুসরণ করতে পারি। অর্থাৎ নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা প্রথম যুগের পূর্বসূরী প্রাজ্ঞ আলেমগণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে তাদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অনুসরণ।

এ ব্যাপারে যুক্তি ও ন্যায়নিষ্ঠার বিচারে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলব যে, প্রথম পন্থাটি অর্থাৎ আমরা নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পন্থাটি বাস্তবসম্মত ও নিরাপদ। কেননা, ইলম-হিকমত, মেধা, স্মৃতিশক্তি, ন্যায়পরায়নতা, ধর্মপরায়ণতা ও নৈতিক শক্তির বিচারে আমাদের দৈন্যদশা ও নিঃস্বতা এতই প্রকট যে, কোনো অবস্থাতেই আমরা নিজেদেরকে প্রথম উত্তম তিন যুগ যা খাযরুল কুরুন নামে প্রসিদ্ধ, তখনকার প্রাজ্ঞ আলেম ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার সাথে নিজেদের তুলনা করতে যাওয়া চরম নির্লজ্জতা হবে। এ ছাড়া খায়রুল কুরুন এর মহান আলেমগণ ছিলেন কুরআ'ন মাজীদ নাযিল হওয়ার সময় ও পরিবেশের নিকটতম প্রতিবেশি। এই নৈকট্যের সুবাদে কুরআনের মর্ম অনুধাবন ও উদ্দেশ্যনির্ধারণ তাদের জন্য সহজ ও স্বচ্ছন্দপূর্ণ। পক্ষান্তরে নবুয়াতের সময়ের পর এত দীর্ঘ ব্যবধানে আমরা দুনিয়াতে এসেছি যে, কুরআ'ন নাযিল ও সুন্নাহ চর্চার পটভূমি, পরিবেশ এবং সে যুগের সামাজিক রীতিনীতি, আচার আচরণ ও বাকধারা সম্পর্কেনিখুঁত, নির্ভুল ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুলের মধ্যে পতিত হওয়ার আশংকাই বেশি।

এসব কারণে জটিল ও সূক্ষ্ম আহকামের ক্ষেত্রেনিজেদের ইলম ও প্রজ্ঞার উপর ভরসা না করে খায়রুল কুরুন এর বুযুর্গ পূর্বসূরী আলেমগণের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করাই হল নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত। আর এটাই মযহাব অনুসরণ বা তাকলীদের সারকথা।

৫ম অধ্যায়

মাযহাব অস্বীকারকারীদের অভিযোগ ও তার জবাব

মযহাব অস্বীকারকারীরা যে অভিযোগটি সবচে গুরুত্ব দিয়ে উত্থাপন করে তাহলো-মাযহাব অনুসারীরা ইমামের তাকলীদ করে। তার মানে পূর্বপুরুষের অনুকরণ করে। তারা যা বলে গেছেন তাকে পরম সত্য বলে মনে করে। তাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত নতুন ইজতিহাদকে অনৈধ মনে করে। অথচ কুরআ'ন মাজীদ একে শিরকসূচক আচরণ বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

'যখন তাদের বলা হয়, তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত বিধান মেনে চলো, তখন তারা বলে কি! আমরা তো সে পথে চলবো, যে পথে আমাদের পূর্ব পুরুষদের চলতে দেখেছি। আচ্ছা, তাদের পূর্বপুরুষরা যদি গোমরাহ হয়ে থাকে তবুও?'[২৫৫]

কুরআ'ন মাজীদ সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান রাখেন এমন প্রত্যেকেই জানেন যে, এই আয়াত নাযিল হযেছে মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় সম্পর্কে। এদেরকে তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হলে তারা বলে যে, আমাদের পূর্বপুরুষ যে ধর্ম পালন করে এসেছে আমরা তার বাইরে যাব না।

প্রথম কথা হল, এখানে দ্বীনের বুনিয়াদী বিশ্বাস তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের যখন সত্যের পথে এসব বিষয় পেশ করা হয়, জবাবে তারা কেবল বলে যে, আমরা আমাদের পিতা মাতা পূর্বপুরুষ যে বিশ্বাস পোষণ করত তাই আঁকড়ে থাকব। তাদের এই তাকলীদ ছিল অন্ধ অনুকরণ এবং তা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। আমরা যারা মাযহাবের অনুকরণ বা তাকলীদের কথা বলি আমাদের দৃষ্টিতেও তো আকায়েদ বা মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপারে তাকলীদ জায়েয নেই। উসূলে ফিকহ এর সব কিতাবের মধ্যে এ কথা লেখা আছে যে, আকায়েদ ও দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে তাকলীদের কোনো অবকাশ নেই। কারণ এসব ব্যাপারে ইজতিহাদের যেমন সুযোগ নেই, তেমনি কারো তাকলীদ করারও প্রশ্ন আসে না। কেননা, আকীদা ও বিশ্বাস তাকলীদ বা ইজতিহাদের ক্ষেত্র নয়। ইজতিহাদ ও তাকলীদের ক্ষেত্র হচ্ছে আহকামে জন্নিয়া বা অস্পষ্ট দলিল ভিত্তিক আহকাম। এখানে আল্লামা আমীর বাদশাহ বুখারীর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

(فما يحل الاستفتاء فيه) الاحكام (الظنية لاالعقلية) المتعلقة بالاعتقاد فان المطلوب فيها العلم (على)

المذهب (الصحيح) فلا يجوز التقليد فيها' بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح... (كوجوده تعالى)

২৫৫ আল-কুরআ'ন - ২ : ১৭০

‘যেসব বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া ও দেওয়া জায়েয তাহল আহকামে জন্নী। আকলী হুকুম-আহকাম নয়, যার সম্পর্ক মানুষের আকলের সাথে। কারণ হল, বিশ্বাসগত হুকুম-আহকামে অকাট্য জ্ঞান প্রয়োজন। এ কারণে সহীহ মাযহাবের বক্তব্য হল বুনিয়াদী আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাকলীদ জায়েয নেই। বরং সঠিক যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে আকিদা বিশ্বাস গ্রহণ করাই জরুরী। যেমন আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্বের বিষয়।’[২৫৬]

মোটকথা আলোচ্য আয়াতে তাকলীদের বিরুদ্ধে যে নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ কর হয়েছে। যারা তাকলীদের অনুসারী তাদের মতেও তো তা ঘৃণিত ও নিন্দিত। এ জন্যেই আল্লামা খতীব বোগদাদী (র) উপরোল্লিখিত আয়াতকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছেন।[২৫৭]

উপর্যুক্ত আয়াত সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথাটি হল, কাফের মুশরিকরা যে তাদের পূর্বপুরুষদের তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ করত যে কারণে তা কুরআ’ন মজীদে নিন্দিত ও ঘৃণিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, মাযহাব এর তাকলীদের বেলায় তো সেসব কারণ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কারণ, মুশরিকরা তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের আহব্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল। ইসলামের ছায়াতলে মাযহাবের তাকলীদে তো এমন কোনো বিষয় নেই। দ্বিতীয়ত কাফির মুশরিকদের পূর্বপুরুষরা ছিল মূর্খ ও হেদায়ত বঞ্চিত। মাযহাবের তাকলীদ করতে গিয়ে যাদের অনুকরণের কথা বলা হচ্ছে তারা তো হেদায়ত বঞ্চিত কেউ নন; বরং তারা ইসলামের একান্ত অনুসারী এবং দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কথা হল, কাফের মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনায় যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলোকে প্রেক্ষপট বিবেচনা না করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করানিশ্চয়ই বিভ্রান্তিকর এবং উম্মাহর মাঝে বিদ্বেষ ছড়ানোর জঘন্য মানসিকতায় দূষিত।

আমরা সামনে আলোচনা করব যে, ইসলামের ছায়াতলে মাযহাবের তাকলীদ মানে আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া বিধান লংঘন করে অন্ধ আনুগত্যের নাম নয়। বরং মুজতাহিদগণ যা বলেছেন, তা কুরআ’ন হাদীসেরই ব্যাখ্যা। তাদের সে ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম যথাযথ অনুধাবন ও অপেক্ষাকৃত সঠিক পন্থাটি নির্ণয় করে আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করার নামই তো তাকলীদ। কারণ, সব মানুষের পক্ষে কুরআ’ন হাদীস অধ্যয়ন করে সঠিক সিদ্ধান্ত উদঘাটন করা সম্ভব নয়, এর জন্যনিশ্চয়ই প্রজ্ঞাবান কারো প্রয়োজন রয়েছে।

যারা মাযহাব অস্বীকার করেন বা তাকলীদের বিরুদ্ধাচারী তাদের সবাই তো দাবি করতে পারবেন না যে, আমি সরাসরি কুরআ’ন হাদীস অধ্যয়ন করে শরী‘আর হুকুম-আহকাম মেনে চলি। কারণ, কুরআ’ন হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করার জন্য যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন এমনকি তাকলীদ শরী‘আ সম্মত নয়, এ কথা বলার জন্যও কুরআ’ন হাদীস ও আরবি সম্পর্কিত যে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের সাধনার প্রয়োজন তা তাদের সবার নেই। তাই এসব অস্বীকারকারীরাও তাদের গুরুজনদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে থাকেন। পার্থক্য হল, তারা হানাফী শাফেঈ বা চার মাযহাবের গ্রন্থাদির পরিবর্তে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, ইমাম হাযম, ইবনুল কাইয়েম, কাজী শাওকানী প্রমুখের রচনাবলীর উপর নির্ভর করে চলেন। এই নির্ভরতাকে কি তাকলীদ ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে?

---

২৫৬ মুহাম্মদ আমীন বাদশাহ, মুস্তফা বাবী আল হালাবী, *তাইসীরুত তাহরীর*, মক্কা মুকাররমা, ২০১৫, ৪খ. পৃ-২৪৩

২৫৭ আলী ইবনে সাবেত আল-খতীবুল বগদাদী, *আল ফকীহ ও ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, দারু ইবনুল জাউযি, বৈরুত, ১৪১৭/১৯৯৬, ২খ. পৃ-৬৬

এই দিকটি চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মাযহাব অস্বীকার করার প্রবণতা ও বাড়াবড়ি আরেকটি মাযহাব, যার নাম লা-মাযহাব। লা-মাযহাবীরা নিজেদেরকে সালাফী বলে দাবি করেন। সালাফী মানে যারা সালাফকে মান্য করে চলেন। সালাফ অর্থ পূর্ববর্তী শীর্ষ পর্যায়ের দ্বীনি ব্যক্তিবর্গ। কাজেই তারা যদি মাযহাবের ইমাম বা সর্বতোমুখি যোগ্যতা সম্পন্ন মুজতাহিদদের মান্য করা অস্বীকার করেন, তাহলে নিজেদের সালাফী বলে দাবি করবেন কোন মুখে? ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তারা সালাফী নামে আখ্যায়িত হতে পারেন না; বরং যারা মাযহাব মানেন তারাই প্রকৃত সালাফী।

তাকলীদের বিরোধীতা করতে গিয়ে তারা কুরআ'ন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতকে যে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান তাতেও বুঝার ফের। কুরআ'ন মজীদে ইরশাদ হয়েছে।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা (ইহুদী খ্রিস্টানরা) তাদের ধর্মীয় পন্ডিত ও ধর্মযাজকদের রব' এর মর্যাদায় বসিয়েছে।'[২৫৮]

লা-মাযহাবীরা মাযহাব অনুসারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, মাযহাব অনুসারীরা তাদের ইমাম বা মুজতাহিদদের ধর্মযাজকের আসন ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন, কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন, আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিন দূনিল্লাহ'। অর্থাৎ ইহুদী খ্রিস্টানরা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের পুরোহিতদের প্রভুর মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। কেননা, হালাম হারাম ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণে পোপ পাদ্রির সিদ্ধান্তই তাদের কাছে বিবেচ্য, আসমানী কোনো নির্দেশ নয়। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধিবিধান ও নিয়ম কানুন নির্ণয়ে তারা পুরোহিত তথা পোপকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে।

এই আয়াত দিয়ে কীভাবে মুজতাহিদ ইমামগণের কুরআ'ন হাদীসের ব্যাখ্যাকে খ্রিস্টানদের পাদ্রীদের গোমরাহীর সাথে তুলনা করছেন তা মোটেও বোধগম্য নয়। কারণ, মুজতাহিদের তাকলীদের ভিত্তি তো আইন প্রনয়ণ নয়; বরং কুরআ'ন ও সুন্নায় বিদ্যমান আইনের ব্যাখ্যাদান ও বিশ্লেষণ। মুজতাহিদ তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে কুরআ'ন ও হাদীসের অস্পষ্ট হুকুম-আহকামগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আর যাদের কাছে ইজতিহাদী প্রজ্ঞা বা যোগ্যতা নেই তারা কুরআ'ন হাদীসের বিধান হিসেবেই সেগুলো-মান্য করেন। এই হিসেবে মুজতাহিদ তো স্বতন্ত্র আনুগত্য দাবি করেন না। মসজিদে জামাত হয়। লোকেরা রুকু সিজদায় বা নামাযের বিভিন্ন পর্যায়ে ইমামের আনুগত্য করে। দূর থেকে মনে হবে, মুসল্লিরা ইমামের অন্ধ আনুগত্য করছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই আনুগত্য তো আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের। স্বতন্ত্রভাবে ইমামের আনুগত্য নয়। মাযহাব বা মাযহাবের ইমামের আনুগত্যের ব্যাপারটিও অনুরূপ। মুজতাহিদ হলেন কুরআ'ন ও সুন্নাহর পথে চলতে আগ্রহী অনভিজ্ঞ লোকদেরকে পথ দেখানোর জন্য গাইডের ভূমিকা পালন করেন। লা-মাযহাবিরা যাকে তাদের মূল তাত্ত্বিক বলে মনে করেন, তিনিও বিষয়টিকে সেভাবে উপস্থাপন করছেন। যেমন স্বয়ং ইমাম ইবনে তাইমিয়াও বলেছেন যে,

---

২৫৮ আল-কুরআ'ন - ৯ : ২১

انما يجب على الناس طاعة الله و رسوله و هؤلاء اولوا الامر الذين امر الله بطاعتهم ... انما تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله و رسوله لا استقلالا.

'আল্লাহ ও রাসূলের নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা মানুষের উপর ওয়াজিব। আর উলুল আমর' এর আনুগত্য করাও ওয়াজিব, তাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহই হুকুম দিয়েছেন। তবে উলুল আমরের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ছায়াতলেই ওয়াজিব। এর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।'[২৫৯]

এখানে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর উলুল আমরের আনুগত্যের যে কথা বলা হল, তা প্রকারান্তরে আল্লাহ ও রাসূলেরই আনুগত্য। এখানে প্রত্যক্ষ আনুগত্য ও পরোক্ষ আনুগত্যের ধারণাটি পরিষ্কার হয়ে গেল। এখানে খ্রিস্টান পোপ পাদ্রীদের অন্ধ আনুগত্য ও তাদেরকে ঐশ্বরিক মর্যদায় অনুসরণ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার কোনো অবকাশ নেই।

লা-মাযহাবিগণ আরেকটি যুক্তি দাঁড় করান যে, মাযহাব প্রবর্তক মুজতাহিদগণ বলেছেন,

'আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকুলে দলিল না পাওয়া পর্যন্ত তা গ্রহণ করো না। কিংবা তারা বলেছেন যে, আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হলে তা দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে হাদীসকেই আঁকড়ে ধরবে।'

মুজতাহিদগণের উক্তি যদি আক্ষরিক অর্থে সঠিক ধরেও নেয়া হয়, তাতে বাস্তবতার নিরিখে সবাই স্বীকার করবেন যে, মুজতাহিদ ইমামগণ এসব উক্তি তাদের উদ্দেশ্যে করেননি, যাদের ইজতিহাদের নূন্যতম যোগ্যতাও নেই। বরং যাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে, ধর্মীয় জ্ঞান ও বিধানের বিচার বিশ্লেষনের ব্যাপারে যোগ্যতা সম্পন্ন তাদের উদ্দেশ্যেই এ কথা বলেছেন। তারাই ইমাম ও মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত ও মতামতকে কুরআ'ন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবেন ও সত্যাসত্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন। শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন,

انما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو فى مسئلة واحدة وفيمن ظهرعليه ظهورا بينا ان النبى صلى الله عليه و سلم امر بكذا ونهى عن كذا وانه ليس بمنسوخ اما بأن يتتبع الاحاديث و اقوال المخالف والموافق فى المسئلة او بأن يرجما غفيرا من المتبحرين فى العلم يذهبون اليه ويرى المخالف له لا يحتج الا بقياس او استنباط او نحو ذالك فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبى صلى الله عليه وسلم الانفاق خفى او حمق جلى

'এই উক্তিগুলো সেই লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার মধ্যে কোনো না কোনো ইজতিহাদী যোগ্যতা আছে, একটি বিশেষ মাসয়ালার ক্ষেত্রে হলেও। যে ব্যক্তি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, নবী করিম কোন কাজ করতে বলেছেন, বা তিনি কোন বিষয়ে নিষেধ করেছেন। আর এ কথাও পরিষ্কার থাকে যে নবী করিম

২৫৯ আহমদ ইবনে তাইমিয়া, *ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম,* ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪২৫/২০০৪,২খ. পৃ-৪৬১

(সা)-এর উক্ত আদেশ রহিত হয়নি। অথবা সংশিষ্ট বিষয়ে সকল হাদীস গবেষণা পর্যালোচনা এবং সে বিষয়ে পক্ষ বিপক্ষের লোকদের মতামত অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উক্ত হুকুম রহিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল বিদ্যমান নেই, কিংবা তিনি বিপুল সংখ্যক বিদ্বান আলেমকে সেই মাসায়ালার উপর আমল করতে দেখেছেন এবং তার ফলে তার কাছে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, যে ইমাম উক্ত হাদীসের বিরোধীতা করছেন তার কাছে কিয়াস ও এস্তেম্বাত (গবেষণা করে মাসয়ালা উদ্ভাবন) ব্যতীত অন্য কোনো দলিল নেই। এমতাবস্থায় গোপন মুনাফেকী বা প্রকাশ্য মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু হযরত নবী করিম (স)-এর হাদীসের বিরোধীতা করার কারণ থাকতে পারে না।'[২৬০]

বিষয়টি এতই পরিষ্কার যে, এর পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করানোর প্রয়োজন হয় না। উল্লেখিত উক্তিতে যদি মুজতাহিদ ইমামগণের বক্তব্যের উদ্দেশ্য যদি এটাই হত যে, কারো তাকলীদ করা জায়েয নেই। সবাইকে সরাসরি হাদীস মেনে চলতে হবে এবং আমল করার সময় হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, তাহলে তো তাদের নিজেদের জীবনের চিত্র অন্য রকম হত। তাদের বেলাতেই তো দেখা গেছে, মানুষ তাদের কাছে গিয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করছেন আর তারা কোনো দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা ব্যতীত লোকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তারা যদি এ কাজ না জায়েয মনে করতেন, তাহলে নিজেরা কেন সে কাজ করতেন। এ ছাড়া তাদের পক্ষ হতেও বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়, যা মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য তাকলীদ করা কর্তব্য বলে সাব্যস্ত হয়। এ সম্পর্কে হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ কেফায়ার একটি বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

'ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন মুফতি যদি থাকেন তাহলে সাধারণ লোকদের উপর কর্তব্য হল তাদের তাকলীদ করা, যদি তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুলও করেন, এর কোনো বিকল্প নেই। ইমাম হাসান ইবনে রুস্তম ও বশীর ইবনে ওয়ালীদ যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের এ বক্তব্য রেওয়ায়েত করেছেন।'[২৬১]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া নিজের ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) সম্পর্কে বলেছেন, ويأمر العامى بأن يستفتى بالكتاب والسنة ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সাধারণ লোকদেরকে ইমাম ইসহাক, ইমাম আবু উবায়দা, ইমাম আবু সউর ও ইমাম মুসআব হতে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার হুকুম দিতেন। আর তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ আলেম ছিলেন যেমন ইমাম আবু দাউদ, উসমান ইবনে সাঈদ, ইবরাহীম আল হারবী, আবু বকর আল আসরম, আবু যারআ, আবু হাতেম সজেসতানী ও ইমাম মুসলিম তাদেরকে অন্যের তাকলীদ করতে বারণ করতেন এবং বলতেন যে, মূল কিতাব ও সুন্নাহর শরণাপন্ন হওয়া তোমাদের উপর ওয়াজিব।[২৬২]

---

২৬০ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি. ১খ, পৃ-১৫৫

২৬১ জালাল উদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীন আল খারেযামী, *কিফায়া ফী শারহিল হিদায়া*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত,১৯৮১, কিতাবুস সউম

২৬২ আহমদ ইবনে তাইমিয়া, *ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম*, ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪২৫/২০০৪, ২খ. পৃ-২৪০

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার এই বক্তব্য থেকে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যে সকল মুজতাহিদ তাকলীদ করতে নিষেধ করতেন তারা তাদের ঐসব শাগরিদদের নিষেধ করেছেন, যারা নিজেরাই বড় ধরনের মুহাদ্দিস, ও প্রাজ্ঞ ফকীহ ছিলেন এবং ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা তাদের মধ্যে ছিল। যারা মুজতাহিদ নয়, তাদেরকে তিনি শুধু তাকলীদ থেকে বাধা দেননি তাই নয়; বরং মুজতাহিদগণের কাছ থেকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে তাদের তাকলীদ করার হুকুম দিয়েছেন।

তাকলীদ কখন প্রয়োজন কখন প্রয়োজন নেই

আমাদের আলোচনায় একথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যখন কুরআ'ন ও হাদীসের বাণী দ্ব্যর্থক, কিংবা সংক্ষিপ্ত বা পারস্পরিক বিপরীতধর্মী বলে বুঝা যায় এবং কুরআ'ন ও সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান আহরণে জটিলতা দেখা দেয় তখনই ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদ করতে হবে এবং এই তাকলীদ বা মাযহাব মানা একান্ত জরুরী। কিন্তু যদি কুরআ'ন ও হাদীসের বিধানগুলো সহজবোধ্য হয় তাহলে তাকলীদের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। বরং কিতাবের বর্ণনা দেখেই তার উপর আমল করা বৈধ। হানাফী মাযহাবের অন্যতম স্কলার আল্লামা আব্দুল করিম নাবলুসির বক্তব্যটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন–

فالامر المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج الى التقليد فيه لاحد الاربعة كفرضية الصلوة والصوم والزكوة والحج و نحوها و حرمة الزنا و اللواطة و شرب الخمر و القتل و السرقة و الغصب و ما اشبه ذالك والامر المختلف فيه هو الذى يحتاج الى التقليد فيه

'কাজেই সেসব সর্বসম্মত মাসয়ালা, যা দ্বীনের বিধান হওয়ার বিষয়টি স্বভাবতই জানা যায়, তাতে চারজন ইমামের মধ্যে কারো তাকলীদ করার প্রয়োজন নেই। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি ফরজ হওয়ার বিধান এবং যেনা, সমকামিতা, মদ্যপান, হত্যা, চুরি, আত্মসাৎ প্রভৃতি হারাম হওয়ার বিষয়। মূলত তাকলীদের প্রয়োজন ঐসব মাসয়ালার ক্ষেত্রে দেখা দেয়, যে ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ থাকে।'[263]

শরী'আর আহকাম এর প্রকারভেদ

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, শরী'আর আহকাম প্রধানত দুই প্রকার। এক প্রকারের হুকুম অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তাতে কোনো ইমামের তাকলীদ করা জায়েয নেই; বরং যেভাবে আদেশ এসেছে সেভাবে তা পালন করতে হবে। আরেক প্রকারের হুকুমের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। খতীব বাগদাদী (র) বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

---

২৬৩ আব্দুল গণি নাবলুসী, *খোলাসাতুত তাহকীক ফী হুকমিত তাকলীদ ওয়াত তালফীক*, মাকতাবাতুত হাকীকা, তুরস্ক, ১৪৩২/২০১১, পৃ. ৪

واما الاحكام الشرعية فضربان احدهما يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوة الخمس و الزكوة وصوم رمضان و الحج و تحريم الزنا و شرب الخمر وما اشبه ذالك فهذا لا يجوز التقليد فيه لان الناس كلهم يشتركون فى ادراكه و العلم به فلا معنى للتقليد فيه و ضرب آخر لا يعلم الا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات و المعاملات و الفروج و المناكحات وغير ذالك من الاحكام فهذا لايسوغ فيه التقليد بدليل قول الله تعالى فأسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولأن لو منعنا التقليد فى هذه المسائل التى هى من فروع الدين لاحتاج كل احد ان يتعلم ذالك وفى ايجاب ذالك قطع عن المعايش وهلاك الحرث و الماشية فوجب ان يسقط

'শরী'আর হুকুম-আহকাম দুই প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে সেসব আহকাম, যেগুলো মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি স্বভাবতই প্রমাণিত। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রমযান মাসের রোযা ও হজ্জ আর মদ্যপান এবং এ জাতীয় বিধানসমূহ। এগুলোর ব্যাপারে তাকলীদ করা জায়েয নেই। কেননা, এসব বিষয়ে শরী'আর কী হুকুম সব মানুষই তা অবগত। কাজেই এগুলোতে তাকলীদের কোনো অর্থ হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার বিধিবিধান হচ্ছে, যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা ও যুক্তি প্রমাণ ছাড়া জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইবাদত বন্দেগী, লেনদেন বিয়ে শাদী প্রভৃতির খুটিনাটি বিষয়াদি। এসব ব্যাপারে তাকলীদ করা জায়েয। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন যে فأسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 'তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।' এর আরো কারণ হচ্ছে, যদি দ্বীনের শাখা প্রশাখা বিষয়ক বিধানগুলোর ব্যাপারে তাকলীদ করা নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে প্রত্যেককে পুরো দস্তর তা জানার জন্য জ্ঞান গবেষণায় লেগে যেতে হবে। এর জন্য যদি মানুষকে বাধ্য করা হয়, তাহলে তো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে। ক্ষেতখামার, পশুপালন, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি উচ্ছন্নে যাবে। কাজেই এমন হুকুম কিছুতেই দেয়া যাবে না।'[২৬৪]

এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মাত মওলানা আশরফ আলী থানবী (র)-এর একটি ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, শরী'আর মাসয়ালা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার সেসব মাসয়ালা, যেগুলোর ব্যাপরে 'নস' (কুরআ'ন হাদীসের বর্ণনা)-এর মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে আছে ঐসব মাসয়ালা যেগুলোতে 'নস' এর ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ নেই। তবে বিভিন্ন ধরনের অর্থগ্রহণ বা ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। যদিও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কারণে কোনো অর্থ কাছের ও কোনো অর্থ দূরের বলে প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঐসব মাসয়ালা যেগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই এবং একটিমাত্র অর্থই বেধগম্য হয়। অতএব প্রথম প্রকার মাসয়ালার ক্ষেত্রে বিরোধ পরিজার করার জন্য মুজতাহিদকে ইজতিহাদ করতে হবে আর যে মুজতাহিদ নয় তাকে মুজতাহিদ এর তাকলীদ করতে

২৬৪ আলী ইবনে সাবেত আল-খতীবুল বগদাদী, *আল ফকীহ ও ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, দারু ইবনুল জাউযি, বৈরুত, ১৪১৭/১৯৯৬, ২খ. পৃ-৬৭,৬৮

হবে। দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হয় যন্নিয়ুদ দিলালাহ (দ্ব্যর্থবোধক দলিল নির্ভর)। এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্ভাবনামর মধ্য হতে একটি সম্ভাবনানির্ধারণের জন্যে ইজতিহাদ ও তাকলীদের প্রয়োজন রয়েছে। তৃতীয় প্রকারকে বলা হয় কাতইয়ুদ দিলালাহ (অকাট্য দলিল নির্ভর)। এগুলোর ব্যাপরে আমরা ইজতিহাদ যেমন জায়েয মনে করি না, তেমনি তাকলীদও জায়েয নয়।[২৬৫]

এই ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাকলীদ মানে কারো প্রতি স্বতন্ত্র আনুগত্য নয়; বরং কুরআ'ন হাদীসের নির্ভুল ব্যাখ্যা জেনে তা আমল করাই তাকলীদের মূল উদ্দেশ্য। আরো পরিষ্কার ভাষায়, কুরআ'ন হাদীসর অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক ও জটিল মর্ম অনুধাবনের জন্য আমরা আইনজ্ঞ হিসেবে মুজতাহিদের শরণাপন্ন হই। কুরআ'ন - হাদীসকে অবজ্ঞা করে মাযহাব বা মাযহাবের ইমামকে মান্য করার জন্য নয়। যেখানে কোনো অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই সেখানে ইমাম বা মুজতহিদের সাহায্য ছাড়াই যেহেতু কুরআ'ন - হাদীসের নির্দেশ অনুধাবন ও অনুসরণ সহজ সেহেতু সেখানে তাকলীদ অনর্থক।

মুজতাহিদ ইমাম কি স্বতন্ত্র আইন প্রণেতা?

ফিকহশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, কোন মুজতাহিদ বা মাযহাবের ইমাম স্বতন্ত্রভাবে আইন প্রণয়নকারী নন। তারা কুরআ'ন সুন্নায় বর্ণিত আইনের ব্যাখ্যাদানকারী মাত্র। যারা তাকলীদকে গুনাহ বা শিরক কুফর পর্যন্ত আখ্যায়িত করতে চান, তাদের বলব যে, তাকলীদের যে ব্যাখ্যা আমরা দালিলিকভাবে পেশ করলাম, তাতে গোনাহের বা কুফর শিরকের কী অবকাশ আছে। যদি কেউ মাযহাবের ইমাম বা মুজতাহিদকে আইন নির্মাতা বানিরঙ্কুশ অনুকরণীয় বলে সাব্যস্ত করে তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে কুফরি এবং ইসলামী আইন প্রণয়নের কর্তৃপক্ষ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নাফরমানী। কিন্তু যদি আইনের ধর্মীয় জ্ঞান ও দূরদর্শিতার দুর্দিনে নিজের প্রতি অতি নির্ভরশীল না হয়ে পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্য হতে কারো ব্যাখ্যা অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্যই প্রকাশ পায়।

বিষয়টি বুঝার জন্য আমরা একটি উদাহরণের শরণাপন্ন হতে পারি। প্রত্যেক দেশের মতো আমাদের দেশেরও সংবিধান আছে। সংবিধানে প্রয়োজনীয় বিধান ও নীতিমালা বর্ণিত আছে। কিন্তু দেশের লাখো কোটি মানুষের মধ্যে কয়জন লোক সংবিধানের আইন কানুন দেখে দেখে হুবহু পালন করার সামর্থ্য রাখে। অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত লোকের কথা তো দূরে; ভালো ভালো শিক্ষিত লোকের পক্ষেও সংবিধানের সব কথা বুঝা ও পালন করা সম্ভব নয়। এ কারণে কোনো ব্যাপারে যখন সংবিধানের আইন বুঝার বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন দেশের সবচে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদের সাহায্য নেয়া হয়। এমতাবস্থায় কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ একথা বলে না যে, সেই আইনজ্ঞকে আইন নির্মাণের অধিকার দেয়া হয়েছে এবং সংবিধানের পরিবর্তে একজন আইনজ্ঞকে

---

২৬৫ আশরফ আলী থানবী, *আল ইকতিসাদ ফিত তাকলীদে ওয়াল ইজতিহাদ*, কদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, বি তা; পৃ. ৩৬

শাসক মেনে চলছে। কুরআ'ন হাদীসের ব্যাপারটিও অনুরূপ। কুরআ'ন -হাদীসের আইন ও বিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের আস্থাশীল হওয়ার নামই হচ্ছে তাকলীদ। কাজেই যারা তাকলীদ করে তাদেরকে এই অপবাদ দেয়া যাবে না যে, তারা কুরআ'ন - হাদীস বাদ দিয়ে তাদের মাযহাব বা মাযহাবের ইমামগণের অনুকরণ করে চলেছে।

তাকলীদের দু'টি ধরন

তাকলীদ বা ইমামগণের অনুসরণ কিংবা মাযহাব মেনে চলার দুটি ধরন হতে পারে। একটি হল, কোনো একটি মাসয়ালাতে একজন ইমামের নীতি অনুসরণ করা। অপর একটি মাসয়ালায় অন্য ইমামের নীতি অনুসরণ করা। একে তাকলীদে মুতলাক বা মুক্ত তাকলীদ কিংবা সাধারণ তাকলীদ নামে আখ্যায়িত করা যায়। তাকলীদের আরেকটি ধরন হল, একজন মাত্র মুজতাহিদ ইমামের অনুসারী হওয়া। যে কোনো মাসয়ালায় তার সিদ্ধান্তের অনুসারী হওয়া। একে বলা হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাকলীদ।

তাকলীদের উল্লেখিত উভয় ধরনের মূল হাকিকত হল, একজন লোক যদি সরাসরি কুরআ'ন ও হাদীস থেকে বিধিবিধান আহরণ করতে পারে না বিধায় যে লোককে তিনি কুরআ'ন ও সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী মনে করে এবং তার বুঝ ও জ্ঞানগরিমার উপর আস্থাশীল হয় তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী সে আমল করে। এটি এমন এক বিষয়, যা শুধু জায়েয নয়, অবশ্য পালনীয় ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআ'ন ও হাদীসে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাকলীদের যে হাকিকত ও স্বরূপ সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম সে ব্যাপারে কুরআ'ন মজীদে কতিপয় মৌলিক নীতিমালা বর্ণিত আছে। এ ধরনের কয়েকটি নীতিমালার উদাহরণ পেশ করতে চাই।

হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব

কুরআ'ন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের ন্যায় হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা থেকেও তাকলীদের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। আমরা এ পর্যায়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

عنن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لا ادرى ما بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر و عمر (رواه الترمذى وابن ماجه و احمد)

'হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মাঝে আর কতদিন বেঁচে থাকব জানি না। তবে তোমরা আমার পরে আবু বকর ও উমর এর একতেদা করবে।'[২৬৬]

২৬৬ আলী ইবনে মুহাম্মদ নূরুদ্দীন মোল্লা আল হারাভী আল কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ*, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০১০, ৫খ. পৃ- ৫৪৯

এখানে একতেদা শব্দটির ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, ধর্মীয় আনুগত্যের অর্থেই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রশাসনিক আনুগত্যের অর্থে নয়। কুরআ'ন মজীদেও এই পরিভাষাটি ধর্মীয় আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নবী-রাসূল (আ) ও নেক বান্দাদের আনুগত্যের ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ

'এরাই সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেছেন। অতএব আপনি তাদের ইকতিদা করুণ (তাদের পথের অনুসরণ করুন।'[২৬৭]

অনুরূপভাবে নবী করিম (সা) জীবনের শেষ অসুস্থতার সময়কার ঘটনার বর্ণনায় এসেছে–

يقتدى ابو بكر بصلوة رسول صلى الله عليه و سلم و الناس مقتدون بصلوة أبى بكر

'হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের ইকতিদা করেছিলেন আর বাকী সবাই আবু বকরের নামাযের ইকতিদা করেছিল।'[২৬৮]

মুসনদে আহমদে হযরত আবু ওয়ায়েল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جلست الى شيبة بن عثمان فقال جلس عمر بن خطاب فى مجلسك هذا فقال لقد همت أن لا أدع فى الكعبة صفراء ولا بيضاء الا قسمتهما بين الناس قال قلت ليس ذالك لك قد سبقك صاحباك لم يفعلا ذالك فقال هما المرآن يقتدى بهما

'আমি একবার শায়বা ইবনে উসমানের কাছে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, এতদিন হযরত উমর (রা) যেখানে তোমরা বসেছ সেখানে বসা ছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, আমার মন চায় কাবাঘরে স্বর্ণরৌপ্য যাকিছু আছে, তা মানুষের মাঝে বন্টন করে দেই। শায়বা বলেন, আমি বললাম, এ কাজ করার অধিকার আপনার নেই। কেননা, আপনার আগেকার দুই সাথী (অর্থাৎ হযরত নবী করিম সা. ও আবু বকর সিদ্দীক রা.) এমনটি করেননি। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, সত্যিই তারা দুজন এমন যে, তাদের একতেদা (অনুসরণ) করা উচিত।'[২৬৯]

এই হাদীসেও একতেদা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা বিশেষভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ও উমর (রা) কে অনুসরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় বিষয়াদি বা মাসায়েলের

---

২৬৭ আল-কুরআ'ন - ৬: ৯০

২৬৮ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, বাবু আর রজুলু ইয়াতিম্মু বিল ইমাম, ১খ. পৃ-৯৯

২৬৯ আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনদে আহমদ*, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি, ৩খ. পৃ-৪১০

ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করা শরী'আর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এই আনুগত্য যদি না থাকে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا

'আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া থেকে ইলম এমনভাবে তুলে নেবেন না যে, তা আপন বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন; বরং আলেমদেরকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নিবেন। শেষ পর্যন্ত কোনো আলেম যখন অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা জাহিলদেরকে নেতা বা নিয়ে নেবে। তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করবে আর তারা জ্ঞান ব্যতিরেকে ফতোয়া বা ধর্মীয় সিদ্ধান্ত দেবে। এতে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।'[২৭০]

এই হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে, ফতোয়া দেয়া আলেমদের কাজ। তাতে সাধারণ লোকেরা শরী'আর মাসায়েল তাদের কাছ থেকেই শিখবে। তাদের বাৎলানো পদ্ধতিতে লোকেরা আমল করবে। এটিই তো তকলীদের মূল কথা।

এই হাদীসে আরেকটি কথা বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। তা হল, হযরত নবী করিম (সা) এমন এক যুগের কথা বলেছেন, যে যুগে বিজ্ঞ আলেম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন জাহেল কিসিমের লোকেরা ফতোয়া দেয়া শুরু করবে। এখন প্রশ্ন হল, এমন যুগে শরী'আর হুকুম-আহকামের উপর আমল করতে হলে কীভাবে করবে? এর একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে যেসব বিজ্ঞ আলেম গত হয়ে গেছেন তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে। কারণ, জীবিত লোকদের মধ্যে যখন কোনো বিজ্ঞ আলেম থাকবে না, তখন কোনো লোক সরাসরি কুরআ'ন বা হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করে আমল করতে পারবে না। সে যোগ্যতা তো কারো থাকছে না। কোনো জীবিত আলেমের শরণাপন্ন হওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী কোনো যোগ্য আলেমের অস্তিত্বই তখন থাকবে না। কাজেই শরী'আর হুকুম-আহকামের উপর আমল করার একমাত্র পদ্ধতি হবে, যেসব বিজ্ঞ আলেম ইন্তিকাল করেছেন তাদের কিতাবাদি ও রচনাবলীর শরণাপন্ন হয়ে আমল করতে হবে।

এই হাদীস দ্বারা আমরা একথার সাক্ষ্য পাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম বিদ্যমান থাকবেন ততক্ষণ তাদের কাছ থেকে মাসায়েল জিজ্ঞাসা করা হবে, তাদের ফতোয়ার উপর আমল করা হবে। আর যখন এরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন আলেম থাকবে না, তখন অযোগ্য লোকদের মুজতাহিদ মনে করে তাদের ফতোয়ার উপর আমল করার পরিবর্তে পূর্বেকার আলেমদের মধ্যে কারো তাকলীদ করা হবে। এ কথার সমর্থন নিম্নের হাদীস থেকেও পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

من افتى بغير علم كان اثمه عالى من افتاه

২৭০ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খ্রি. কিতাবুল ইলম, পৃ-৩৩

'যে ব্যক্তি ইলম ব্যতিরেকে ফতোয়া দেবে তার গুনাহ ফতোয়া দানকারীর উপর বর্তাবে।'[২৭১]

এই হাদীসও তাকলীদ জায়েয হওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার দলিল। কেননা, তাকলীদ যদি জায়েয না হত, যদি তথ্যানুসন্ধান ব্যতিরেকে কারো ফতোয়ার উপর আমল করা জায়েয না হত তাহলে সমস্ত গুনাহ ফতোয়া দানকারীর উপর বর্তানোর কারণ কী। বরং যেভাবে ইলম ছাড়া ফতোয়া দেয়ার কারণে মুফতি গুনাহগার হবে সেভাবে যে ফতোয়া চাইবে সে কেন ফতোয়া সঠিক আছে কিনা তার খোঁজখবর নিল না এবং চিন্তা গবেষণা করে আমল করল না, তার জন্য সে গুনাহগার হওয়ার কথা। কাজেই উপরোক্ত হাদীস মারফত এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যে ব্যক্তি আলেম নয়, তার উপর কর্তব্য এটুকু যে, তিনি এমন কোনো লোকের কাছ থেকে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করবেন, যিনি তার জানা মতে কুরআ'ন ও হাদীসের ইলম রাখে। এরপর সেই আলেম যদি তাকে ভুল মাসয়ালা বলে তার গুনাহ বর্তাবে ফতোয়া দানকারী বা যিনি মাসয়ালা বাতলে দেন তার উপর, জিজ্ঞাসাকারীর উপর নয়।

এ ব্যাপারে আরেকটি হাদীসের দলিল হল, হযরত ইবরাহীম ইবন আব্দুর রহমান আল উযরী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

'প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য লোক এই দ্বীনের ইলমের বাহক হবে। যারা এই ইলম থেকে অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি এবং বাতিলপন্থীদের মিথ্যা দাবি আর মূর্খদের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করবেন।[২৭২]

এই হাদীসে মূর্খরা ধর্মীয় বিষয়াদির যে ব্যাখ্যা দেয় তার নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা আলেমদের জিম্মায় দায়িত্ব। এর দ্বারা বুঝা যায়, কুরআ'ন হাদীসের জ্ঞানে ইজতিহাদ করার মত জ্ঞান ও দূরদর্শীতা যার নাই তার কর্তব্য হচ্ছে নিজের বুঝের উপর ভরসা করে কুরআ'ন হাদীসের ব্যাখ্যা না দেয়া। বরং কুরআ'ন হাদীসের সঠিক মর্ম অনুধাবনের জন্য জ্ঞানবানদের শরনাপন্ন হওয়া উচিত। এর নামই হচ্ছে তাকলীদ।

এখানে এই কথাও গভীর অনুধ্যানের দাবি রাখে যে, কুরআ'ন সুন্নাহর ব্যাখ্যা কেবল ঐসব লোকেরা করতে পারে যার মধ্যে অল্পস্বল্প জ্ঞান আছে, একদম না থাকলে তো কাছেই আসতে পারবে না। কিন্তু হাদীস শরীফে এই শ্রেণীর লোকদেরও মূর্খদের কাতারে শামিল করা হয়েছে এবং তাদের ব্যাখ্যার নিন্দা করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআ'ন হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করার জন্য আরবি ভাষার উপর কমবেশি জ্ঞান রাখলে চলবে না; বরং মুজতাহিদ পর্যায়ের ইলম ও দূরদর্শিতার অধিকারী হতে হবে।

বুখারী শরীফে তা'লীক হিসেবে এবং মুসলিম শরীফে সনদসূত্রে আবু সাঈদ খোদরী (রা) হতে বর্ণিত, কোনো কোনো সাহাবী দেরিতে জামাতে শরীক হতেন, তখন নবী করিম (সা) তাদেরকে আগেভাগে নামাযে আসা এবং প্রথম কাতারে নামায পড়ার জন্য তাগাদা দেন। তৎসঙ্গে বলেন যে,

---

২৭১ প্রগুক্ত, পৃ. ৩৮

২৭২ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫, কিতাবুল ইলম, পৃ-২৮

ائْتَمُّوا بِي يَأْتَمُّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

'তোমরা আমাকে দেখে দেখে একতেদা কর। তোমাদের পরবর্তী লোকেরা যেন তোমাদের দেখে দেখে একতেদা করে।'[২৭৩]

এর একটি অর্থ তো এটাও হতে পারে যে, প্রথম কাতারে যারা আছে, তারা নবী করিম (সা)-কে দেখে দেখে তার একতেদা করবে আর পেছনের কাতারের লোকেরা প্রথম কাতারের লোকদের দেখে দেখে একতেদা বা অনুসরণ করবে। এর আরেকটি অর্থ হতে পারে, সাহাবায়ে কেরাম যেন আগে আগে মসজিদে আসে,যাতে তারা হযরত নবী করিম (সা) যেভাবে নামায আদায় করছেন তা ভালোভাবে দেখে নেন। কেননা, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সাহাবায়ে কেরামেরই একতেদা করবে। যেমন হাফেয ইবনে হাজর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وقيل معناه تعلموا امتى أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذالك أتباعهم الى ---

انقراض الدنيا

'কোনো কোনো আলেম এই হাদীসের অর্থ এভাবে করেছেন যে, তোমরা আমার কাছ থেকে শরী'আর হুকুম-আহকাম শিক্ষা করো আর তোদের পরে আগমনকারী তাবেঈন তোমাদের কাছ থেকে শিখবে। তারপর তাবেঈনদের কাছ থেকে প্রজন্মের তাবে-তাবেঈনরা শেখবে। এই পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকবে।'[২৭৪]

হযরত সাহাল ইবনে মুয়ায তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

إن إمراة أتته فقالت يا رسول الله انطلق زوجى غازيا وكنت اقتدى بصلاته إذا صلى و بفعله كله فاخبرلى

بعمل يبلغنى عمله حتى يرجع الخ.

'একজন মহিলা সাহাবী নবী করিম (সা)-এর খেদমতে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী জিহাদে গেছেন। তিনি থাকতে তিনি যখন নামায পড়তেন আমি তার নামাযের অনুকরণ করতাম। তার অন্যসব কাজেও তাকে অনুসরণ করতাম। এখন তার ফিরে আসার পর্যন্ত এমন কোনো আমল আমাকে বাতল দিন, যা আমাকে তাঁর আমলের (অর্থাৎ জিহাদের) সমমর্যাদায় পৌঁছাবে।'[২৭৫]

---

২৭৩ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, ১খ. পৃ. ৯৯

২৭৪ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, দারুল কুতুবিস সালাফিয়া, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, কায়রো ২০১৫, , ২খ. পৃ. ১৭১

২৭৫ আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনদে আহমদ*, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি., ৩খ. পৃ. ৪৩৯

এখানে ভদ্র মহিলা পরিষ্কার ভাষায় নবী করিম (সা)-এর কাছে আরয করেন যে, আমি শুধু নামাযের ক্ষেত্রেই আমার স্বামীর অনুকরণ করি না; বরং সব বিষয়েই আমি তার অনুকরণ করি। এতে নবী করিম (সা) তাতে কোনোরূপ অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি।

জামে তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, হযরত নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে এই দুইটি স্বভাবে বিদ্যমান থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে শোকরগোযার ও ধৈর্যশীল হিসেবে গণ্য করবেন। এই দুটি স্বভাব হল-

من نظر فى دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به و نظر فى دنياه إلى من هو دونه فحمد الله

'যে ধর্মীয় বিষয়ে তার চেয়ে মর্যাদাবান লোকের দিকে তাকাবে এবং তাকে অনুসরণ করবে আর যে দুনিয়াবী বিষয়াদিতে তার চেয়ে নিচের লোকের দিকে তাকাবে এবং (তার তুলনায় ভাল অবস্থায় রাখার কারণে) আল্লাহর শোকর আদায় করবে।'[২৭৬]

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাকলীদ

লা-মাযহাবীদের প্রচারণার প্রভাবে আমাদের মধ্যকার ধার্মিক শ্রেণীর মধ্যে কিছু লোকের যুক্তি হল, আমাদের জন্য কুরআ'ন হাদীসই যথেষ্ট। মাঝখানে মাযহাব বা অন্য কাউকে তাকলীদ ও অনুসরণ করার প্রয়োজন কেন? তাহলে তো আল্লাহ ও রাসূলকে মান্য করার পরিবর্তে কোনো বিশেষ ইমামকে কিংবা কুরআ'ন ও হাদীসের পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ মাযহাবকে মান্য করা হবে। কথাগুলো খুব সহজ ও সরল মনে হলেও তাতে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার একটি উদ্দেশ্য লুকায়িত। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, যারা কুরআ'ন ও হাদীস ব্যাখ্যা ও সেখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে না; তাদেরকে তো এমন লোকদের সাহায্য নিতে হবে, যারা কুরআ'ন হাদীসের জ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং শরী'আর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে। এটি কোনো নতুন কথা নয়, স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও সে কাজটি করতেন এবং এই কাজকে আল্লাহ ও রাসূলকে অমান্য করার মতো কোনো গর্হিত কাজ বলে মনে করতেন না। তারা মূলত কুরআ'ন ও হাদীসের সঠিক অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য এ কাজটি করতেন। এ কাজটি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। অর্থাৎ যে সব সাহাবী ইলম অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারতেন না অথবা কোনো বিশেষ মাসয়ালায় নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন না, তারা অন্য সাহাবীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে করে আমল করতেন। এ হিসেবে তাদের মাঝে তাকলীদে মুতলাক (উন্মুক্ত তাকলীদ) ও তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি কেন্দ্রিক) তাকলীদ উভয় প্রকার অনুকরণ অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধরনের তাকলীদের কয়েকটি উদাহরণ আমরা এখানে তুলে ধরতে চাই।

---

২৭৬ মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, কায়রো, মিসর, ১৩৯৫ হি./ ১৯৭৫, ৯খ. পৃ.৩১৭

প্রথম উদাহরণ

عن ابن عباس رض قال خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية و قال يا ايها الناس من أراد أن يسأل عن القرأن فليأت أبى بن كعب و من أراد أن يسأل عن الفرايض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى فان الله جعلنى له وليا و قاسما

'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) জাবিয়া নামক স্থানে ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি বলেন, কারো যদি কুরআনের ব্যাপারে কোনো কিছু জানার থাকে সে যেন উবাই ইবনে কা'ব এর কাছে যায়। আর যে মীরাসের আহকাম সম্বন্ধে জানতে চায় সে যেন যায়েদ ইবনে সাবেত এর কাছে যায়। আর যার ফিকহ সম্বন্ধীয় কিছু জানার প্রয়োজন হয় সে যেন মুয়ায ইবনে জবল এর কাছে যায়। আর যে ব্যক্তি সম্পদের ব্যাপারে হুকুম জানতে চায়, সে যেন আমার কাছে আসে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক ও বন্টনকারী বানিয়েছেন।'[২৭৭]

এই খুতবায় হযরত উমর (রা) সাধারণভাবে লোকদেরকে হেদায়ত দান করেছেন যে, তাফসীর, ফরাযেয ও ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের কাছ থেকে মাসয়ালা জানতে হবে। এ কথাও পরিষ্কার যে, সব লোকই কোন আমলের পক্ষে কী দলিল আছে তা বোঝার যোগ্যতা রাখে না। কাজেই এই হুকুমটি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা যোগ্যতা রাখে তারা ঐ আলেমদের কাছ থেকে দলিলও শিখে নেবেন। আর যার মধ্যে এতটুকু দলিল প্রমাণসহ শেখার যোগ্যতা নেই সে কেবল তাদের কথার উপর বিশ্বাস করে তাদের বাতলানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করবে। তাকলীদ বলতে তো এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আরেকটি তথ্য হল, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা ইজতিহাদ করে মাসয়ালা উদঘাটন করার যোগ্যতা রাখতেন না, তারা ফকীহ বা মাসয়ালার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের কাছ থেকে মাসয়ালা বা সিদ্ধান্ত জানার পর কোন দলীলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তা নিয়ে অনুসন্ধান করত না। বরং তাদের বাতানো মাসয়ালার উপর আস্থা রেখে আমল করতেন। যার দু' একটি দৃষ্টান্ত আমরা উপস্থাপন করতে চাই। যেমন

عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق و يعلجه الآخر فكره ذالك عبد الله بن عمر رض و نهى عنه

'হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে এই মাসয়ালার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কারো উপর অপর কারো মেয়াদী কর্জ আছে। কর্জদাতা লোকটিকে এই শর্তে কর্জের কিছু অংশ মাফ করে দেয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা নির্ধারিত মেয়াদের আগে আদায় করে দেবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ব্যাপারটি অপছন্দ করেন এবং তা করতে নিষেধ করেন।'[২৭৮]

---

২৭৭ আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহমদ তাবারানী, *আল মু'জামুল আওসাত*, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, বৈরুত, ২০০৮ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২৭৮ ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র), *আল-মুয়াত্তা*, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫, পৃ. ২৭৯

এই উদাহরণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেন, সে বিষয়ে কোনো সরাসরি হাদীস বর্ণিত নেই। এ জন্যে এ বিষয়টি ছিল হযরত ইবনে উমর এর কিয়াস ও ইজতিহাদ। এখানে প্রশ্নকারী যেমন দলিল জিজ্ঞাসা করেননি, তেমনি হযরত ইবনে উমর (রা)-ও এর দলিল ব্যাখ্যা করেননি। এটিকেই বলে তাকলীদ।

আরেকটি উদাহরণ

عن عبد الرحمن قال سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام فقال كان عمر بن الخطاب يكرهه

'আব্দুর রহমান বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে (গোসলের জন্য) হাম্মামে প্রবেশ করা কি জায়েয? তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) তা মকরুহ মনে করতেন।'[২৭৯]

লক্ষ্য করুন, এখানে হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের মতো মহাসম্মানিত তাবেয়ী শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন যে, হযরত উমর (রা) এ কাজটি মাকরুহ মনে করতেন। এর কোনো দলিল তিনি বলেননি। অথচ এ বিষয়ে মারফু হাদীসও বিদ্যমান। একটি হাদীস তো স্বয়ং উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে।[২৮০]

আরেকটি উদাহরণ

عن سليمان بن يسار أن أبا ايوب الانصارى رضى الله عنه خرج حاجا حتى كان بالنازية من طريق مكة اضل رواحله وانه قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوم النحر فذكر ذالك له فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه اصنع مايصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهد مااستيسر من الهدى.

'হযরত সুলায়মান ইবনে য়াসার (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন, অতপর মক্কার পথে নাযিয়া নামক স্থানে তার সওয়ারী হারিয়ে গেল। (হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১০ ই যিলহজ্জ) কুরবানীর দিন তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি তাকে অবহিত করলেন। তখন উমর (রা) তাকে বললেন, তুমি উমরা-ওয়ালাদের মতো করো। অর্থাৎ তাওয়াফ ও সায়ীর কাজ কর।) অতপর ইহরাম থেকে বের হয়ে যাও। আগামী বছর হজ্জের সময় আসলে তুমি পুনরায় হজ্জ করবে। সম্ভব হলে একটি কুরবানী প্রদান কর।'[২৮১]

এখানেও লক্ষনীয় বিষয় হল, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী এখানে হযরত উমর (রা)-এর কাছ থেকে তিনি যে ফতোয়া দিলেন সে ব্যাপারে কোনো দলিল দাবি করেননি। হযরত উমর (রা)ও কোন দলীলের ভিত্তিতে এই

---

২৭৯ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী, *আল-মাতালিবুল আলিয়া বিযাওয়াদিল মাসানিদিস সামানিয়া*, দারুল আসেমা, কায়রো ১৯৯৮, খ. ২ পৃ: ৫১

২৮০ আব্দুল কাদের জিলানী, *আল-ফাতহুর রব্বানী ওয়াল ফায়যুর রহমানী*, দারুর কুতুবিল ইলমিয়া, কায়রো, ২০০৩, ২খ. পৃ. ১৫০

২৮১ ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র), *আল-মুয়াত্তা*, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫, পৃ. ১৪৯

সিদ্ধান্ত দিলেন তা উল্লেখ করেন নি। বরং হযরত উমর (রা)-এর জ্ঞান ও বদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে আমল করেছেন। তাকলীদ বলতে তো একেই বুঝায়।

আরেকটি উদাহরণ

عن مصعب بن سعد قال كان أبى إذا صلى فى المسجد تجوز و أتم الركوع و السجود والصلوة وإذا صلى فى البيت اطال الركوع و السجود والصلوة قلت يا ابتاه اذا صليت فى المسجد جوزت وإذا صليت فى البيت اطلت قال يا بنى انا أئمة يقتدى بنا. (رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله الصحيح)

'হযরত মুসআব ইবনে সাআদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) যখন মসজিদে নামায পড়তেন তখন রুকু সিজদা ও নামায পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত আকারে আদায় করতেন। কিন্তু তিনি ঘরে নামায পড়লে রুকু সিজদা ও নামায দীর্ঘ করে পড়তেন। আমি তার কাছে প্রশ্ন করলাম। বাবা! আপনি যখন মসজিদে নামায পড়েন সংক্ষিপ্ত আকারে পড়েন আর ঘরে পড়লে লম্বা করে পড়েন, কারণ কী? বাবা বললেন, বৎস! আমরা হলাম ইমাম শ্রেণীর লোক, লোকেরা আমাদের একতেদা করে। (অর্থাৎ লোকেরা আমাদেরকে দীর্ঘ নামায পড়তে দেখে নিজেরাও লম্বা নামায পড়া শুরু করবে। জায়গায় বেজায়গায় তা অনুসরণ করা শুরু করে দেবে। এ কারণে মসজিদে নামায অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে পড়ি।'[২৮২]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের কেবল কথা বা উক্তির তাকলীদ করতেন না; বরং বড় বড় সাহাবীগণের নিছক আমল দেখেও তার অনুকরণ করতেন। যেখানে আমল দেখে অনুকরণ বা তাকলীদ করার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে তো ঐ আমলের পক্ষে কী কী দলিল আছে, তা উত্থাপিত হতে পারে না। একারণেই বড় বড় সাহাবীগণ তাদের আমলের ক্ষেত্রে এতই স্পর্শকাতরতা দেখাতেন, যাতে সাধারণ সাহাবীরা তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে কষ্টের মধ্যে পড়ে না যায়।

অপর উদাহরণ

إن عمر بن الخطاب رض راى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا و هو محرم فقال عمر رض ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة بن عبيد الله يا امير المؤمنين انما هو مدر فقال عمر رض إنكم ايها الرهط أيمة يقتدى بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد قد كان يلبس الثياب المصبغة فى الاحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيأ من هذه الثياب المصبغة

'হযরত উমর (রা) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে একবার ইহরাম অবস্থায় রঙীন কাপড় পরতে দেখে বললেন, তালহা! এই রাঙানো কাপড় কেন? তালহা বিন উবায়দুল্লাহ তখন বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! এই কাপড়ে তো সুগন্ধি নেই। (ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি না থাকলে রঙীন কাপড় পরতে আপত্তি থাকার কথা নয়) তখন উমর (রা) বললেন, তোমরা হলে ইমাম সম্প্রদায়। সাধারণ মানুষ সবকাজে তোমাদের ইকতেদা করে থাকে।

২৮২ সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব, *অল-মুজামুল কবীর*, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া, মক্কা মোকাররমা, ২০০৮

কোনো অজ্ঞ লোক যদি তোমাকে এই কাপড় পরতে দেখে তাহলে বলবে যে, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (ইহরাম অবস্থায় রাঙ্গানো কাপড় পরিধান করতেন। (তখন অজ্ঞতাবশত তারা সুবাসহীন ও সুবাসিত উভয় ধরনের রঙিন কাপড় পরা শুরু করবে) সুতরাং এ ধরনের কাপড় তোমরা পরো না।'[২৮৩]

হযরত উমর (রা)-এর এই নিষেধাজ্ঞা থেকেও জানা যায় যে, সাহাবাদের যুগে সাধারণ লোকেরা বিজ্ঞ সাহাবীদের অনুকরণ করতেন এবং এই অনুকরণের জন্য কোনো দলিল প্রমাণ খোঁজ করতেন না। এ ধরনের অনুকরণের নামই তো তাকলীদ।

আরো একটি উদাহরণ

অনুরূপ একবার হযরত উমর (রা) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে বিশেষ ধরনের মোজা পরতে দেখে বললেন,

عزمت عليك الا نزعتهما فإنى أخاف أن ينظر الناس اليك فيقتدون بك

'আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, এগুলো তুমি খুলে ফেল। কারণ, আমার আশংকা হচ্ছে, লোকেরা তোমাকে দেখে অনুকরণ করা শুরু করবে।'[২৮৪]

উপরোল্লিখিত তিনটি ঘটনা এ কথার স্পষ্ট দলিল যে, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যারা ফিকহ সংক্রান্ত জ্ঞানে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাদের কেবল কথা বা ফতোয়ার নয়; বরং তাদের কাজকর্মেরও অনুকরণ বা তাকলীদ করা হত। এই তাকলীদে আমলসমূহের পক্ষে দলিল আছে কিনা জাতীয় কোনো প্রশ্ন করা হত না। এ কারণে বিশিষ্ট সাহাবীগণ তাদের কাজেকর্মে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। আর অন্যদেরকেও সতর্ক থাকার জন্য তাকিদ দিতেন।

উদাহরণ

হযরত উমর (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-কে কুফায় প্রেরণ করেন এবং কুফার লোকদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রের বক্তব্য ছিল–

إنى بعثت اليكم بعمار بن ياسر اميرا و عبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من اصحاب

رسول الله صلى الله عليه و سلم من اهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما

'আমি তোমাদের কাছে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে শাসক এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদকে শিক্ষক ও পরামর্শদাতারূপে পাঠালাম। তারা উভয়ে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

২৮৩ আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনদে আহমদ*, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি, ১খ. পৃ. ৯২

২৮৪ হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বকর আল-হায়সামী, *দারুল ফিকর*, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, বৈরুত, ১৪১৪/১৯৯৪, হাদীস নং-৫৩৩৭

ওয়াসাল্লামের অন্যতম সম্ভ্রান্ত সাহাবী। কাজেই তোমরা ঐ দুজনকে অনুকরণ করবে এবং তাদের কথা শুনবে।'[২৮৫]

হযরত উমর (রা)-এর উল্লেখিত চিঠির ভাষা থেকেও সাহাবা যুগে সাধারণ লোকেরা বিশিষ্ট সাহাবীদের তাকলীদ করা প্রমাণিত হয়।

উদাহরণ

হযরতআব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) মামলা-মোকদ্দমা বা বিচার আচারের মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما فى كتاب الله فان جاءه امر ليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به النبى صلى الله عليه وسلم فإن جاءه امر ليس فى كتب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون فان جاءه امر ليس فى كتاب الله و لا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه.

'আজকের পর তোমাদের মধ্যে যার কাছে মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কেনো বিষয় উপস্থিত হয় তার উচিত আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী তার বিচার ফয়সালা করা। যদি এমন কোনো বিষয় সামনে আসে যা আল্লাহর কিতাবে নাই তাহেল তার উচিত হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টির যেভাবে ফয়সালা দিয়েছেন তার অনুসরণ করা। যদি এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, যার ফায়সালা আল্লাহর কিতাবে নাই বা আল্লাহর নবীর (সা) ফায়সালার মধ্যেও তার সমাধান পাওয়া না যায়, তাহলে নেককার লোকেরা যে ধরনের ফায়সালা দিয়েছেন তার অনুকরণ করা হবে। আর যদি এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, যার বিধান আল্লাহর কিতাবে পাওয়া না যায়, আল্লাহর নবীর ফায়সালার মধ্যেও পাওয়া না যায় এবং নেককার লোকদের ফায়সালায়ও না থাকে তাহলে তার উচিত নিজের চিন্তা-অভিমত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া বা ইজতিহাদ করা।'[২৮৬]

এই রেওয়ায়াতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) মামলা-মোকদ্দমায় ফায়সালা দানের চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। প্রথমে কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআ'ন মাজীদ। দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ (সা) তৃতীয় স্তরে সালেহীন বা নেককার লোকদের ফায়সালা আর চতুর্থ স্তর হচ্ছে ইজতিহাদ ও কিয়াস। এখানে যে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তার দাবি রাখে তা হচ্ছে এ বিষয়ে কোনো বুদ্ধিমান মানুষই মতভেদ করতে পারে না যে, প্রথমে আল্লাহর কিতাব কুরআ'ন ও পরে সুন্নতে রাসূলের দিকে রুজু করার অর্থ এটা হতে পারে না যে, কিতাবুল্লাহকে বিবেচনা করতে গিয়ে সুন্নাতে রাসূলের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা হবে। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহয় কি বলা হয়েছে তা নিজের মত ও চিন্তা খাটিয়ে নির্ণয় করা হবে। সুন্নাতে রাসূলকে যদি সেই মত ও চিন্তার বিপরীত মনে হয় তা

---

২৮৫ মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, ২০০৮, পৃ. ৮৭

২৮৬ আবু আব্দির রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী খোরাসানী আন নাসায়ী, *সুনানে নাসায়ী*, মাকতাব আল-মাতবুআতিল ইসলামিয়া, বৈরুত ২০১১, ২খ. পৃ.৩০৫; সুনানে দারেমী ১খ. পৃ. ৫৪

পরিত্যাগ করা হবে। বরং আলেমদের সর্বসম্মত মত হচ্ছে, এর ভাবার্থ হল, কিতাবুল্লাহর তাফসীর করতে গিয়ে অবশ্যই সুন্নাতে রাসূলের সাহায্য নিতে হবে। কিতাবুল্লাহর বিধিবিধানের ব্যাখ্যা হতে হবে সুন্নাতে রাসূলের আলোকে। নচেত এ কথা বলা যাবে যে, কুরআনে যেহেতু ব্যভিচারীর হুকুম মজুদ আছে তাকে চাবুকই মারা হবে। সুন্নাতের শরণাপন্ন হওয়ার কোনো দরকার নেই। অর্থাৎ আর রজম (বা বিবাহিত পুরুষ ও নারী ব্যভিচারীকে) পাথর মারার হুকুম, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ মাফ করুন, কিতাবুল্লাহর বরখেলাফ মনে হওয়ার কারণে ভিত্তিহীন গণ্য করা হবে। এ ধরনের যুক্তি বিন্যাস উম্মতের সর্বসম্মত মত ইজমা অনুসারে সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত।

অনুরূপভাবে নেককার লোকদের ফায়সালাকে তৃতীয় স্তরে রাখার অর্থ এই নয় যে, কিতাব ও সুন্নাহর তাফসীর ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নেককারদের মতামত ও ফায়সালা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হবে। বরং এর অর্থের মধ্যে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, কুরআ'ন ও হাদীসের ব্যাখ্যা নেককার লোকদের সিদ্ধান্তের আলোকে করা হবে। তাকলীদের সারকথাও তো তা-ই। অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহর বিধান যদি নিশ্চিতভাবে জানা না যায় এবং তার সম্ভাব্য বিভিন্ন অর্থ থাকে তখন এর একটি নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করার জন্য মুজতাহিদের মতামতের সাহায্য নিতে হবে।

তাছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ এই হুকুম সে লোককে দিয়েছিলেন, যাকে কাজির পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। অতএব প্রমাণিত হল যে, তাকলীদ কেবল মুর্খ ও অশিক্ষিত লোকদের বিষয় নয়; বরং আলেমদেরও নিজের ইজতিহাদী মতামতের উপর ভরসা করার পরিবর্তে পূর্ববর্তী নেককার আলেমদের মতামতের অনুসরণ করা উচিত। তবে কোনো জাহেল মুর্খের তাকলীদ ও একজন আলেমের তাকলীদের মধ্যে অবশ্যাই তফাত আছে। এতটুকু আলোচনার মধ্যে আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম এর সেসব আপত্তির জবাব হয়ে গেছে, যেসব আপত্তি তিনি এই রেওয়ায়াত দ্বারা দলিল পেশ করতে গিয়ে উত্থাপন করেছিলেন।[২৮৭]

ইমামের পেছনে কেরাত পড়া না পড়ার প্রশ্নে তাকলীদ

হযরত সালেম ইবনে আব্দিল্লাহ বলেন,

كان ابن عمر رض لايقرء القرأن خلف الامام قال فسألت القاسم بن محمد عن ذالك فقال إن تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم وإن قرأت فقد قرأه ناس يقتدى بهم و كان القاسم ممن لا يقرأ

'হযরত ইবনে উমর (রা) ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তেন না। তাই আমি হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ এর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাই। তখন তিনি বলেন,আমি যদি ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ ছেড়ে দেই তার অবকাশ আছে। কেননা, এমন বহু লোক ইমামের পেছনে কেরাত পড়া থেকে বিরত ছিলেন, যাদেরকে অনুকরণ ও তাকলীদ করা হত। আর যদি আমি ইমামের পেছনে কেরাত পাঠ করি, তারও অবকাশ আছে। কেননা, এমন বহু লোক ইমামের পেছনে কেরাত পড়েছেন যাদের প্রতি তাকলীদ করা হয়। আর কাসেম ইবনে মুহাম্মদ নিজে ইমামের পেছনে কেরাত পড়ার পক্ষে ছিলেন না।'

২৮৭ ইবনুল কাইয়েম জাওযী, *এলামুল মুকেয়ীন*, দারু ইবনু জওযী, ২০০৮, ২খ. পৃ.১৭৮

লক্ষ্যণীয় হল, হযরত কাসেম ইবেনে মুহাম্মদ ছিলিন বড় দরজার তাবিয়ী এবং মদীনা তাইয়েবার সাতজন বড় ফকীহর অন্যতম। তার এই উক্তি পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রমাণ করছে যে, যেখানে পরস্পর বিরোধী দলিল আছে সেখানে ভালোনিয়তে যে কোনো ইমামের অনুকরণ করা হবে, তা জায়েয।

পানি পানে তাকলীদের উদাহরণ

কানজুল উম্মালে একটি রেওয়ায়াত আছে তাবাকাতে ইবনে সাআদ এর বরাতে

عن الحسن أنه سأله رجل أتشرب من ماء هذه السقاية التى فى المسجد فإنها صدقة قال الحسن قد شرب ابو بكر و عمر من سقاية ام سعد فمه

'তাবাকাতে হযরত হাসান (রা) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, আপনি কি মসজিদের পানির সুরাহী থেকে পানি পান করছেন, অথচ তা সদকার পাত্র? হযরত হাসান (রা) উত্তর দিলেন, হযরত আবু বকর ও উমর উম্মে সাআদের সুরাহীর মুখ দিয়ে পানি পান করেছেন। আমি পানি পান করলে অসুবিধা কিসে?'

লক্ষ্য করুন, হযরত হাসান সাদকার সুরাহী দিয়ে পানি পান করার পক্ষে হযরত আবু বকর ও উমর (র)-এর আমর ছাড়া অন্য কোনো দলিল পেশ করেন নি। বুঝা গেল, তিনি তাঁরা দু' জনের তাকলীদ করলেন।[২৮৮]

ব্যক্তিবিশেষের তাকলীদ সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগে

কুরআ'ন ও সুন্নাহর অনুসরণে তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা এবং এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীদের আমল ও দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচিত দৃষ্টান্তগুলো ছিল উন্মুক্ত তাকলীদের। অর্থাৎ কোনো একজন সাহাবী বা বিশেষজ্ঞকে তাকলীদ করেছেন এমন নয়। বরং কখনো তারা একজনের কাছে কোনো মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেছেন আবার আরেকজনের কাছে গিয়েও জিজ্ঞাসা করেছেন। আমরা এখন এমন কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে চাই যা প্রমাণ করবে যে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মাঝে ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদও বিদ্যমান ছিল।

প্রথম উদাহরণ ঋতুবতী মহিলাদের তাওয়াফ প্রসঙ্গে

বুখারী শরীফে হযরত ইকরামার বর্ণনায় এসেছে,

وإن اهل المدينة سألوا ابن عباس رضى الله عاهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا ناخذ بقولك و ندع قول زيد

'একদল মদীনাবাসী হযরত ইবনে আব্বাসকে একবার মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাওয়াফ অবস্থায় ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কি করবে? (বিদায়ী তাওয়াফের জন্য ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করবে নাকি তখনি

২৮৮ আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়ালে ওয়াল আফআল*, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০১/১৯৮১, ৩খ. পৃ-৩১৭

ফিরে যাবে?) ইবনে আব্বাস বলেন, বিদায়ী তাওয়াফ না করেই ফিরে যাবে। কিন্তু মদীনাবাসী দলটি বললো, যায়েদ বিন সাবেতকে বাদ দিয়ে আপনার মতামত মানতে পারি না।'[২৮৯]

মু'জামে ইসমাঈলীতে আব্দুল ওয়াহহাব সাকাফী সূত্রে মদীনাবাসী দলটির মন্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

لا نبالى أفتييتنا أو لم تفتنا زيد بن ثابت يقول لا نتفر

'আপনার ফতোয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। যায়েদ বিন সাবেত তো বলেছেন, (তাওয়াফুল বিদা না করে যেতে পারবে না)।[২৯০]

ঠিক এই ঘটনটি মুসনাদে আবু দাউদ ও তায়ালিসীতে কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে মদীনাবাসী দলটির ভাষ্য হচ্ছে,

لانتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا فقال سلوا صاحبتكم ام سليم

'হে ইবনে আব্বাস যে বিষয়ে আপনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এর বিরোধীতা করছেন তাতে আমরা আপনার অনুসরণ করব না। তখন ইবনে আব্বাস বলেন যে, (মদীনায় পৌঁছার পর) উম্মে সুলাইম এর কাছে জিজ্ঞাসা করবে (তাতে বুঝতে পারবে যে, আমি যা বলেছি সেটিই সঠিক)।'[২৯১]

এই ঘটনায় মাদীনাবাসী দল ও হযরত ইবনে আব্বাসের মধ্যকার কথাবার্তায় দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। একটি হল, মদীনাবাসীরা যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর এককভাবে তাকলীদ করতেন। এ জন্যে তার মতের বরখেলাফ কারো কথার উপর আমল করতেন না। মুজামে ইসমাঈলীর রেওয়ায়াত দ্বারা তো এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (র) নিজস্ব ফতোয়ার দলিল হিসেবে উম্মে সুলাইম প্রমুখের হাদীসও শুনিয়েছেন।[২৯২] এতদসত্ত্বেও যেহেতু হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এর ইলমের উপর তাদের পুরোপুরি আস্থা ছিল, সেহেতু তারা তার উক্তিকে হুজ্জাত বা দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং হযরত ইবনে আব্বাসের ফতোয়ার উপর আমল না করার পেছনে এ ছাড়া অন্য কোনো যুক্তি দেননি যে, তা হযরত যায়েদ এর ফতোয়ার বরখেলাপ।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মদীনাবাসী দলের বিরোদ্ধে আপত্তি তোলেন নি যে, তোমরা এক ব্যক্তিকে তাকলীদ করতে গিয়ে গুনাহের কাজ করেছ বা শিরকের মধ্যে লিপ্ত হয়েছ। বরং তাদেরকে উম্মে সুলায়মের কাছে গিয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার উপদেশ দিয়েছেন। তারা মদীনায় পৌঁছে হযরত ইবনে আব্বাস এর উপদেশ অনুসারে উম্মে সুলাইমের কাছে গিয়ে বিষয়টি যাঁচাই করে পুনরায় যায়েদ ইবনে সাবেত এর কাছে

---

২৮৯ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, কিতাবুল হজ্জ

২৯০ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী* ,দারুল কুতুবিস সালাফিয়া, কায়রো ২০১৫, ৩খ. পৃ. ৪২৭

২৯১ সুলায়মান ইবনে আবু দাউদ তায়ালিসী, *মুনাদে তায়ালেসী*, মাতবা মজলিসে দায়েরাতুল মাআরিফ আন নিযামিয়া, ১৯০৩, , পৃ. ২২৯

২৯২ জানা যায় যে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এর সাথে সাক্ষাতের পর মদীনাবাসী দলটি যখন পুনরায় ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তখন তারা তাকে বলে যে, আপনি যেভাবে বলেছিলেন আমরা বিষয়টি সেভাবেই পেয়েছি।

যান। যার ফলে হযরত যায়েদ (রা) হাদীসটি অনুসন্ধান করে নিজের আগের মত বদলান আর তার তথ্যটি হযরত ইবনে আব্বাসকেও অবহিত করেন। মুসলিম, নাসায়ী ও বায়হাকী প্রভৃতিতে এই রেওয়ায়াতের বিবরণ রয়েছে।[২৯৩]

কেউ কেউ এই যুক্তির জবাবে বলেন যে, মদীনাবাসী দলটি যদি মুকাল্লিদ হতেন তাহলে উম্মে সুলাইমের কাছে গিয়ে তা যাঁচাই করেতন না।[২৯৪] কিন্তু তাদের এই জবাব একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তিশীল। যে ধারণা অনুযায়ী মনে করা হয় যে, মুজতাহিদের তাকলীদ করার পর হাদীসের তাহকীক করা হারাম। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যারা মাযহাব মানে না বা তাকলীদের বিরোধী তাদের অধিকাংশ যুক্তি ও দলিল এবং আপত্তি এই ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ আমরা ইতপূর্বে যেমন উল্লেখ করেছি, তাকলীদের মূল কথা হল, যে লোক সরাসরি কুরআ'ন হাদীসের অর্থ বুঝতে, উভয় সূত্রে দৃশ্যমান বিরোধগুলো নিরসনের বা নাসেখ মানসুখ অর্থাৎ রহিতকারী ও রহিত বিধানের বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার যোগ্যতা রাখেন না, তিনি অন্য কোনো মুজতাহিদের কাছ থেকে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত দলিল জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে মুজতাহিদের জ্ঞানের উপর আস্থাশীল হয়ে তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করতে হবে।

কাজেই তাকলীদ-এর মধ্যে কিছুতেই এই ধারণাটি শামিল হতে পারে না যে, মুজতাহিদের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করার পর কুরআ'ন হাদীসের ইলম হাসিল করার জন্য চেষ্টা করা যাবে না। বরং এই দরজা তো তাকলীদের পরও উন্মুক্ত থাকে। এ কারণেই হাজার হাজার মুকাল্লিদ কোনো একজন ইমামের তাকলীদ করা সত্ত্বেও কুরআ'ন মজীদের তাফসীর ও হাদীস শরীফের শরাহ লিখেছেন। তারাই নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে নিজেদের ইলম বৃদ্ধি করা ও জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পরিসর বৃদ্ধি করার জন্য প্রক্রিয়া জারি রেখেছেন। এই গবেষণা প্রক্রিয়ায় যদি কখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো হাদীস মুজতাহিদের মতের বরখেলাফ মজুদ আছে। আর তার বিপরীতে কোনো শক্ত দলিলও নাই। তাহলে সেই মাসয়ালায় নিজের ইমামের পরিবর্তে স্পষ্ট হাদীসের উপর আমল করেছেন। যার বিবরণ আমরা সামনে উপস্থাপন করবো ইনশা আল্লাহ। কাজেই যদি কোনো মুকাল্লিদের কাছে আপন ইমামের ফতোয়া হাদীসের বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলে সেই হাদীস নিয়ে গবেষণা করা তাকলীদের বরখেলাফ নয়। উল্লেখিত হাদীসে তো তাকলীদ ও তাহকীক বা গবেষণা ও যাঁচাই দুটিরই অবকাশ ছিল। কেননা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) তখনও জীবদ্দশায় ছিলেন এবং হাদীস নিয়ে গবেষণার পর তার ফল তাকে অবহিত করতে পারতেন। তারা তো এমনটিই করেছেন। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতও তার মতটি পরিবর্তন করে নেন।

তবে এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হল, মদীনাবাসীদের এই মন্তব্য, যা সকল বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে

لَا نُتَابِعُكَ يَا اِبْنُ عَبَّاسٍ وَاَنْتَ تُخَالِفُ زَيْداً

---

২৯৩ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী দারুল কুতুবিস সালাফিয়া*, কায়রো ২০১৫, ৩খ. পৃ. ৪৬৮

২৯৪ মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী, *তাহরীকে আযাদীয়ে ফিকর ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ কি তাজদীদী মাসাইল,* মাকতাবা নযিরিযা, পৃ. ১৩৬

'আমরা যায়েদ এর মতামত অগ্রাহ্য করে আপনার কথার উপর আমল করতে পারব না।' একে যদি ব্যক্তির তাকলীদ না বলি, তাহলে আর কি বলতে হবে? মদীনাবাসী তো ব্যক্তির তাকলীদের কারণেই যায়েদ বিন সাবিত ছাড়া কারো ফতোয়া মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।'

ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদের উদাহরণ

বুখারী শরীফে হযরত হুযাইল বিন শুরাহবীল সূত্রে একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিছুলোক হযরত আবু মূসা আশআরী (রা)-এর কাছে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তার জবাব তো দিলেন; কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ সাহেবের কাছেও একটু জিজ্ঞাসা করে নিবেন। লোকগুলো তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তার কাছ থেকে সেই মাসয়ালাটি জিজ্ঞাসা করলেন এবং একই সাথে হযরত আবু মূসা আশআরীর মতামতের কথাও উল্লেখ করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) যে ফতোয়া দিলেন তা হযরত আবু মূসা আশয়ারীর ফতোয়ার বরখেলাফ ছিল, কিন্তু লোকেরা হযরত আবু মূসা আশয়ারীর কাছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদের ফতোয়ার কথা জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে তিনি বলেন-

لَاتَسْأَلُوْنِىْ مَا دَامَ هَذاَ الْحِبْرُ فِيْكُمْ

'যতক্ষণ এই জ্ঞান সমুদ্র তোমাদের মাঝে আছেন ততদিন তোমরা আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করো না।'[২৯৫] লক্ষ্যণীয়, এখানে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) পরামর্শ দিচ্ছেন যে, যতদিন পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) জীবিত আছেন ততদিন সকল মাসআলা তার কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করবেন। এর নামই তো ব্যক্তি তাকলীদ। এভাবে তিনি ব্যক্তি তাকলীদকে উৎসাহিত করেছেন।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) এর বিখ্যাত হাদীস-

عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَماَّ بَعَثَهُ إِلىَ الْيَمَنِ قَال كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضاَءٌ قَالَ أَقْضِىْ بِكِتاَبِ اللهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ كِتاَبِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلاَ فِىْ كِتاَبِ اللهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِىْ وَلاَ آلُوْ. فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَدَرَهُ فَقاَلَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ وَفَقَ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ لِماَ يَرضى رَسُوْلُ اللهِ (صَلىَّ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ.

'হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে ইয়ামেনে পাঠালেন তখন (বিদায়ের প্রাক্কালে) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তুমি কীভাবে তার সামাধান দেবে? মু'আয (রা) আরয করলেন, আল্লাহর কিতাব (কুরআ'ন)-এর আলোকে আমি ফয়সালা করব। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কিতাবুল্লাহয় কোনো সমাধান খুঁজে না পাও তখন? তিনি

২৯৫ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২, কিতাবুল ফারায়িয, ২খ. পৃ. ৯৯৭; আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনদে আহমদ*, ১খ. পৃ-৪৬৪

বললেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর আলোকে তার সমাধান দেব। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যে তা পাওয়া না যায়? তিনি আরয করলেন, আমার চিন্তা ও ইজতিহাদ থেকে সমস্যার সমাধান বের করব এবং এ ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করব না। নবীজি তখন হযরত মু'আয (রা)-এর বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! সেই সত্তার সব প্রশংসা, যিনি তার রাসূলের দূতকে এমন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার তওফীক দিয়েছেন যার উপর আল্লাহর রসূল রাজি আছেন।'[২৯৬]

এই ঘটনা ইজতিহাদের বিষয়ে এক আলোকবর্তিকা, এর আলোক শিখায় অনেক সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। আমরা এখান থেকে এ বিষয়টির প্রমাণ আহরণ করব যে, নবী করিম (সা) তাঁর ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ সাহাবীদের মাঝ থেকে মাত্র একজনকে অর্থাৎ হযরত মু'আয ইবনে জবলকে ইয়ামানবাসীর জন্য প্রেরণ করেন। তাকে শাসক, কাজী, শিক্ষক ও মুজতাহিদ রূপে নির্ধারণ করে ইয়ামানবাসীর উপর বাধ্যতামূলক করে দেন যে, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। নবীজি হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে শুধু কুরআ'ন সুন্নাহর ভিত্তিতে নয়; বরং নিজের কিয়াস (অনুমান) ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত দেয়ার এজাযত দান করেন। ব্যাপারটির অর্থ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, নবী করিম (সা) ইয়ামানবাসীকে ব্যক্তি তাকলীদের অনুমতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাকলীদে শাখসি বা ব্যক্তি বিশেষের অনুকরণকে তাদের উপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

শুধু ইয়ামেনবাসী নয়, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের তথ্য মতে সাধারণ সাহাবাগণও পরম আস্থা ও নির্ভরতায় হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর তাকলীদ করতেন। যেমন

عن ابى مسلم الخولانى قال أتيت مسجد اهل دمشق فإذا حلقه فيها كهول من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية كثير بن هشام فإذا فيه نحو ثلاثين كهلا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وإذا شاب فيهم اكحل العينين براق الثنايا كلما اختلفوا فى شىء ردوه الى الفتى فتى شاب قال قلت لجليس لى من هذا قال هذا معاذ بن جبل

'প্রখ্যাত তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওলানী হতে বলেন, আমি একবার দামেশকবাসীর মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম যে, যেখানে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল প্রবীণ সাহাবী হালকা করে বসে আছেন। ইবনে কাসীরের অপর রেওয়ায়াত অনুযায়ী সেখানে ত্রিশ জনের মতো হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রবীণ সাহাবী বসা ছিলেন।[২৯৭] তাদের মাঝে এক যুবক বসে আছেন সুরমা মাখা দুই চোখ, উজ্জ্বল ঝকঝকে দন্তপাটি, যখনই তারা কোনো বিষয়ে মতবিরোধের শিকার হচ্ছে, সেই

---

২৯৬ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. কিতাবুল আকদিয়া, ইজতিহাদ ওয়ার রায় ফিল আকযিয়া অধ্যায়।

২৯৭ আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনদে আহমদ*, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বৈরূত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি. , ৫খ. পৃ. ২৩৯

যুবকের শরণাপন্ন হচ্ছেন। আমি পাশের একজনের কাছে যুবকের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইনিই মু'আয ইবন জাবাল।'[২৯৮]

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ত্রিশজনের মতো সাহাবায়ে কেরাম এখতেলাফি বা বিরোধপূর্ণ মাসআলায় হযরত মু'আয (রা)-এর অনুকরণ করছিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতের ভাষ্য তো এ রকম–

إذا اختلفوا فى شيئ اسندوه اليه و صد روا عن رأيه

'কোনো ব্যাপারে যদি তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার মু'আয (রা)-এর উপর ন্যস্ত করতেন। আর তার দেয়া ফয়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতেন।'[২৯৯]

মোটকথা হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (র) সেসব ফকীহ সাহাবার অন্তর্ভূক্ত, যাদেরকে নবী করিম (সাল) হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও তার তাকলীদ করতেন। কাজেই নবীজি যখন তাকে ইয়ামেন পাঠালেন এবং তাকে বিচার, প্রশাসন, শিক্ষাদান ও ফতোয়া দানের যাবতীয় দায়িত্ব প্রদান করলেন তখন ইয়ামানবাসীর উপর বাধ্যতামূলক করে দিলেন যে, তাদেরকে সব ধর্মীয় বিষয়ে মু'আয ইবনে জাবালকে মেনে চলতে হবে। ইয়ামানবাসী ঠিক সে কাজটিই করেছিলেন। আর এর নামই হল তাকলীদ।

ব্যক্তি তাকলীদের আরো একটি উদাহরণ

عن عمر بن ميمون الاودى قال قدم علينا معاذ بن جبل رض اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا فسمعت تكبيره مع الفجر رجل اجش الصوت قال فالقيت محبتى عليه فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت الى افقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود قلزمته حتى ماتت.

'হযরত আমর ইবনে মায়মূন আল আউদি (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) আমাদের কাছে ইয়ামেনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত হিসেবে আগমন করলেন। তিনি বলেন, ফজরের নামাযে আমি তার তকবীর শুনতে পেলাম। তার কণ্ঠস্বর ছিল গভীর ও ভরাট। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম, তাকে ভালোবাসতে লাগলাম। সিরিয়ায় তার মৃত্যু ও তাকে দাফন করা পর্যন্ত আমি তার সান্নিধ্য আঁকড়ে

২৯৮ প্রাগুক্ত, ৫খ. পৃ. ২৩৬

২৯৯ ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র), *আল-মুয়াত্তা*, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫, হাদীস নং ১৮৪৬

থাকলাম। তার পরে কে বড় ফকীহ আসেন আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। এরপর ইবনে মসউদ (রা)-এর কাছে এলাম এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিলাম।'[৩০০]

এই রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে মায়মূন এর এই উক্তি যে 'হযরত মু'আয ইবনে জাবাল এর পর আমি দেখলাম যে, সবচে বড় ফকীহ কে?' তা এ কথার প্রমাণ যে, তিনি ফিকহ এর মাসয়ালা ইত্যাদি জানার জন্যই প্রথমে মু'আয ইবনে জাবাল (রা) ও পরে ইবনে মসউদ (রা)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। কাজেই যতদিন পর্যন্ত মু'আয ইবনে জাবাল এর সাহচর্য সম্ভবপর ছিল ততাদিন ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়ে কেবল তারই কাছে শরণাপন্ন হতেন। তার ইন্তিকালের পর তিনি দেখলেন যে, সবচে বড় ফকীহ হচ্ছেন হযরত ইবনে মসউদ (রা)। এ জন্যে তিনি তার শরণাপন্ন হন। অতএব একই সময়ে একজন মাত্র ফকীহ-এর অনুকরণ বা তার কাছে রুজু হওয়া ব্যক্তি তাকলীদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাবেয়ীদের জীবন থেকে উদাহরণ

তাবেয়ীনে কেরামের জীবন থেকে জানা যায় যে, তারা কেউ কেউ একজন সাহাবীর অনুকরণ করেছেন বা অন্য কেউ আরেকজন সাহাবীর অনুকরণ করেছেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيْقَةِ فِي الْقَضَاءِ فَلْيَأْخُذْ بِقَوْلِ عُمَرَ رض

ইমাম শা'বী বলেন, যে ব্যক্তি বিচারের ক্ষেত্রে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করতে চায় তার হযরত উমর (রা)-এর মতামত অনুসরণ করা উচিত।[৩০১]

তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ এর নির্দেশ হল,

إِذَا إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ شَيْئٍ فَانْظُرُوا مَا صَنَعَ عُمَرُ فَخُذُوْهُ بِهِ

তোমরা যদি দেখ যে, লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে তাহলে দেখ এ ব্যাপারে উমর (রা) কী করেছেন। তোমরা তাকেই অনুসরণ করো।[৩০২]

ইমাম আমাশ হযরত ইবরাহীম নাখয়ীর অনুসৃত নীতি সম্পর্কে বলেন,

إِنَّهُ كَانَ لاَ يَعْدِلُ بِقَوْلِ عُمَرَ رض وَ عَبْدُ اللهِ إِذَا اِجْتَمَعَا فَإِذَا إِخْتَلَفَا كَانَ قَوْلَ عَبْد اللهِ اَعْجَبَ اِلَيْهِ

'হযরত উমর (রা) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যখন কোনো মাসআলার ব্যাপারে একমত হতেন তখন হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রা) কারো মতকে তাদের সমকক্ষ মনে করতেন না। কিন্তু যখন

---

৩০০ সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক আস-সিজিসতানী, *সুনানে আবু দাউদ*, আল-মাকতাবাতুল আসারিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি./ ২০০০ খ্রি., ১খ. পৃ-৬২; আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল, *মুসনদে আহমদ*, ৫খ. পৃ-২৩১

৩০১ ইবনুল কাইয়েম জাওযী, *এলামুল মুকেয়ীন*, দারু ইবনু জওযী, ২০০৮, ১খ. পৃ.১৫

৩০২ প্রাগুক্ত

উভয়ের মধ্যে ভিন্ন মত দেখা দিত, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদের মত গ্রহণ করাটাই তিনি অধিক পছন্দ করতেন।[৩০৩]

হযরত আবু তামীমাহ (র) বলেন,

قَدِمْنَا الشَّامَ فَاِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ يُطِيْفُوْنَ بِرَجُلٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا اَفْقَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذَا عَمَرو الْبَكَّالِيْ رض

'আমি সিরিয়ায় এসে দেখলাম, লোকেরা এক ব্যক্তিকে ঘিরে রয়েছে, তার আশপাশে ঘোরে। আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? লোকেরা জবাব দিল যে, ইনি হচ্ছেন নবী করিম (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাদের মাঝে সবচে বড় ফকীহ। অর্থাৎ উমর আল বাকালী।[৩০৪]

ইমাম মোহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী বলেন,

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ لَهُ أَصْحَابٌ مَعْرُوْفُوْنَ حَرَّرُوْا فَتَايَاهُ وَمَذَاهِبَهُ فِيْ الْفِقْهِ غَيْرَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ يَتْرُكُ مَذْهَبَهُ وَ قَوْلُهُ لِقَوْلِ عُمَرَ رض وَكَانَ لاَ يَكَادُ يُخَالِفُهُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ وَيَرْجِعُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَقَالَ الشَّعْبِي كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَقْنُتُ وَقَالَ وَلَوْقَنَتَ عُمَرُ لَقَنَتَ عَبْدُ اللهِ رض.

'হযরত ইবনে মসউদ ছাড়া আর কোনো সাহাবীর স্বনামধন্য শিষ্য ছিল না। ফলে তাঁদের ফতোয়া ও ইজতিহাদ (আগাগোড়া) বিন্যস্ত ও গ্রন্থিত করা সম্ভব হয়নি। ইবনে মসউদই একমাত্র ব্যতিক্রম। তা সত্ত্বেও নিজস্ব ইজতিহাদের পরিবর্তে হযরত উমর (রা)-কেই তিনি অনুসরণ করতেন। পারতপক্ষে হযরত উমর (রা)-এর কোনো ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেননি। বরং নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তাঁর মতামতই মেনে নিতেন। ইমাম শা'বি বলেন, ইবনে মসউদ কুনুত পড়তেন না। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, হযরত উমর (রা) কুনুত পড়লে তিনি অবশ্যই পড়তেন।[৩০৫] এই হল সাহাবা যুগে ব্যক্তি তাকলীদের নমুনা।

মোটকথা আলোচিত উদাহরণ ও রেওয়ায়াতগুলোর দ্বারা এ কথাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাকলীদের উভয় প্রকার তাকলীদ অর্থাৎ ব্যক্তি তাকলীদ ও সাধারণ উন্মুক্ত তাকলীদ সাহাবায়ে কেরামের বরকতময় যুগে প্রচলিত ছিল। মূল কথা হলো, যে লোক কুরআ'ন ও হাদীস থেকে মূলনীতির আলোকে সরাসরি শরী'আর হুকুম-আহকাম উদঘাটন করার যোগ্যতা রাখে না, এমন ব্যক্তির জন্য সাধারণ উন্মুক্ত ও ব্যক্তি তাকলীদ তথা উভয় প্রকার তাকলীদ জায়েয। যেমন হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) বলেন,

---

৩০৩ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ.১৩-১৪

৩০৪ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ.১৬

৩০৫ হক্কী ইসমাঈল আব্দুল ইলাহ, *ফিকহুল ইমামুয্ যুহরী ওয়া মানহাজুহু ফীহে*, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৭/২০০৬, পৃ. ৫৫

وليس محله فيمن لا يدين الا بقول النبى صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد حلالا الا ما احله الله ورسوله ولا حراما الا ماحرمه الله ورسوله لكن لما لم يكن له علم بما قاله النبى صلى الله عليه وسلم ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ولا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالما راشدا على انه مصيب فيما يقول ويفتى ظاهرا متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خالف ما يظنه اقلع من ساعته من غير جدال و لا اصرار فهذا كيف ينكره احد أن الاستفتاء والافتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين أن يستفتى هذا دائما او يستفى هذا حينا وذالك حينا بعد أن يكون مجمعا على ما ذكرناه

'আর (তাকলীদের নিন্দায় যেসব কথাবার্তা বলা হয়েছে) তা সেই লোকের উপর প্রযোজ্য নয়, যে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছাড়া অন্য কিছুকে দলিল হিসেবে মানে না এবং যে বিশ্বাস করে যে, হালাল কেবল ঐ জিনিস, যাকে আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) হালাল সাব্যস্ত করেছেন আর হারাম বলতে সে জিনিসকে বুঝায় যা আল্লাহ তা'আলা ও নবী করিম (সা)-এর পক্ষ হতে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু নবী করিম (সা)-এর বাণীসমূহ অনুধাবনের জ্ঞান তার নেই, তথা নবী করিম (সা)-এর বাণীসমূহের মাঝে দৃশ্যমান বৈপরিত্যের মাঝে সমন্বয় তার জানা নেই, কিংবা নবী করিম (সা)-এর বাণী থেকে হুকুম-আহকাম উদ্ঘাটনের পদ্ধতিও তার জানা নেই, এ জন্যে সে এই মর্মে কোনো হেদায়তপাপ্ত আলেমের অনুসরণ করেন যে, এই আলেম (তার তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিচারে) তার কথাবার্তায় সঠিক ও বাহ্যত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতের অনুসারী। যদি তার এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য না করে তার অনুকরণ-অনুসরণ ত্যাগ করবে; তাহলে এ ধরনের তাকলীদের কেউ বিরোধিতা করতে পারে না। কারণ ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা ও ফতোয়া দেয়ার ধারাবাহিকতা তো নবী করিম (সা)-এর যমানা থেকে চলে আসছে। (যেহেতু কারো কাছ থেকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা জায়েয সাব্যস্ত হল, সেহেতু) এ কথার মধ্যে কোনো ফারাক নেই যে, লোকে সবসময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে, (যাকে ব্যক্তি তাকলীদ বলা হয়) কিংবা কখনো এক ব্যক্তির কাছ থেকে বা কখনো অন্য লোকের কাছ থেকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে (যাকে উন্মুক্ত তাকলীদ নামে আখ্যায়িত করা যায়); তবে ফতোয়া দাতার মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাদি বিদ্যমান থাকতে হবে।[৩০৬]

৩০৬ শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি. ১খ. পৃ. ১৫৬ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ, মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলী, ১৩৪৪ হি; পৃ.৩৯

ব্যক্তি তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের আলোচনায় এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী করিম (সা)-এর যমানা থেকে কল্যাণময় তিন যুগে উভয় প্রকার তাকলীদের ধারা বিদ্যমান ছিল এবং তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি তাকলীদ হোক কিংবা তাকলীদে মুতলাক (উন্মুক্ত তাকলীদ) হোক তাকলীদের সব কটি ধরন জায়েয।

তবে আমাদের বিদগ্ধ ফকীহগণের উপর আল্লাহর অফুরন্ত রহমত অবারিত হোক, যারা তাদের সময়ের শিরা উপশিরার স্পন্দন বুঝতেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যুগের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপর নজরদারী রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারা উম্মাহর এক বিরাট 'সমাজ-শৃংখলার কল্যাণচিন্তা থেকে উভয় প্রকার তাকলীদের মধ্য হতে কেবল ব্যক্তি তাকলীদকে আমলের জন্য বাছাই করে নেন এবং এই যুগান্তকারী ফতোয়া জারি করেন যে, সবাইকে এখন ব্যক্তি তাকলীদের উপর আমল করতে হবে। কখনো এক ইমামের কখনো আরেক ইমামের তাকলীদের পরিবর্তে কোনো একজন নির্দিষ্ট ইমাম নির্ধারণ করে তার মাযহাবকে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে।

যে 'সমাজ-শৃংখলার কল্যাণচিন্তা'র কথা বলা হল, তার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথমে এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, هواء নফস বা প্রবৃত্তিপূজা এমন এক জঘন্য গোমরাহী, যা কখনো মানুষকে কুফরির দ্বারপান্তে নিয়ে যায়। এ কারণেই কুরআ'ন মাজীদ অসংখ্য জায়গায় কুপ্রবৃত্তির অনুকরণ-অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করেছে। বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে যে, খবরদার! প্রবৃত্তিপূজার এই রোগ যেন তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়। কুরআ'ন মাজীদ ও হাদীস শরীফের বিপুল বর্ণনা রয়েছে, যেখানে প্রবৃত্তি পূজার নিন্দা ও তা থেকে বেঁচে থাকার উপর জোর তাকিদ রয়েছে।

প্রবৃত্তি পূজার একটি ধরন তো হল, মানুষ মন্দ কাজকে মন্দ বলেই জানে, গুনাহকে গুনাহ বলেই গণ্য করে; কিন্তু নফসের কামনা-বাসনায় বাধ্য হয়ে সেই মন্দ ও গুনাহের কাজ করে বসে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কাজটি বড় ধরনের অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তা অতখানি মারাত্মক নয়। তার কারণ, এ ধরনের পরিস্থিতিতে এই আশা বিদ্যমান থাকে যে, মানুষ কোনো এক সময় নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তওবা করবে ও অন্যায় থেকে ফিরে আসবে।

এর বিপরীতে প্রবৃত্তি পূজার আরেকটি ধরন হল, মানুষ নফস বা প্রবৃত্তির অনুকরণ করতে গিয়ে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে, এক পর্যায়ে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল হিসেবে গণ্য করতে থাকে, দ্বীন ও শরী'আ তখন তার কাছে খেলনায় পরিণত হয়। প্রবৃত্তি পূজার এই দ্বিতীয় ধরনটি প্রথম ধরনটির চেয়ে অনেক মারাত্মক, জঘন্য ও ভয়ঙ্কর। যে কাজই মানুষকে এ ধরনের প্রবৃত্তিপূজায় নিপতিত করতে পারে তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা চাই।

সম্মানিত ফকীহগণ ঠিকই অনুভব করেন যে, লোকদের মধ্যে দ্বীনদারীর মানদণ্ড দিনের পর দিন দুর্বল হচ্ছে, সতর্কতা ও তাকওয়ার চেতনা উঠে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে যদি উম্মুক্ত তাকলীদের দরজা খোলা থাকে, তাহলে অনেক লোক জেনে বুঝে এবং অনেক লোক মনের অজান্তে প্রবৃত্তিপূজায় নিপতিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ কারো শরীর থেকে রক্ত বের হলে ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে অযূ ভেঙ্গে যায় আর ইমাম শাফেয়ীর মতে অযূ ভাঙে না,

শীতের মওসুমে কোনো প্রবৃত্তিপূজারী যদি নিজের আরাম আয়েশের কথা চিন্তা করে ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের অনুসরণ করে নতুন অজু না করে নামায পড়বে। পরক্ষণে সেই লোক যদি কোনো মহিলাকে স্পর্শ করে তাহলে ইমাম শাফেয়ীর মতে তার অযূ ভেঙে যাবে, আর ইমাম আবু হানিফার মতে তার অযূ ভাঙবে না তখন প্রবৃত্তিপূজারীকে আরাম আয়েশের চিন্তা উদ্বুদ্ধ করবে যে, এ মুহূর্তে তুমি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর অনুকরণ কর। সে তখন নতুন উযূ না করেই নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। মোটকথা যখন যে ইমামের মাযহাবে তার জন্য সুযোগ সুবিধা থাকবে, আরাম আয়েশের চাহিদা পূরণ হবে, সে সেই মাযহাবের অনুকরণ করবে আর যে মাযহাবের মধ্যে তার আপাত ক্ষতি আছে বলে মনে করবে বা নিজের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির চাহিদা কুরবানী দেয়ার প্রশ্ন আসবে সে মাযহাব তখন সে ত্যাগ করবে। অবস্থা এমনও হবে যে, সে নিজের মতকে শক্তিশালী করার জন্য দলিল সাজানো চেষ্টা করবে। এ কাজ তার জন্য খুব সহজ বলে মনে হবে। এভাবেই সে মনের অজান্তে প্রবৃত্তিপূজায় পতিত হয়ে যাবে।

আমাদের আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নির্দিষ্ট মাযহাবের আওতায় না হলে শরী'আর হুকুম-আহকাম প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার কাছে খেলনায় পরিণত হবে। আর এটি এমন এক কাজ ও পরিস্থিতি, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোনে মুসলমান মতবিরোধ করেনি। খোদ ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এসব বিষয়ের মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতির কথা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন,

وَقَدْ نَصَّ الْاِمَامُ اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلىَ أَنَّهُ لَيْسَ لِاَحَدٍ أَنْ يَعْتَقِدَ الشَّيْءَ وَاجِباً اَوْ حَرَامًا ثُمَّ يَعْتَقِدُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ اَوْ مُحَرَّمٍ بِمُجَرَّدِ هَوَاه مِثْلُ أَنْ يَكُوْنَ طَالِباً لِشُفْعَةِ الْجِوَارِ يَعْتَقِدُهاَ أَنَّهاَ حَقٌّ لَهُ ثُمَّ إِذاَ طُلِبَتْ مِنْهُ شُفْعَةَ الجِوَارِ اِعْتَقَدَهاَ أَنَّهَا لَيْسَتْ ثَابِتَةً اَوْ مِثْلُ مَنْ يَعْتَقِدُ أِذاَ كَانَ اَخاً مَعَ جَدٍ أَنَّ الْاِخْوَةَ تُقَاسِمُ الْجَدَّ فَإِذاَ صَارَ جَداً مَعَ اَخٍ اِعْتَقَدَ اَنَّ الْجَدَّ لاَ تُقَاسِمُ الْاِخْوَةَ فَمِثْلُ هَذاَ مِمَّنْ يَكُوْنُ فِيْ اِعْتِقَادِهِ حَلُّ الشَّيِ وَ حُرْمَتِهِ وَ وُجُوْبِهِ وَ سُقُوْطِهِ بِسَبَبِ هَوَاهُ هُوَ مَذْمُوْمٌ مَجْرُوْحٌ خَارِجٌ عَنِ الْعَدَالَةِ وَقَدْ نِصَّ اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ هَذاَ لاَيَجُوْزُ.

'ইমাম আহমদ ও অন্যান্যদের দৃঢ় অভিমত হল, নিছক প্রকৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়কে ওয়াজিব বা হারাম দাবি করে পর মুহূর্তে বিপরীত কথা বলার অধিকার কারো নেই। যেমন প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে শোফার অধিকার দাবি করার মতলবে কেউ বলল, (ইমাম আবু হানিফার মতে তো) শোফা একটি শরী'আসম্মত অধিকার। কিন্তু পরে যখন তার বিপক্ষে শোফার দাবি উঠল তখন বেমালুম সুর পাল্টিয়ে বলতে লাগল যে, (ইমাম শাফেয়ীর মতে তো) প্রতিবেশিতা সূত্রে কারো শোফার অধিকার দাবি করার অধিকার নেই।

তদ্রুপ, ভাই ও দাদার জীবদ্দশায় কারো মুত্যু হল, অমনি ভাই দাবি জুড়ে দিল যে, (অমুক ইমামের মতে) দাদার সাথে ভাইও মিরাসের অংশীদার। কিন্তু যখন তিনি দাদা হলেন আর নাতি ভাই রেখে মারা গেলেন তখন তিনি বলতে লাগলেন যে, (অমুক ইমামের মতে) দাদার জীবদ্দশায় ভাই অংশ পায় না। মোটকথা নিজের স্বার্থচিন্তা থেকে শরী'আর কোনো বিষয়ে হারাম, হালাল, ওয়াজিব বা অ প্রয়োজনীয় মনে করা খুবই

নিন্দনীয় গর্হিত ও ইনসাফের বরখেলাফ। ইমাম আহমদ ও অন্যরা বলেছেন যে, এমনটি করা জায়েয নেই।[৩০৭]

ইবনে তাইমিয়া অন্যত্র লিখেছেন, এ ধরনের উদাহরণ হচ্ছে:

يكونون فى وقت يقلدون من يفسده وفى وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الآيمة

'কোনো বিবাহের ব্যাপারে স্বার্থের অনুকূল হলে সেই ইমামের তাকলীদ করে, যিনি বিবাহ অশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেন আর কখনো স্বার্থের পরিপন্থী হলে সেই ইমামের তাকলীদ করে, যিনি বিবাহ শুদ্ধ বলে মত দেন। ইমামদের সর্বসম্মত মত হল, এ ধরনের তাকলীদ সম্পূর্ণ হারাম, (কেননা, তা শরী'আ ও ধর্মকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করার সমান)।[৩০৮]

মোটকথা, প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে একেক সময় একেক ইমামের ফতোয়ার উপর আমল করা কুরআ'ন সুন্নাহর দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। এখানে আমরা আর সবাইকে বাদ দিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য তুলে ধরা যথেষ্ট মনে করছি। কেননা, ব্যক্তি তাকলীদের বিরোধীরা কথায় কথায় ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দোহাই দিয়ে থাকেন। তদুপরি তিনি নিজের ব্যক্তি তাকলীদের সমর্থক নন। অথচ তিনিই উম্মাহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে স্বীকার করছেন যে, এ জাতীয় দ্বিচারিতার কর্মকান্ড জায়েয নাই।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের যমানায় যেহেতু মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা প্রবল ছিল, সেহেতু তখন উন্মুক্ত তাকলীদের ক্ষেত্রে এই আশংকা ছিল না যে, লোকেরা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কখনো এক ইমামের আবার কখনো অন্য ইমামের তাকলীদ করবে শরী'আ পালনের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী হয়ে। এ জন্যে সেই যুগে উন্মুক্ত তাকলীদের উপর ব্যাপকভাবে আমল হচ্ছিল। আর তাকে কোনো রকম দোষনীয় মনে করা হয়নি।

কিন্তু পরবর্তীকালে ফকীহগণ যখন দেখলেন যে, ধার্মিকতার মান দিনের পর দিন কমতে আছে এবং মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুকরণের প্রবণতা প্রবল, তখন তারা উপরোল্লিখিত শৃঙ্খলা বিধানের স্বার্থে ফতোয়া দেন যে, এখন লোকদেরকে কেবলা ব্যক্তি তাকলীদের ভিত্তিতে আমল করতে হবে। উন্মুক্ত তাকলীদের পথ পরিহার করা চাই। এটি কোনো শরী'আর বিধান ছিল না; বরং তা ছিল শৃঙ্কলাবিধায়ক ব্যবস্থা ও ফতোয়া। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা ইমাম নববীও ব্যক্তি তাকলীদ ওয়াজিব হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে লিখেছেন-

ووجه أنه لو جاز اتباع اى مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه و يتخير بين التحليل و التحريم و الوجوب الجواز وذالك يؤدى الى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الاول فانه لم

৩০৭ আহমদ ইবনে তাইমিয়া, *ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম*, ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪২৫/২০০৪,, ২খ. পৃ. ২৩৭

৩০৮ প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ২৮৫-৮৬

تكن المذاهب التوافية باحكام الحوادث مهذبة وعرفت فعلى هذا يلزمه ان يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين.

'(তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি তাকলীদ আবশ্যক হওয়ার) কারণ হল, যদি এ ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয় যে, মানুষ ইচ্ছামত যে ফকীহ এর মাযহাবের অনুকরণ করতে চায় করতে পারবে, তার ফল দাঁড়াবে, লোকেরা প্রত্যেক মাযহাবের সহজ সহজ মাসয়ালাগুলো খুঁজে বেড়াবে আর প্রবৃত্তির কামনা অনুযায়ী তার উপর আমল করবে। তখন হালাল, হারাম, ওয়াজিব, জায়েয সব ধরনের হুকুম-আহকাম নির্ণয়ের অধিকার ব্যক্তির নিজের হাতে এসে যাবে। শেষ পর্যন্ত শরী'আর হুকুম-আহকাম পালনের বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ উঠে যাবে। অবশ্য ইসলামের প্রথম যুগে ব্যক্তি তাকলীদ এ কারণে সম্ভব ছিল না যে, ফিকহগত মাযহাবসমূহ পরিপূর্ণরূপে বিন্যস্ত ও প্রসিদ্ধ ছিল না (কাজেই আজ যেখানে ফেকহী মাযহাবসমূহ সুবিন্যস্ত ও সুপরিচিত হিসেবে বিদ্যমান আছে সেহেতু) এখন প্রত্যেকের উপর কর্তব্য হল, চেষ্টা করে কোনো না কোনো মাযহাব খুঁজে নেবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করবে।[৩০৯]

ইমাম নববী (র) তার এই বক্তব্যে যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন তা হল, যদি এ ব্যাপারে লাগাম ছেড়ে দেয়া হয় যে, যে কেউ ইচ্ছা করবে, যখন যে মাযহাব বা ইমামকে পছন্দ হবে, তার অনুসরণ করবে তার ফলশ্রুতি এই দাঁড়াতে পারে যে, হালাল-হারাম একাকার হয়ে যাবে। শরয়ী হুকুম-আহকামের পাবন্দি বা বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ উঠে যাবে। আল্লামা তাকী উসমানী বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত হাজার হাজার ফকীহ ও মুজতাহিদ জন্ম গ্রহণ করেছেন। অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন যে, প্রত্যেক ফকীহ এর মাযহাবে এমন কিছু সহজতা আছে যা অন্য মাযহাবে নেই। এ ছাড়া মুজতাহিদ ফকীহগণের তো এমন নিশ্চয়তা নেই যে, তারা ভুলত্রুটির উর্ধ্বে। তাই প্রত্যেক মুজতাহিদের মাসয়ালায় এমন কিছু বিষয় আছে যা বৃহত্তর উম্মার চিন্তার পরিপন্থী। কাজেই যদি মুক্ত তাকলীদের দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেয় হয়, আর লোকেরা মুজতাহিদদের বাতলানো সহজ প্রকৃতির মাসয়ালাগুলো সন্ধান করে তার অনুসরণ শুরু করে দেয়, তাহলে পরিণতি সেটিই হবে, যে পরিণতির আশংকা আল্লামা নববী শরয়ী আহকামের পাবন্দি উঠে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশ করছিলেন।

যেমন ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে দাবা খেলা জায়েয, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি গান বাজনা জায়েয মনে করতেন।[৩১০]

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে বর্ণিত যে, তিনি আলোকচিত্রের ছবিগুলোকে তিনি জায়েয মনে করতেন।[৩১১]

---

৩০৯ ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইবনে শারাফ আন নববী, *আল মাজমু' শারহিল মাযাহিব,* মাকতাবাতুল ইরশাদ, নতুন সংস্করণ, ২০০৮, ১খ. পৃ.-৯১

৩১০ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল হুসাইনী আয-যুবাইদী, *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন বিশারহে ইহয়াউ উলুমিদ্দীন,* মাতবা আল মায়মানিয়া, ১৩১১ হিজরি, ৬খ. পৃ-৪৫৮-৪৫৯

ইমাম 'আমাশ এর উক্তি বলে বলা হয় যে, তার মতে রোযার শুরু ভোরবেলা শুরু হওয়ার পরিবর্তে সূর্য উদয়ের পর থেকে গণ্য হয়।[৩১২]

হযরত আতা ইবনে আবি রেবাহ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, জুমার দিনে যদি পদের দিন হয় তাহলে জুমা ও জোহর উভয় নামায মওকুফ হয়ে যাবে এবং আসর পর্যন্ত কোনা ফরয নামায নেই।[৩১৩]

দাউদ যাহেরী ও ইবনে হাযাম মতামত দিয়েছেন যে, যদি কোনো মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তবে তার নগ্ন শরীর দেখাও জায়েয।[৩১৪]

ইবনে সাহনূন প্রমূখের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা নাকি জায়েয মনে করতেন।[৩১৫]

এই উদ্ধৃতিগুলো আল্লামা তাকী উসমানীর 'তাকলীদ কি শরয়ী হাইসিয়াত' গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন যে, এখানে মাত্র কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করা হল, অন্যথায় ফিকহ ও হাদীসের কিতাবসমূহে এ ধরনের ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে। তিনি উপসংহার টেনে বলেন, যদি উন্মুক্ত তাকলীদের সাধারণ অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রত্যেককে অধিকার দেয়া হয় যে, যখন যে ইমামের মাসয়ালা পছন্দ হবে তার তাকলীদ করতে পারবে, তাহলে এ জাতীয় বক্তব্য ও মাসয়ালাগুলো একত্র করলে এমন একটি জগাখিছুড়ি মাযহাব বানানো যাবে, যার নির্মাতা হবে প্রবৃত্তি ও শয়তান। অথচ ধর্মকে এভাবে খেলনার বস্তুতে পরিণত করা কোনো মাযহাবের দৃষ্টিতেই জায়েয নয়। যেমন হযরত মুয়াম্মার (র) বলেন যে,

لو أن رجلا أخذ بقول اهل المدينة فى استماع الغناء و اتيان النساء فى ادبارهن و بقول اهل مكة فى المتعة و الصرف و بقول اهل الكوفة فى المسكر كان شر عباى الله

'কেউ যদি গান শোনা এবং গূহ্যদ্বারে স্ত্রী সঙ্গমের ব্যাপারে কাতপয় মদীনাবাসী ফকীহর মত গ্রহণ করে আর মোতা বিয়ে (সাময়িক চুক্তিভিত্তিক বিয়ে)-এর ব্যাপারে কতিপয় মক্কাবাসী ফকীহর মত অনুসরণ করে এবং

---

৩১১ আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইবনে শরফ নববী, *শরহে নববী আলা মুসলিম*, দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ২০১০, ২খ. পৃ. ১৯৯

৩১২ আল্লামা আলুসী বাগদাদী, *তাফসীরে রূহুল মাআনী*, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫, ২খ. পৃ. ৬৭, সূরা বাকারা, ১৮৭ আয়াত প্রসঙ্গ

৩১৩ ইয়াহয়া ইবনে শরফ আন নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লোগাত*, দারুল কুতুবিল ইসলমিয়া, বৈরুত ২০০৮, ১খ. পৃ ৩৩৪

৩১৪ আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, *তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে আত-তিরমিযী*, মুআসসিসাতুর রিসালা, কায়রো ২০১৫, ২খ. পৃ. ১৭০; ফাতহুল মুলহিম, ৩খ. পৃ-৪৭৬

৩১৫ হাফেয আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী, *তালখীসুল হাবীর*, মাকতাবা কারতুবা, ১৯৯৫, ৩খ. পৃ-১৭৬-১৭৭

নেশাদ্রব্যের বিষয়ে কতিপয় কুফাবাসীর মতামত অনুসারে আমল করে সে আল্লাহর নিকৃষ্টতম বান্দারূপে চিহ্নিত হবে।'[316]

ব্যক্তি তাকলীদ থেকে মুক্ত ভেবে কেউ যদি নিজের জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে যখন যে মাযহাব সুবিধা মনে হয় তার অনুসরণ করে তার নিকৃষ্ট উদাহরণ হল এ কয়টি বিষয়। যদি জনসাধারণকে ব্যক্তি তাকলীদ হতে মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাহলে অতি সাধারণ বিষয়েও জানা-অজানায় নিজের কামনা-বাসনার অনুসরণে প্রলুব্ধ হবে।

এই বাস্তবতার ভিত্তিতে পরবর্তী যুগের ফকীহগণ বলেছেন যে, শরী'আর হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ইমাম বা মাযহাবকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। যাতে শরী'আর হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদকে অনুসরণ করে এবং যাতে হালাল-হারাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নফসানী কামনা-বাসনা ও দুষ্টচিন্তার কোনো সুযোগ বন্ধ থাকে। ফকীহগণ ব্যক্তি তাকলীদ বা নির্দিষ্ট একজন ইমামের অনুসরণ করার ব্যাপারে যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন তার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি আল্লামা ইবনুল হুমাম এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এভাবে-

والغالب أن هذه الالتزامات لكف الناس عن تتبع الرخص

'মূলকথা হচ্ছে, এসব বাধ্যবাধকতা আরোপ করার কারণ হচ্ছে, লোকদেরকে নফস বা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ভিত্তিতে সুযোগ সন্ধানী প্রবণতা থেকে বাধা দেয়া।'[৩১৭]

আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞানের জনক আল্লামা ইবনে খালদূন ব্যক্তি তাকলীদের নিরংকুশ প্রসার এবং চার মাযহাবের মধ্যে শরী'আর অনুকরণ করার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

ووقف التقليد فى الامصار عند هولاء الاربعة و درس المقلدون لمن سواهم و سد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات فى العلوم و لما عاق عن الوصول الى رتبة الاجتهاد ولما خشى من اسناد ذالك الى غير اهله و من لا يوثق برأيه و لا بدينه فصرحوا بالعجز و الاعواز و ردوا الناس الى تقليد هؤلاى كل من اختص به من المقلدين و حظروا ان يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب.

'সব শহরে তাকলীদ এই চার মাযহাবের ইমামগণের তাকলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অন্য ইমামদের অনুসারী নাই। লোকেরা (এই ইমামদের দ্বারা) মতবিরোধের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এর একটি কারণ ছিল, জ্ঞানের পরিভাষাগুলো জটিল আকার ধারণে করে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে ইজতিহাদের স্তর পর্যন্ত পৌছা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। আরেকটি কারণ ছিল, ইজতিহাদ অযোগ্য লোকদের কব্জায় গিয়ে পড়ার

---

৩১৬ প্রাগুক্ত, ৩খ. পৃ-১৮৭, কিতাবুন নিকাহ; শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র),*ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ*, মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলী, ১৩৪৪ হি;, পৃ-৬২

৩১৭ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রউফ আল-মানাবী, *ফয়জুল কদীর শরহে জামেউস সাগীর*, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৯৭১, , ১খ. পৃ-২১

আশংকা দেখা দিয়েছিল। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এমন এমন লোক ইজতিহাদকে কাজে লাগাতে শুরু করেছিল, যাদের মতামত ও দ্বীনদারীর উপর নির্ভর করা যাচ্ছিল না।

এ কারণে আলেমগণ ইজতিহাদ করার ব্যাপারে নিজেদের অপারগতার কথা অকপটে স্বীকার করে জনসাধারণকে ঐ চার মাজহাবের যে কোনো একটির তাকলীদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন যে, এই চার ইমামের মেধ্য বদল বদলি করে অনুকরণ করা যাবে না। (অর্থাৎ কখনো এই ইমামের অনুকরণ আর কখনো অপর ইমামের অনুকরণ করা যাবে না।) কারণ, এ ধরনের কিছু করার মানে হবে ধর্মকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করা।[৩১৮]

মোটকথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের যুগে দ্বীনদারী সর্বত্র বিরাজিত ছিল, যার উপর নির্ভর করা ও আস্থা রাখা যেত। হযরত নবী করিম (সা)-এর সুহবতের ফয়য ও বরকতে তাদের নাফসানিয়ত এতখানি অবদমিত ছিল যে, বিশেষ করে শরীয়ার অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মনের কামনা-বাসনার অনুসরনের আশংকা ছিল না। এ কারণে তাদের যমানায় ব্যক্তি তাকলীদ ও উন্মুক্ত তাকলীদ উভয় ধারা অনুসরণ করা হচ্ছিল। পরবর্তীতে যখন এই জঘন্য আশংকাটি মাথাছাড়া দিয়ে উঠল, অর্থাৎ মানুষের মাঝে সুযোগ সন্ধানী মনোভাব, নফসের কামনা-বাসনার আসক্তি ব্যাপক রূপ লাভ করল, তখন শরী'আর হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তাকলীদের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হল। যদি এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা না হত তাহলে শরী'আর হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে এমন লাগামহীনতার বিস্তার ঘটত যার ভয়াবহতা কল্পনায় আনাও কঠিন।

বিষয়টিকে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) সঠিকভাবে নির্ণয় করেছেন। তিনি বলেন,

واعلم ان الناس كانوا فى المائة الولى والثانية غير مجتمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه و بعد المائتين ظهر فيهم الذهب للمجتهدين باعيانهم و قل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه ذا هو اواجب فى ذالك الزمان.

'প্রকাশ থাকে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দিতে সবাই কোনো একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের (অর্থাৎ ব্যক্তি তাকলীদের) ব্যাপারে সংঘবদ্ধ ছিলেন না। দ্বিতীয় শতাব্দির পর তাদের মধ্যে একজন মুজতাহিদকে নির্দিষ্ট করে তার মাযহাবের উপর আমল করার রেওয়ায চালু হয়। ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে সময় এমন লোক খুব কমই পাওয়া যেত যে কোনো নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাবের উপর আস্থাশীল ছিল না। আর এই যুগে এই বিষয়টিই ওয়াজিবে পরিণত হয়েছে।'[৩১৯]

---

৩১৮ ওলীউদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদূন, *মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন*, মুদ্রণে: মাকতারা তেজারিয়া কুবরা, মিশর ২০১৩, পৃ-৪৪৮, ১খ, বাব-৬, অধ্যায়-৭

৩১৯ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *আল-ইনসাফ ফি বয়ানে সবীলিল ইখতিলাফ*, দারুন নাফায়েস, বৈরুত, ১৯৮৬, পৃ: ৫৭-৫৮

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র)-এর এই বক্তব্যে কারো মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের যমানায় যে বিষয়টি জরুরী বলে গণ্য হত না, পরবর্তীতে কীভাবে তাকে আবশ্যকীয় গণ্য করা যাবে? এই আপত্তির অতি সুন্দর জবাব দিয়েছেন শাহ সাহেব,

قلت الواجب الاصلى هو ان يكون فى الامة من يعرف الاحكام الفرعية من ادلتها التفصيلية اجمع على ذالك اهل الحق ومقدمة الواجب واجبة فاذا كان للواجب طرق متعددة وجب تحصيل طريق من تلك الطرق من غير تعيين واذا تعين له طريق واحد وجب ذالك الطريق بخصوصه ... وكان السلف لا يكتبون الحديث واجبة ثم صار يومنا هذا كتابة الحديث واجبة لان رواية الحديث لا سبيل لها اليوم الا معرفة هذه الكتب وكان السلف لا يشغلون بالنحو و اللغة وكان لسانهم عربيا لا يحتاجون الى هذه الفنو ثم صار يومنا هذا معرفة اللغة العربية واجبة لبعد العهد عن العرب الاول وشواهد ما نحن فيه كثيرة جدا وعلى هذا ينبغى ان يقاس وجوب التقليد لامام بعينه فانه قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا.

'এই আপত্তির জবাবে আমি বলতে চাই যে, আসলে উম্মতের মধ্যে এমন লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা শরী'আর শাখাগত হুকুম-আহকাম বিস্তারিত দলিল ও উৎস সহকারে জানেন। (যাতে সাধারণ লোকেরা তার কাছ থেকে শরী'আর বিধিবিধান জেনে নিয়ে আমল করতে পারে)। এ ব্যাপারে আহলে হক আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে। এটিও সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, ওয়াজিব বিষয়ের পূর্বশর্ত বা ভূমিকাও ওয়াজিব-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কোনো ওয়াজিব পালন করার তরিকা বা পন্থা ভিন্ন থাকলে সেসব পন্থা হতে যে কোনো পন্থা গ্রহণ করলে ওয়াজিবের দাবি পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু ওয়াজিব এর উপর আমল করার তরিকা যদি মাত্র একটি হয় তাহলে সেই তরিকাটি গ্রহণ করাও ওয়াজিব।...যেমন আমাদের পূর্বসূরী (আলেম)-গণ হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন না। অথচ আমাদের যমানায় হাদীস লিপিবদ্ধ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ এখন হাদীস রেওয়ায়াতের জন্য হাদীস সংকলন গ্রন্থের সাহায্য নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এ ছাড়া আমাদের পূর্বসূরী (আলেম)-গণ আরবি ব্যাকরণের নাহু সরফ ও ভাষাতত্ত্ব শিখতে ব্যস্ত হতেন না। কারণ, তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবি। এসব বিদ্যা শিক্ষার তাদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমাদের সময়ে আরবি ভাষা শিক্ষা করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। কেননা, আমরা তো প্রথম পর্যায়ের আরব ভাষীর সাথে আমাদের ব্যবধান অনেক দূরে। এ বিষয়ের নজির আরো অনেক অনেক আছে। (যুগের পরিবর্তনে যে জিনিস আগে ওয়াজিব ছিল না তা পরে ওয়াজিব হয়ে যায়। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে ঐচ্ছিক বিষয়ও অবশ্যকর্তব্য হয়ে যায়।) কোনো নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করার বিষয়টিও এর উপর কিয়াস (অনুমান) করা উচিত। অর্থাৎ তা সময়ের ব্যবধানে কখনো ওয়াজিব আর কখনো ওয়াজিব হয় না।[৩২০]

৩২০ প্রাগুক্ত

এই মূলনীতিকে সামনে রেখে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রা) আরো বিশ্লেষণ করেছেন,

فاذا كان انسان جاهل فى بلاد الهند وما وراء النهر وليس هناك عالم شافعى ولا مالكى ولا حنبلى ولا كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه ان يقلد لمذهب ابى حنيفة و يحرم عليه ان يخرج من مذهبه لانه حينئذ يخلع من عنقه ربقة الشريعة و يبقى سدى مهملا بخلاف ما إذا كان فى الحرمين.

'কাজেই ভারত কিংবা এশিয়া মাইনরে যদি কোনো সাধারণ উম্মী লোক বাস করে এবং সেখানে কোনো শাফেঈ আলেম বা মালেকী আলেম কিংবা হাম্বলী আলেম ফকীহ অথবা এসব মাযহাবের কিতাবসমূহের মধ্য হতে কোনো কিতাব না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মাযহাবের তাকলীদ করা। তার মাযহাবের বাইরে যাওয়া তার জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে। কেননা, এমতাবস্থায় হানাফী মাযহাব বর্জন করা মানে শরী'আর বাধন হতে নিজের গর্দান বা আনুগত্য বের করে নেয়া। সে তখন ধ্বংসের স্রোতে তলিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হারামাইন শরীফাইন এলাকায় এমনটি হবে না। কেননা, সেখানে অন্যান্য মাযহাবের ফকীহ বা তাদের কিতাবাদি বিদ্যমান থাকায় যে কোনো মাযহাবের তাকলীদ করার অবকাশ রয়েছে)।'[৩২১]

উম্মী বা সাধারণ লোকদের জন্য নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ কেন জরুরী তা এই ব্যাখ্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাকলীদ না হলে প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনা করে আমল করলে হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং এই আশংকা থেকেই পরবর্তী যুগের মুজতাহিদ ইমামগণ ব্যক্তি তাকলীদের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে বিরাট ফিতনার মূলোৎপাটন করেছেন। এ ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র)-এর এ মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

وبالجملة فالمذهب للمجتهدين سرالهمه الله تعالى العلماء و جمعهم عليه من حيث يشعرون او لا يشعرون.

'মোটকথা মুজতাহিদ কেন্দ্রিক মাযহাবের তাকলীদ বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি এমন এক গোপন তথ্য, যা আল্লাহ তা'আলা ইলহামযোগে আলেমগণের অন্তরে উদ্ভাসিত করেছেন। ফলে তারা সচেতন বা অসচেতনভাবে অভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[৩২২]

মাযহাব চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার হেকমত

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) ব্যক্তি তাকলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করার পর বলেছেন যে, বর্তমান সময়ে উম্মাহর শরী'আর হুকুম-আহকাম পালনে শৃঙ্খলার প্রয়োজনে মাযহাব চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যাওয়া মানে শরী'আর গন্ডির বাইরে চলে যাওয়া। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন,

---

৩২১ প্রাগুক্ত, পৃ-৯-৭১

৩২২ প্রাগুক্ত

ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفى ذالك من المصالح ما لا يخفى لا سيما فى هذه الايام التى قصرت فيها الهمم جدا و اشربت النفوس الهوى و اعجبت كل ذى رأى برأيه.

নিঃসন্দেহে এই চার মাযহাব, যেগুলো সুবিন্যস্ত আকারে ও লিখিতরূপে বিদ্যমান রয়েছে, তার তাকলীদ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের সম্মিলিত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে যেসব কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়, বিশেষ করে এই যুগে যখন ধর্মীয় মনোবল দুর্বল হয়ে গেছে এবং লোকদের মধ্যে প্রবৃত্তি পূজার বিস্তার ঘটেছে এবং প্রত্যেকে যার যার মতের উপর দম্ভ দেখাচ্ছে (তখন এই চার মাযহাবের অনুকরণ-অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য)।[৩২৩]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) বলেন, প্রথম যুগে ব্যক্তি তাকলীদ বা কোনো নির্দিষ্ট মুজতাহিদের তাকলীদ করে শরী'আর হুকুম-আহকাম পালন করার ব্যাপারে সবার ঐক্যমত ছিল না। পরবর্তী যুগে ব্যক্তি তাকলীদের উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এবং তা-ই ওয়াজিব বা সবার জন্য বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত হয়। এর একটি উজ্জ্বল নজির ছিল হযরত উসমান (রা)-এর যমানায় কুরআ'ন সংকলনের ঘটনা। হাফেয ইবনে জরীর (র) প্রমুখের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী হযরত উসমান (রা) কুরআ'ন মজীদের ৭ টি কেরাতের মধ্যে ছয়টি কেরাতের অবসান ঘটান, কেবল কুরাইশদের পাঠ অবশিষ্ট রাখেন। কুরাইশদের বাচনভঙ্গির বরখেলাফ কুরআ'ন মজীদের যত কপি ছিল সেগুলো তিনি আগুনে ফেলে জ্বালিয়ে দেন। এর মানে হল, নবী করিম (সা)ও প্রথম দুই খলিফার যুগ পর্যন্ত লোকদের প্রত্যেকের জন্য কুরআ'ন মাজীদকে আরবের বিভিন্ন গোত্রে প্রচলিত সাতটি বাচন ভঙ্গির যে কোনো একটি বাচনভঙ্গিতে তেলাওয়াত করা জায়েয ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা) যখন দেখল যে, যদি এই অনুমতি বহাল রাখা হয়, তাহলে যুগের পরিবর্তনে ফিতনার আশংকা থেকে যাবে। কাজেই তিনি ছয়টি বাচনভঙ্গির অবসান ঘটিয়ে কেবল কুরাইশদের বাচনভঙ্গিতে কুরআ'ন তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক করে দেন।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, নবী করিম (সা)-এর যমানায় যে কাজ জায়েয সাব্যস্ত ছিল পরবর্তীতে তা না জায়েয কেন করা হল? এর জবাবে হাফেয ইবনে জরীর (র) বলেন, রাসূলে খোদার যমানা হতে উম্মতকে সাতটি বাচন ভঙ্গিতে কুরআ'ন তেলাওয়াতের নিছক অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সাত কেরাতে পড়া বাধ্যতামূলক ফরয বা ওয়াজিব কিছুই ছিল না। পরবর্তীতে উম্মত দ্বীনের কল্যাণ চিন্তা থেকে এটিই ভাল মনে করল যে, ছয় হরফ বা কেরাত খতম করে দিয়ে একটি মাত্র কেরাআত বা বাচনভঙ্গি বলবৎ রাখতে হবে। তারা যে কাজটি করেছেন তা উম্মতের জন্য ও দ্বীনের স্বার্থে করেছেন। সাত কেরাতে কুরআ'ন পড়া বহাল রাখলে ফিতনার আশংকা ছিল। সেই আশংকা থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষে হযরত উসমান (রা)-এর সিদ্ধান্তের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন ও একে স্বাগত জা নিয়েছেন। হযরত ইবনে জরীর (রা)-এর মতানুসারে এই ব্যাখ্যাটি পেশ করা হল।

হযরত উসমান (রা)-এর কুরআ'ন সংকলনের ব্যাপারে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং ইমাম মালেক (র) আল্লামা ইবনে কুতাইবা (র) ইমাম আবুল ফযল রাযী (র) ও আল্লামা ইবনে আলজযরী প্রমুখ এই দৃষ্টিভঙ্গিটি

---

৩২৩ শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা*, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি. ১খ. পৃ. ১৫৪

সমর্থন করেছেন। আর তা হল, হযরত উসমান (রা) ছয় কেরাতের অবসান ঘটান নি; বরং সাত কেরাতের সবগুলোই এখনো পর্যন্ত অকাট্য বর্ণনা পরম্পরায় বলবৎ আছে। তবে তিনি কুরআ'নুল করিমের একটি রসমুল খাত বা লিখন ও পঠনরীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।[324]

যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই ঘটনা হবে ব্যক্তি তাকলীদের ঐতিহাসিক নজির। কারণ হল, হযরত উসমান (রা)-এর আগে কুরআ'ন মাজীদ যে কোনো রসমূল খত বা লিখন রীতিতে লিপিবদ্ধ করা যেত। এমনকি বিভিন্ন মাসহাফে সূরাসমূহের বিন্যাসও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এসব ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস অনুযায়ী কুরআ'ন মাজীদ লেখা জায়েয ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা) উম্মতের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই অনুমতির অবসান ঘটান এবং কুরআ'ন মাজীদ লেখার জন্য একটি মাত্র রসমুল খত বা লিখনরীতি এবং সূরাসমূহের বিন্যাস নির্দিষ্ট করে দেন। এই সংকলনের অনুসরণ অনুকরণ বাধ্যতামূলক করে দিয়ে বাকী মাসহাফগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দেন।

যাইহোক হযরত উসমান (রা) উম্মতকে কুরআ'ন মজীদের এক কেরাতের উপর ঐক্যবদ্ধ করুন বা একটিমাত্র বাচনভঙ্গি ও সূরাসমূহের অভিন্ন বিন্যাসের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করুন, উভয় প্রকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনা তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি তাকলীদের উজ্জ্বল নমুনা। পরবর্তী তাকলীদের ক্ষেত্রেও ঠিক এ কাজটিই করা হয়। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের যমানায় কোনো এক ইমামের তাকলীদ করা ওয়াজিব ছিল না। কিন্তু ইতোপূর্বে বর্ণিত উম্মাহ ও দ্বীনের কল্যাণসমূহের কথা বিবেচনায় নিয়ে ওলামাযে কেরাম কেবল ব্যক্তি তাকলীদের বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন এবং উন্মুক্ত তাকলীদের বিষয়টি পরিত্যাগ করেছেন। কাজেই ব্যক্তি তাকলীদের উপর আমল করাকে বেদআত আখ্যায়িত করা যাবে না। কেননা, হযরত উসমান (রা)-এর ঘটনা এ কথার দলিল যে, কোনো একটি লক্ষ অর্জনের জন্য যদি উম্মতের সামনে বিভিন্ন পথ ও প্রক্রিয়ার অধিকার থাকে, তাহলে আসন্ন ফিতনা ফ্যাসাদের কথা চিন্তা করে এর মধ্য থেকে একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করে বাকী কর্মপন্থাগুলো পরিহার করতে পারবে। তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি তাকলীদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশিকিছু হয়নি।

ব্যক্তি তাকলীদ বলতে কি বুঝায়, এর স্বরূপ কী, উম্মাহর শৃঙ্খলা বিধান ও ইসলামী শরীয়াহ খেলনার পাত্রে পরিণত হওয়ার আশংকা থেকে রক্ষার জন্যে ব্যক্তি তাকলীদের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা আলোচনা করেছি। বিষয়গুলো পরিস্কার হওয়ার পর একটি প্রশ্ন সামনে আসে, তা হলো, মেনে নিলাম যে, শরী'আর হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে কোনো একজন মুজতাহিদ ইমাম বা একটি মাত্র মাযহাবকে মান্য করতে হবে। কিন্তু মাযহাব বলতে মাত্র চারটি মাযহাব বা চারজন ইমামের অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতার মধ্যে কি বৈশিষ্ট রয়েছে? মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তো অনেক মুজতাহিদের আবির্ভাব হয়েছিল। যেমন হযরত সুফিয়ান সূরী (র), ইমাম আউযায়ী (র), আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র), ইসহাক ইবনে রাহবিয়া (র) ইমাম বুখারী (র). ইবনে আবি লাইলা (র) ইবনে শুবরমা (র) হাসান ইবনে সালেহ (র) প্রমুখ অন্তত বিশজন প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদ আলেমে দ্বীন ছিলেন। তাদের মধ্যে কারো তাকলীদ করা যাবে না কেন?

---

৩২৪ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী*, দারুল কুতুবিস সালাফিয়া, কায়রো ২০১৫, ৯খ. পৃ, ২৫-২৬

এর জবাব হল, তাদের তাকলীদ না করার বিষয়টি এক ধরনের অপরাগতা। এই অপারগতা হল, তাদের ফেকহী মাযহাব সুবিন্যস্ত আকারে বিদ্যমান নেই। যদি তাদের মাযহাবও চার ইমামের মাযহাবের মতো সুবিন্যস্ত আকারে বিদ্যমান থাকত তাহলে তাদের যে কোনো মাযহাবেরও তাকলীদ করা যেত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল, তাদের মাযহাবের সুবিন্যস্ত কিতাবাদি যেমন পাওয়া যায় না, তাদের মতানুসারী বিজ্ঞ আলেমেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কাজেই তাদের মাযহাবের তাকলীদ করার কোনো পথ খোলা নেই। প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা আব্দুর রউফ মানাবী হাফেয যাহবী সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

ويجب علينا أن الائمة الاربعة والسفيانين و الاوزاعى و داؤد الظاهرى و اسحاق بن راهويه وسائر الائمة على هدى ...وعلى غير المجتهد ان يقلد مذهبا معينا ... لكن لا يجوز تقليد الصحابة وكذا التابعين كما قاله امام الحرمين من كل من لم يدون مذهبه فيمتنع تقليد غير الاربعة فى القضاء والافتاء لان المذاهب الاربعة انتشرت و تحررت حتى ظهر تقييد مطلقها و تخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض وقد نقل الامام الرازى رحمه الله تعالى اجماع المحققين على منع العوام من تقليد اعيان الصحابة و اتباعهم اكابرهم.

'কারণ এই এতেকাদ পোষণ করা আমাদের উপর ওয়াজিব যে, চার ইমাম, দুই সুফিয়ান (অর্থাৎ সুফিয়ানে সূরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা) ইমাম আওযায়ী, দাউদ যাহেরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং সকল ইমাম হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত।... আর যে ব্যক্তি নিজে মুজতাহিদ নয়, তার উপর কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব। ...কিন্তু ইমামুল হারামাইন এর মত অনুযায়ী সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং ঐসব ইমামের তাকলীদ করা জায়েয নয়, যাদের মাযহাব সুবিন্যস্ত হয়নি। কাজেই বিচার ও ফতোয়া দেয়ার বেলায় চার মাযহাব এর ইমামগণ ছাড়া অন্য কারো তাকলীদ করা জায়েয নয়। কারণ হচ্ছে, চার মাযহাব সুবিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব মাযহাবের পরিভাষার সীমারেখা ও সাধারণ শব্দমালার প্রয়োগ ক্ষেত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে। এটি অন্যান্য মাযহাবের বিপরীত। কারণ, ওগুলোর অনুসারী অবশিষ্ট নেই। ইমাম রাযী (রা) এই কথার উপর গবেষক আলেমগণের ইজমা (ঐক্যমত)-এর কথা বর্ণনা করেছেন যে, সাধারণ লোকদেরকে প্রখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য বুযর্গানের অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে হবে।[৩২৫]

আল্লামা নববী (র) এই কথাটি অন্য ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

وليس له التمذهب بمذهب احد من ائمة الصحابة رضى الله عنهم و غيرهم من الاولين وان كانوا اعلم و اعلى درجة ممن بعدهم لانهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط اصوله و فروعه فليس لاحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر انما قام بذالك من جاء بعدهم من الائمة الناحلين لمذاهب الصحابة و

৩২৫ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রউফ আল-মানাবী, *ফয়জুল কদীর শরহে জামেউস সাগীর*, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৯৭১, ১খ. পৃ. ২১০

التابعين القائمين بتمهيد احكام الوقائع قبل وقوعها الناهضين بايضاح اصولها و فروعها كمالك رض و ابى حنيفة رض.

'সাহাবায়ে কেরাম ও কল্যাণময় যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কারো মাযহাব সরাসরি তাকলীদ করা বৈধ হবে না। কারণ, ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী মুজতাহিদগণের তুলনায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীত হলেও ফিকহশাস্ত্রের সংকলন, এর মূলনীতি ও ধারাসমূহ বিন্যস্তকরণের বড় একটা অবকাশ তারা পাননি। এ জন্যেই তাদের কারো সুবিন্যস্ত ও গ্রন্থবদ্ধ মাযহাব নেই। এই গুরুদায়িত্বটি পালন করেছেন পরবর্তী যুগের ইমাম ও মুজতাহিদগণ, যারা নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের মাযহাব সংগ্রহ করেছেন। (কুরআ'ন ও সুন্নাহর আলোকে) মূলনীতি ও ধারা-উপধারা নির্ধারণপূর্বক সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ফতোয়া ও সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। সেই স্বনামধন্য ইমামগণের অন্যতম হলেন ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আবু হানিফা (র)।[326]

এ বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ আলেমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা যায়। তবে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করার স্বার্থে আমরা এমন দু' জন মনীষীর বক্তব্য উপস্থাপন করব, যাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও তাকওয়া সম্বন্ধে তাকলীদ অস্বীকাকারীদের মধ্যেও দ্বিমত নেই। এর একজন হলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী আরেকজন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া। প্রথমে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া। তিনি বলেন,

وليس فى الكتاب و السنة فرق فى الائمة المجتهدين بين شخص و شخص فمالك والليث بن سعد و الاوزاعى و الثورى هؤلاء ائمة فى زمانهم و تقليد كل منهم كتقليد الأخر لايقول مسلم انه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد احد هؤلاى فى زماننا فانما يمنعه لاحد شيئين (احدهما) اعتقاده انه لم ومن سوَّغه قال لابد يبقَ من يعرف مذاهبهم و تقليد الميت فيه خلافٌ مشهورٌ فمن منعه قال هؤلاى موتى ان يكون فى الاحياء من يعرف قول الميت (والثانى) ان يقول الاجماع اليومَ قد انعقد على خلاف هذا القول... ... واما اذا كان القول الذى يقول به هؤلاى الائمة اوغيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب ان قوله مؤيّدٌ بموافقة هؤلاى و يعتضد به

'কুরআ'ন ও হাদীসের প্রেক্ষাপটে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে একজনের সাথে আরেকজনের কোনো তফাৎ নেই। কাজেই ইমাম মালেক, লাইস ইবনে সাআদ, ইমাম আউযায়ী ও সুফিয়ান সওরী–তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ যুগের ইমাম ছিলেন। তাদের মধ্যে যে কারো তাকলীদের হুকুম অপরজনের তাকলীদের হুকুমের একইরূপ। কোনো মুসলমানই বলতে পারে না যে, তাদের মধ্যে অমুকের তাকলীদ জায়েয আর অমুকের

৩২৬ ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইবনে শারাফ আন নববী, *আল মাজমু' শারহিল মাযাহিব*, মাকতাবাতুল ইরশাদ, নতুন সংস্করণ, ২০০৮, ১খ. পৃ-৯১

তাকলীদ জায়েয নয়। যারা এসব ইমামদের মধ্যে কারো তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন তারা দুটি কারণের কোনো একটির ভিত্তিতে করেছেন।'

একটি হল, তাদের ধারণায় বর্তমানে এমন কোনো লোক বিদ্যমান নেই, যিনি উপর্যুক্ত মহান ব্যক্তিগণের মাযহাব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। আর মৃত ইমামের তাকলীদের ব্যাপারে মতবিরোধের ব্যাপার তো প্রসিদ্ধ। কাজেই যারা উল্লেখিত বুযুর্গানের তাকলীদ করতে নিষেধ করেন তাদের বক্তব্য হল, তারা তো ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা মৃত ইমামের তাকলীদ জায়েয মনে করে তাদের বক্তব্য হল, মৃত ইমামের তাকলীদ তখনই জায়েয, যখন বর্তমান সময়ে জীবিত প্রাজ্ঞ আলেমদের মধ্যে কেউ মৃত ইমামের মাযহাব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানের অধিকারী হন। (যেহেতু উল্লেখিত অন্য ইমামগণের মাযহাব সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতি রাখেন এমন আলেম বর্তমান নেই সেহেতু তাদের তাকলীদ করাও জায়েয নেই। চার ইমামই শুধু এই শর্তে উত্তীর্ণ হতে পারেন।)

দ্বিতীয় কারণটি হল, তারা (নিষেধকারীগণ) বলেন যে, যেসব বুযুর্গের মাযহাব বিদ্যমান নেই, বিলুপ্ত) তাদের মাযহাবের বিপক্ষে সর্বসম্মত মত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।.... তবে অতীত ইমামগণের কোনো সিদ্ধান্ত যদি জীবন্ত মুজতহিদগণের মতামতের সমর্থক হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে প্রথমোক্ত ইমামগণের মতামত শেষোক্ত ইমামগণের মতামতের পরিপোষক হয়ে যাবে এবং তাকে শক্তিশালী করবে।[৩২৭]

দ্বিতীয় প্রাজ্ঞ বুযুর্গ হলেন হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র)। তিনি তার কিতাব عقد الجيد -এ এই বিষয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছেন। তিনি উক্ত পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন।

باب تاكيد الاخذ بهذا المذاهب الاربعة و التشديد فى تركها و الخروج عنها

তৃতীয় পরিচ্ছেদ হল চার মাযহাব অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর তাগাদা এবং এসব মাযহাব ত্যাগ ও তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে। তিনি পরিচ্ছেদের সূচনা করেছেন এই ভাষায়-

اعلم ان فى الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيما و فى الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة ونحن نبين ذالك بوجوه الخ...

'উল্লেখ্য যে, চার মাযহাব অনুসরণের মধ্যে বিরাট বিশাল উপকার ও কল্যাণ আছে। আর এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে বিরাট ক্ষতি ও অকল্যাণ আছে। আমরা বিষয়টিকে কয়েক দিক থেকে পর্যালোচনা করব।

(১) শাহ সাহেব বলেন যে, শরী'আ বুঝার জন্য পূর্ববর্তী ইমামগণের উপর আস্থা রাখা উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে নেহায়ত জরুরী। কিন্তু পূর্ববর্তীদের মতমতের উপর আস্থা রাখা তখনই হতে পারে যখন তাদের মতামত কোনো সহীহ সনদের ভিত্তিতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছবে অথবা বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে তা লিপিবদ্ধ থাকবে। অনুরূপভাবে তাদের মতামতের উপর আস্থাশীল হওয়ার জন্য এটাও জরুরী যে, তাদের মতামত মাখদুম হতে হবে। অর্থাৎ পরবর্তী আলেমরা তাদের মতামত ব্যাখ্য বিশ্লেষণের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন–এমন হতে হবে।

---

৩২৭ আহমদ ইবনে তাইমিয়া, *ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম,* ওয়াযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতু ওয়াল ইরশাদ, সৌদি আরব, ১৪২৫/২০০৪,২খ. পৃ- ৪৪৬

তাদের মতামতের যদি একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই মতামতের উপর পর্যালোচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক মতামত সাব্যস্ত করেছেন–এমন হতে হবে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো সময় মুজতাহিদের উক্তি দৃশ্যত সর্বজনীন হয়ে থাকে, তবে তাতে কোনো বিশেষ বিষয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে (যা সেই মাযহাবের মন-মানস সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকেরাই বুঝতে সক্ষম)। এ কারণে এটাও জরুরী যে, উক্ত মাযহাবের জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিষয়গুলো পরিষ্কার করেছেন এবং এসব হুকুমের কারণগুলোও ব্যাখ্যা করেছেন– এমন হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুজতাহিদের মাযহাবের ব্যাপারে এই কাজগুলো সম্পন্ন না হবে, ততক্ষণ তার উপর নির্ভর করা অবৈধ হবে। আমাদের সময়ে এসব বৈশিষ্ট্য চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোনো মাযহাবে পাওয়া যায় না।

(২) চার মাযহাবের অনুকরণ-অনুসরণের বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে হযরত শাহ ছাহেব দ্বিতীয় কারণ উল্লেখ করে বলেন যে, নবী করিম (সা) ইরশাদ করেছেন, اتبعوا السواد الاعظم

'তোমরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুসারী হও।' এই চার মাযহাব ছাড়া বাকী সব মাযহাব যেহেতু বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেহেতু এই চার মাযহাবের অনুসরণ সাওয়াদুল আজম (বৃহত্তর জনগোষ্ঠী)-এর অনুসরণ বলে গণ্য। আর মাযহাব চতুষ্টয় হতে বের হওয়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিরোধীতার শামিল হবে।'

(৩) চার মাযহাবের অনুসরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার তৃতীয় কারণ সম্পর্কে শাহ ছাহেব (র) বলেন,

যদি চার মাযহাবের বাইরে অন্য কোনো মুজতাহিদের উক্তির উপর ফতোয়া দেয়ার এজাযত দেয়া হয়, তাহলে নফসের তাবেদারী করে এমন মন্দ আলেমরা নিজের কোনো ফতোয়াকে পূর্ববর্তী কোনো ইমামের মত বলে চালিয়ে দিতে পারেন এবং বলতে পারেন যে, এই ফতোয়া অমুক ইমামের অমুক উক্তি দ্বারা প্রমাণিত বা সমর্থনপুষ্ট। যে ইমামের মতামতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাজে বিরাট সংখ্যক আলেম মশগুল রয়েছে সে ইমামের মাযহাবের উপর আমল করলে সে ধরনের কোনো বিভ্রান্তির আশংকা নেই। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটি এমন নয়, (বরং কোনো ইমামের দু একটি উক্তি বা মতামত পাওয়া যায়) তাদের মাযহাব নিয়ে ফতোয়া দেয়াতে উল্লেখিত আশংকাটি পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। (সেই ইমামের মতামতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মনগড়া ফতোয়া দেয়ার অবকাশ থেকে যাবে)।[৩২৮]

তাকলীদের স্তরভেদ

আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনায় এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বর্তমান সময়ে চার মাযহাবের যে কোনো একটির তাকলীদ বা অনুসরণ-অনুকরণের বিকল্প নেই। এই তাকলীদ কীভাবে করা হবে এবং কারা করবে তাদের সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। কারণ, মানুষের শ্রেণীভেদে তাকলীদেরও স্তরভেদ রয়েছে। তাতে যারা তাকলীদ অস্বীকার করে তাদের মনের দ্বিধাদ্বন্ধ দূর হয়ে যেতে পারে। কারণ তাদের অনেক প্রশ্ন তাকলীদকারীদের স্তরভেদ না জানার কারণে উত্থাপিত হয়ে থাকে। এই স্তর বিন্যাসটি আমরা সমকালীন অত্যন্ত বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আইন

৩২৮ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র),*ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ,* মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলী, ১৩৪৪ হি; পৃ- ৩১-৩৩

ও ফিকহশাস্ত্রবিদ আল্লামা তাকী উসমানীর শরণাপন্ন হয়ে করতে চাই। তিনি তাকলীদের স্তরভেদের বিষয়টিকে চারটি পৃথক শিরোনামে বিন্যস্ত করেছেন।[৩২৯]

প্রথম স্তর : আমজনতা এর তাকলীদ

১. প্রথম প্রকার হচ্ছে 'সাধারণ লোকদের তাকলীদ'। সাধারণ লোক বা আমজনতা বলতে যাদের বুঝানো হচ্ছে তাদেরকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(এক) যেসব লোক আরবি জানে না এবং ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নয়। যদিও তারা নিজ নিজ সাব্জেক্টে যথেষ্ট পান্ডিত্যের অধিকারী, দক্ষ ও গবেষক হিসেবে স্বীকৃত।

(দুই) দ্বিতীয় প্রকারের আম জনতা বলতে বুঝায়, যারা আরবি জানেন, বুঝেন এবং আরবি কিতাবপত্র বুঝেন। কিন্তু তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও সংশ্লিষ্ট দ্বীনি জ্ঞানগুলো যথানিয়মে উস্তাদের কাছে পড়তে পারেন।

(তিন) ঐসব লোক, যারা আনুষ্ঠা নিকভাবে ইসলামী জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। কিন্তু তাফসীর, হাদীস, ফিকহশাস্ত্র ও এগুলোর মূলনীতি সম্পর্কে ভাল যোগ্যতা ও দূরদর্শীতার অধিকারী হতে পারেন নি।

তাকলীদের প্রশ্নে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকই আম, আওয়াম বা সাধারণ লোক হিসেবে গণ্য হবেন এবং তাদের সবার সম্পর্কে হুকুম অভিন্ন।

এই শ্রেণীর লোকদদের জন্য তাকলীদ এর বিকল্প নেই। তাদেরকে অবশ্যই কোনো না কোনো মুজতাহিদ তথা মাযহাবের তাকলীদ করতে হবে। কারণ, তাদের মধ্যে এতখানি যোগ্যতা নেই যে, তারা সরাসরি কুরআ'ন ও হাদীস বুঝবে। কুরআ'ন ও সুন্নাহয় দৃশ্যত পরস্পর বিরোধী দলিলসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং একটির উপর আরেকটি অগ্রগণ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতাও তাদের নেই। কাজেই শরী'আর হুকুম-আহকামের উপর আমল করার জন্য তাদের সামনে এ ছাড়া কোনো পথ নেই যে, তাদেরকে কোনো না কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। তার কাছ থেকেই শরী'আর মাসয়ালা ও ফায়সালা জানতে হবে। আল্লামা খতীব বাগদাদী বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

اما ما يسوغ له التقليد فهو العامى الذى لا يعرف طرق الاحكام الشرعية فيجوز له ان يقلد عالما ويعمل بقوله ... ولانه ليس من اهل الاجتهاد فكان فرضه التقليد كتقليد الاعمى فى القبلة فانه لما لم يكن معه الة الاجتهاد فى القبلة كان عليه تقليد البصير فيها

প্রশ্ন হল, তাকলীদ কার জন্য জায়েয? এর জবাব হল, এমন সাধারণ লোকদের জন্য, যারা শরী'আর হুকুম-আহকামের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নয়। কাজেই তাদের জন্য কোনো বিজ্ঞ আলেমের তাকলীদ করা ও

৩২৯ মওলানা তাকী উসমানী, *তাকলীদ কি শরয়ী হাইসিয়্যত*, মাকতাবা দারুল উলুম, করাচি, ১৪২৫/২০০৪

তার কথার ভিত্তিতে আমল করা জায়েয। (এ কথার পক্ষে কুরআ'ন ও সুন্নাহর দলিলাদি পেশ করার পর তিনি বলেন,) অনুরূপভাবে এ করণে যে, এই শ্রেণীর লোকেরা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখে না। কাজেই তাদের উপর ফরয হল, তাদেরকে ঠিক এমনভাবে তাকলীদ করতে হবে, যেভাবে কোনো অন্ধলোক কেবলা ঠিক করার ব্যাপারে কোনো চোখওয়ালা-মানুষের তাকলীদ করে থাকে। কারণ, যেহেতু তার কাছে এমন কোনো মাধ্যম থাকে না, যা দিয়ে সে কেবলার দিক নির্ণয় করতে পারে, সেহেতু কোনো দৃষ্টিবান লোকের অনুকরণ বা তাকলীদ তাকে করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।[৩৩০]

এই স্তরের যারা মুকাল্লিদ, তাদের জন্য বিভিন্ন যুক্তি ও দলিল নিয়ে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। কোনো ফকীহ বা মুজতাহিদের দলিল কতখানি শক্ত বা অগ্রগণ্য, তা ফারাক করার চেষ্টা করা তার কাজ নয়। তার কাজ হল, কোনো একজন মুজতাহিদ বা মাযহাবকে নির্দিষ্ট করে প্রত্যেক ব্যাপারে তার ফায়সালা মেনে চলা। কেননা, তার মধ্যে এমন যোগ্যতা নেই যে, সে কোন দলিলটি অগ্রগণ্য বা অগ্রগণ্য নয়, তা ফায়সালা করতে পারে। এই শ্রেণীর লোকের সামনে যদি ঘটনাচক্রে এমন কোনো হাদীস এসে যায় যা বাহ্যত তার অনুসৃত ইমাম বা মাযহাবের বরখেলাফ বলে মনে হয় তখনো তার উপর কর্তব্য হল, তাকে তার ইমাম ও মুজতহিদের মাযহাবের তাকলীদ করতে হবে। আর হাদীসের ব্যাপারে এই বিশ্বাস পোষণ করবে যে, হাদীসের সঠিক মর্ম আমি বুঝতে পারিনি। অথবা আমার ইমামের কাছে এর বিপক্ষে শক্ত কোনে দলিল আছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হবে যে, ইমামের সিদ্ধান্ত ও মাযহাবকে গ্রহণ করা হচ্ছে অথচ হাদীসের ঘুরিয়ে ব্যাখ্যার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল যে শ্রেণীর মুকাল্লিদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের জন্য তো এই পদ্ধতি ছাড়া কোনো উপায় নেই। এ ধরনের মুকাল্লিদকে যদি এই অধিকার দেয়া হয় যে, তিনি আপন ইমামের মাসলাক এর বিপরীত কোনো হাদীস পেয়ে ইমামের মাসলাক ছেড়ে দিতে পারবে, তাহলে এর পরিণতি দাঁড়াবে অতিশয় বাড়াবাড়ি এবং কঠিন গোমরাহী। কেননা, কুরআ'ন হাদীস থেকে মাসয়ালা উদঘাটন করা এক গভীর ও অত্যন্ত ব্যাপক শাস্ত্র, যার পেছনে গোটা জীবন বি নিয়োগ করেও প্রত্যেকে অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে পারে না। অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো হাদীস-এর বাহ্যিক শব্দ থেকে একটি অর্থ বুঝা যাচ্ছে, অথচ কুরআ'ন ও হাদীসের অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত মর্মার্থ প্রমাণিত হচ্ছে। কাজেই একজন মামুলী মানুষ যদি হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দেখার পর সে অনুযায়ী আমল করা শুরু করে তাহলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, অহরহ গোমরাহীর পথ খুলে যাবে এবং দ্বীনের নামে দ্বীনের দোহাই দিয়ে দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণের বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

কাজেই সাধারণ শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষকে একজন ইমাম বা একটিমাত্র মাযহাবের শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। মনগড়াভাবে দ্বীন পালন করতে পারবে না। কুরআ'ন হাদীস পড়ে বা শরী'আ সম্পর্কিত বইয়ের যুক্তিতর্ক দেখে নিজের ইমামের বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবে না। কুরআন হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞানের আকর গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান পাওয়ার পরও কেনো তা নিজে আমল করতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট ইমাম বা মাযহাবের অনুসরণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হচ্ছে, তা বোঝার জন্য একটি মামুলী দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ সামনে আনা যায়।

---

৩৩০ আলী ইবনে সাবেত আল-খতীবুল বগদাদী, *আল ফকীহ ও ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, দারু ইবনুল জাউযি, বৈরুত, ১৪১৭/১৯৯৬, পৃ. ৬৮

ধরুণ, কোনো মামলা করতে হবে বা কোনো কারণে আইনের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। প্রত্যেকে দৌড়ে যায় একজন আইনজ্ঞের কাছে। বাজারে আইনের যেসব বই পাওয়া যায় তার পেছনে ছোটে না। একলোক এমন দক্ষ বিশ্বস্ত উকিল-ব্যারিষ্টারের কাছে গেল, যার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি আইনের ফাঁকফোকড় ভাল করেই জানেন, তদুপরি বিশ্বাসভাজন এবং কোনোভাবে ধোঁকা খাওয়ার সুযোগ নেই। উকিল সাহেব যদি কোনো আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং তার উপর আস্থাশীল হয়ে সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকেন। এর মধ্যে যদি কোনো আইনের বই হাতে পেয়ে যায় এবং তাতে এমন বিষয় দেখে, যা উকিল সাহেবের দেয়া সিদ্ধান্তের বিপরীত, তাহলে লোকটির কর্তব্য কী হবে? সে কিছুতেই দক্ষ বিশ্বস্ত উকিলের মতামত প্রত্যাখ্যান করতে পারে না; বরং বুঝতে হবে যে, বইতে যা লেখা আছে তার সঠিক মর্ম আমার বুঝে আসছে না। কারণ হল, আইনের বই থেকে সিদ্ধান্ত বের করা যার তার কাজ নয়; এর জন্য জ্ঞান লাগে, অনুশীলন লাগে এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই কথাটি সবচে বেশি প্রযোজ্য হবে কুরআ'ন ও হাদীসের কিতাব থেকে শরী'আর সিদ্ধান্ত বের করার বিষয়ে।

বাজারে অগণিত ডাক্তারী বই পাওয়া যায়। যারা বড় বড় ডাক্তার হচ্ছেন তারাও বাজার থেকে বই সংগ্রহ করে পড়েন বা পড়ান। কিন্তু আপনি আমি রোগে আক্রান্ত হলে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে। বাজার থেকে বই সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী ঔষধ সংগ্রহ করে সেবন করতে পারব না। ধরুণ, কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তার কোনো রোগের জন্য ঔষধ দিলেন, তার উপর আস্থা রেখে আপনি সে অসুধ ব্যবহার করতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে বাজারে মেডিকেল এর বইতে এমন ঔষধের তথ্য জানতে পারলেন যা অভিজ্ঞ ডাক্তারের প্রেস্ক্রাইব করা ঔষধের বিপরীত, তখন কি আমি আপনি অভিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থা দেয়া ঔষধ ছেড়ে দিয়ে বইতে পাওয়া ঔষধ সেবন করতে পরবেন? নিশ্চয়ই না। কেননা, ডাক্তার হওয়ার জন্য ব্যাপক পড়াশোনা ও সাধনা ও অভিজ্ঞতার দরকার। সেই যোগ্যতা না নিয়ে বাজারের বই পড়ে ঔষধ সেবন শুরু করলে তা হবে আত্মহনন। কুরআ'ন , হাদীস থেকে শরী'আর সিদ্ধান্ত বের করার ব্যাপারটিও অনুরূপ।

আমাদের ফকীহগণও এ কথাই বলেছেন যে, আম জনতাকে কুরআ'ন হাদীস থেকে সরাসরি শরী'আর হুকুম-আহকাম বের করে আমল করার পরিবর্তে বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণের শরণাপন্ন হতে হবে।

ফকীহগণ তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, কোনো সাধারণ লোকের কাছে যদি কোনো মুফতি ভুল ফতোয়া প্রকাশ করে সেই ফতোয়া অনুযায়ী আমল করার দরূন যে গোনাহ হবে তা ফতোয়াদানকারীর উপর বর্তাবে। সাধারণ আমলকারী লোক এ ক্ষেত্রে মাজুর বা দায়মুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি কোনো সাধারণ লোক কোনো হাদীস দেখার পর তার ভুল অর্থ গ্রহণ করে ও সে অনুযায়ী আমল করে তাতে সে দায়মুক্ত হবে না। কারণ তার উপর তো কর্তব্য ছিল বিষয়টি নিয়ে কোনো মুফতির শরণাপন্ন হওয়া। সরাসরি কুরআ'ন ও সুন্নাহ থেকে মাসয়ালা উদঘাটন করা তার দায়িত্ব ছিল না।

এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যায়, জমহুর ওলামা বা সর্বস্তরের সকল আলেমের দৃষ্টিতে সিঙ্গানিলে রোযা ভাঙ্গে না। যদি রোযা রেখে সিঙ্গা লাগানোর পর কোনো সাধারণ লোক কোনো মুফতির কাছ থেকে ফতোয়া জিজ্ঞাস করে এবং মুফতি সাহেব বলেন যে, তোমার রোযা ভেঙে গেছে, এ কথার উপর সে লোক যদি দিনের বেলা পানাহার করে, তাতে রোযা অবশ্যই ভেঙে যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হেদায়া কিতাবের ভাষ্য হল, এই রোযা ভঙ্গের জন্য শুধুমাত্র কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা আসবে না। হেদায়ায় এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে,

لان الفتوى دليل شرعى فى حقه

'কারণ হচ্ছে সেই সাধারণ লোকের জন্য ফতোয়াই হচ্ছে শরী'আর দলিল।'[331]

কিন্তু যদি কেউ আবু দাউদ বা তিরমিযী শরীফে এই হাদীসটি দেখে যে, রমযান মাসে নবী করিম (সা) এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে সিঙ্গা লাগাচ্ছিল, তখন তাকে বললেন,

افطر الحاجم و المحجوم

'সিঙ্গা যে লাগাচ্ছে এবং লাগিয়ে দিচ্ছে উভয়ের রোযা ভেঙে গেছে।' তার প্রেক্ষিতে কথাটি বলেছেন, এমন হবে।'[৩৩২]

এই হাদীসের প্রেক্ষিতে সে রোযা ভেঙে গেছে মনে করে যদি পানাহার করে নেয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফের মতে রোযার কাফফারা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। কারণ তার উপর তো, কোনো মুফতির কাছে গিয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করাই ফরয ছিল। সে সে ফরয পালন করেনি। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন,

لان على العامى الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء فى حقه الى معرفة الاحاديث

'সাধারণ লোকদের উপর কর্তব্য হল, তাদেরকে ফকীহগণের উপর একতেদা করতে হবে। কেননা, হাদীসের জ্ঞান আয়ত্ব করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই।'[৩৩৩]

মোটকথা সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদের প্রথম স্তরটি সু নির্দিষ্ট। আর তা হল, তাদেরকে সর্বাবস্থায় তাদের ইমামের কথার উপর বা নির্দিষ্ট মাযহাব অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যদি কোনো হাদীস ইমামের মাযহাবের বিপরীত বলে মনে হয়, তাহলে এটাই বুঝবে যে, হাদীসের সঠিক মর্ম হয়ত আমি বুঝতে পারিনি; অথবা যে ইমামের তাকলীদ করছি তার কাছে হাদীসের বাহ্যিক অর্থের চেয়ে ভিন্ন কোনো মর্মার্থের পক্ষে শক্ত কোনো দলিল আছে, যার কারণে তিনি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করেন নি। সাধারণ লোকদের জন্য এই পদ্ধতিতে

---

৩৩১ ইবনুল হুমাম : কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে মাসউদ আস-সিওয়াসী আল-ইসকান্দরী (৭৯০–৮৬১ হি. = ১৩৮৮–১৪৫৭ খ্রি.), ***ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া***, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবনান, ২০০০ খ্রি., ২খ. পৃ-৩৮১, কিতাবুস সওম

৩৩২ হাদীসটি সহীহ সনদে বর্ণিত। কিন্তু বুখারী শরীফে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখা অবস্থায় সিঙ্গা নিয়েছেন। নাসায়ী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খোদরী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করিম (সা)-এরাযাদার ব্যক্তিকে সিঙ্গা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন। এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা ও জমহুর ওলামা এ কথার উপর একমত যে, এর হুকুম হয়ত মনসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। অথবা নবীজি যাওয়ার সময় সেই বিশেষ লোক দুটিকে এমন কোনো কাজ করতে দেখেছেন, যা করলে রোযা ভেঙে যায়, তাই মন্তব্যটি করেছেন। দ্র. আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, *তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে আত-তিরমিযী*, মুআসসিসাতুর রিসালা, কায়রো ২০১৫, ২খ. পৃ. ১৭০; ফাতহুল মুলহিম, ২খ. পৃ-৬৪-৬৫

৩৩৩ আলী ইবনে আবি বকর ইবনে আব্দুল জলীল আল-ফারাগানী আল-মুরগীনানী, *আল-হেদায়া ফী শারহে বেদায়াতুল মুবতাদী* দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরবী, ২০১০, , ১খ. পৃ. ২২৬, বাবু মা ইউজাবুল কাযা ওয়াল কাফফারা

শরী'আর হুকুম-আহকামের উপর আমল করা ছাড়া উপায় নেই। নচেত শরী'আর হুকুম-আহকাম নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা শুরু হবে, যার ভয়বহতার কথা চিন্তাও করা যায় না।

দ্বিতীয় স্তর : মুতাবাহহার ফিল মাযহাব এর তাকলীদ

তাকলীদের দ্বিতীয় স্তরটি হল 'বিশেষজ্ঞ আলেমদের তাকলীদ'। বিশেষজ্ঞ আলেম বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হচ্ছে, যিনি মুজতাহিদের পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছলেও দক্ষ অভিজ্ঞ উস্তাদের তত্ত্বাবধানে যথানিয়মে ইসলামী জ্ঞান আহরণের পর বিজ্ঞ অভিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে অহরিত জ্ঞানের উপর লেখালেখি ও শিক্ষকতা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং এগুলোর মূলনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। কোনো মাসয়ালা নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মতামত ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম এবং সেখান থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তাদের রচনার ধরন ও যুক্তিবিন্যাসের পন্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞা হওয়ার কারণে তাদের উদ্দিষ্ট মর্ম উপলব্ধি করার মেধা যাদের রয়েছে। হযরত ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র) এ ধরনের লোকদের নামকরণ করেছেন 'মুতাবাহ্হারুল মাযহাব' (মাযহাব সম্পর্কে বিদ্যাসাগর)। তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فصل فی المتبحر فی المذهب وهو الحافظ لکتب مذهبه ... من شرطه ان یکون صحیح الفهم عارفا بالعربیة و اسالیب الکلام و مراتب الترجیح متفطنا لمعانی کلامهم لا یخفی علیه غالبا تقیید ما یکون مطلقا فی الظاهر والمراد منه المقید و اطلاق ما یکون مقیدا فی الظاهر و المراد منه المطلق.

'মুতাবাহহার ফিল মাযহাব' বা মাযহাব বিশেষজ্ঞ এমন ব্যক্তি, যিনি নিজের মাযহাবের কিতাবগুলোর উপস্থিত জ্ঞানের অধিকরী। ...তার জন্য শর্ত হল, তাকে সহীহ বুঝ সম্পন্ন হতে হবে। আরবি ভাষা এবং সে ভাষার ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবেন। মুজতাহিদ ইমামের বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের মধ্যে অগ্রাধিকার সাব্যস্ত করার স্তরগুলো সম্পর্কে অবহিত হবেন। ফকীহগণের ভাষা ও বাচনভঙ্গির মর্মার্থ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এ ধরনের ভাষা দৃশ্যত মুতলক বা শর্তমুক্ত হলেও তা কোনো কয়েদ বা শর্তনিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অথবা কখনো দৃশ্যত মুকাইয়দ বা শর্ত নিয়ন্ত্রিত মনে হলেও কার্যত মুতলাক বা শর্তমুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে এসব বিষয়েও তাকে সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে।[৩৩৪]

এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ মুজতাহিদ পর্যায়ে উপনীত না হওয়ার কারণে মুকাল্লিদরূপেই পরিচিত হবেন। তবে সাধারণ মুকাল্লিদদের তুলনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা বিশেষ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন–

১. এই শ্রেণীর আলেমগণ সাধারণ শ্রেণীর মতো কেবল মাযহাব সম্পর্কেই নয়, বরং মাযহাবের বিভিন্ন দললী সম্পর্কেও সামগ্রিকভাবে অবহিত হয়ে থাকেন।

---

৩৩৪ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), *ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ*, মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলী, ১৩৪৪ হি; পৃ. ৫১

২. মুফতি হিসেবে তিনি নিজস্ব মাযহাবের বিভিন্ন মত বা বক্তব্যের মধ্যে যুগের ও পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে কোনো একটি বক্তব্যকে গ্রহণ করার বা মাযহাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়ার যোগ্যতার অধিকারী হয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে তিনি যেসব নিত্যনব মাসয়ালার সমাধোন মাযহাবের কিতাবের মধ্যে নেই সেসব বিষয়ে মাযহাবের নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে জবাব খুঁজে বের করার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে থাকেন।[৩৩৫]

৩. কোনো কোনো সময় বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি নিজের ইমামের পরিবর্তে অন্য মুজতাহিদের উক্তির ভিত্তিতে ফতোয়া দিতে পারেন। যার শর্তাদি ফিকহ ও উসূলে ফিকহ এর কিতাবসমূহে বিদ্যমান আছে।[৩৩৬]

এই ধরনের লোক যদি কোনো বিশেষ মাসয়ালার ক্ষেত্রে অনুভব করেন যে, তিনি যে ইমামের মুকাল্লিদ, তার উক্তিটি সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, তার বিপক্ষে কোনো শক্ত দলিলও বিদ্যমান নেই, এক্ষেত্রে করণীয় সম্বন্ধে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রা)-এর অভিমত হল,

اذا وجد المتبحر فى المذهب حديثا صحيحا يخالف مذهبه فهل له ان يأخذبالحديث ويترك مذهبه فى تلك المسئلة فى هذه المسئلة بحث طويل و اطال فيها صاحب خذانة الروايات نقلا عن دستور المساكين فلنورد كلامه من ذالك بعينه

‘মুতাবাহহিরুল মাযহাব বা মাযহাব বিশেষজ্ঞ আলেম যদি কোনো এমন হাদীস পান, যা তার অনুসৃত মাযজাবের বিপরীত, তার জন্য কি ঐ হাদীসের উপর আমল করে উক্ত মাসয়ালার ক্ষেত্রেনিজ মাযহাবের অনুসরণ বাদ দেয়া জায়েয হবে? এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। খাজানাতুর রেওয়ায়াত এর প্রণেতা দস্তরুল মাসাকীন- এর বরাত দিয়ে এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা এখানে তার বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করছি।’

এরপর শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (আ) বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, একদল আলেমের বক্তব্য হল, ‘মাযহাব বিশেষজ্ঞ’ যেহেতু ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হন নি, সেহেতু উল্লেখিত অবস্থায়ও তার আপন ইমামের মাযহাব ত্যাগ করা উচিত হবে না। কেননা, হতে পারে যে, মাযহাবের ইমামের নজর এমন দলিল পর্যন্ত পৌঁছেছে, যেখানে তার চিন্তা ও জ্ঞানের আওতা পৌঁছায়নি। তবে অধিকাংশ আলেমের মত হল, যদি এ ধরনের মাযহাব বিশেষজ্ঞ আলোচ্য মাসয়ালার সবদিক ও দলিল প্রমাণ ভালোভাবে রপ্ত করার যাবতীয় উদ্যোগ

---

৩৩৫ মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আব্দুল আযীয় ইবনে আবেদীন, *শরহে উকুদে রসমিল মুফতি*, ইদারা আল মাআরিফ, কায়রো, ২০১৫

৩৩৬ ফতোয়ার মূলনীতি সম্পর্কিত কিতাবাদি ছাড়াও দ্র. ইবনে আবিদীন : মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আযীয আবিদীন আদ-দামিস্কী আল-হানাফী (১১৯৮–১২৫২ হি. = ১৭৮৪–১৮৩৬ খ্রি.), **রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী**, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি. ৩খ. পৃ-১৯০,১৯১

গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে সেই শর্তে উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে আপন ইমামের মাযহাবের সিদ্ধান্ত অমান্য করতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তগুলো অবশ্যই মান্য করতে হবে। যেমন–

১. প্রথম শর্ত তো হল, সেই লোক প্রকৃত অর্থেই মুতাবাহহারুল মাযহাব বানিজস্ব মাযহাব বিষয়ে বিদ্যা সাগর আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত হবেন।

২. দ্বিতীয় শর্ত হল, যে হাদীসের ভিত্তিতে তিনি আপন মাযহাবের ইমামের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করছেন সে হাদীস সম্পর্কে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা ইলমে হাদীসের সকল আলেম এর দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হাদীস। কারণ, কোনো হাদীস বিশুদ্ধ কিনা সে বিষয়ে কোনো কোনো মুজতাহিদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকে। যারা হাদীসটি সহীহ মনে করেন তারা সে অনুযায়ী আমল করেন। আর যারা হাদীসটি যয়ীফ বলে সাবস্ত করেন তারা উক্ত হাদীসের উপর আমল করা থেকে বিরত থাকেন। কাজেই আপন মাযহাবের ইমাম যে হাদীসটিকে আমলে নেন নি, তা হাদীসটিকে যয়ীফ মনে করেই নেন নি। কাজেই মুজতাহিদ নন–এমন ব্যক্তির জন্য সেই হাদীসের উপর আমল করা সঠিক হবে না।

৩. তৃতীয় শর্ত হল, সেই হাদীসের বিপরীতে কুরআ'ন মজীদের কোনো আয়াত বা অন্য কোনো হাদীস বিদ্যমান থাকবে না।

৪. চতুর্থ শর্ত হল, হাদীসটির বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার হবে এবং তা থেকে অন্য কোনো সন্তোষজনক অর্থ বের করা যাবে না–এমন হতে হবে। কারণ, অনেক সময় এক হাদীসে কয়েক রকমের অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মুজতাহিদ তার ইজতিহাদি প্রখর দৃষ্টি দিয়ে তার একটি অর্থনির্ধারণ করে দেন। এজন্যে তার মাযহাবকে হাদীসের বিপরীত বলা যায় না। এ অবস্থায় কোনো মুকাল্লিদের জন্য হাদীসের ভিন্ন কোনো অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নেই। কারণ, তাকলীদের মূল কথা তো এটাই যে, যেখানে কুরআ'ন ও হাদীসের কয়েক রকম অর্থের সম্ভাবনা থাকে সেখানে একটি অর্থ গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের বুঝের পরিবর্তে মুজতাহিদের বুঝের উপর আস্থা রাখা হবে। কাজেই এই অবস্থায় মুজতাহিদের তাকলীদ করাকেও হাদীসের বিরোধীতা বলে গণ্য করা যাবে না।[৩৩৭]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) আরো একটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তাহল, এই হাদীসের ভিত্তিতে যে মতামত গঠন করা হবে, তা চার ইমামের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিপরীত হবে না।[৩৩৮] কারণ, চার মাযহাবের বাইরে গিয়ে আমল করার রাস্তা খুলে দেয়া হলে কত রকমের ফিতনার সৃষ্টি হতে পারে ইতোপূর্বে তা আলোচনার মধ্যে এসে গেছে।

বস্তুত উল্লেখিত শর্তাদি পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে 'মুতাবাহহার ফিল মাযহাব' বা মাযহাব বিশেষজ্ঞের জন্য আপন মাযহাবের উপর আমল ত্যাগ করা বৈধ। এ বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

---

৩৩৭ আশরফ আলী থানবী, *আল ইকতিসাদ ফিত তাকলীদে ওয়াল ইজতিহাদ*, কদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, বি তা; পৃ-৩৪-৩৬' পৃ-৪৩,৪৪

৩৩৮ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), *ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ*, মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলী, ১৩৪৪ হি; পৃ- ৫৮

শায়খুল ইসলাম আল্লামা নববী (র) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

قال الشيخ ابوعمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر ان كملت الات الاجتهاد فيه مطلقا اوفى ذالك الباب او المسئلة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكمل وشقَّ عليه مخالفة الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فله العمل به ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعيُّ ويكون هذا عذرا له فى ترك مذهب امامه هنا وهذا الذى قاله حسن متعيَّن.

'শায়খ আবু আমর বলেন, শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী কেনো মুজতাহিদ যদি এমন কোনো হাদীস পেয়ে যান যা তার অনুসৃত মাযহাবের কোনো সিদ্ধান্তের বিপরীত, তাহলে দেখা হবে যে, যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা ও শর্তাদি সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় অথবা খাস করে ঐ বিষয়ে কিংবা আলোচ্য মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজায় পৌঁছে গেছেন এমন হয়, তা হলে তিনি উক্ত হাদীসের উপর আমল করতে পারবেন। যদি তার মধ্যে ইজতিহাদ-এর যোগ্যতা ও শর্তাদি পুরোপুরি পাওয়া না যায়। আর দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও কোনো সন্তোষজনক জবাব তিনি না পান এবং হাদীসের বিরোধীতা করা তার কাছে খুব দুরুহ বলে প্রতীয়মান হয়, তাহলেও তিনি সেই হাদীসের উপর আমল করতে পারেন। তবে শর্ত হল, সে বিষয়ে ইমাম শাফেঈ ব্যতিত অন্য কোনো স্বতন্ত্র ইমাম আমল করেছেন এমন হতে হবে। এ বিষয়টি তার জন্য সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার ক্ষেত্রে আপন ইমামের মাযহাব ত্যাগ করার ব্যাপারে কৈফিয়ত বলে গণ্য হবে। (আল্লামা নববী বলেন যে,) শেখ আবু আমর (ইবনুস সালাহ)-এর এ কথাটি খুবই চমৎকার এবং তার উপর আমল করা উচিত।'[৩৩৯]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভীও (র) এ মতামতই গ্রহণ করেছেন। ইকদুল জিদ-এ তিনি লিখেছেন–

والمختار ههنا هو قول ثالث وهو ما اختاره ابن الصلاح وتبعه النووى و صححه الخ.

'এ বিষয়ে সবচে সুন্দর মতামত হচ্ছে তৃতীয়টি। এই মতামতটিই আল্লামা ইবনুস সালাহ গ্রহণ করেছেন। আল্লামা নববীও এই মতামতকে সমর্থন করে একে শুদ্ধ ও সঠিক বলে মত ব্যক্ত করেছেন।[৩৪০]

এ ছাড়াও উসুলে ফিকহ এর আলেমদের মাঝে এই মাসয়ালাটি আলোচনায় এসেছে যে, ইজতিহাদ কি বিভাজন হয়, নাকি হয় না। অর্থাৎ এটা কি সম্ভব যে, এক ব্যক্তি পুরো শরী'আর বিষয়ে মুজতাহিদ নন; কিন্তু কোনো একটি মাসয়ালা বা একটি অধ্যায়ে তিনি ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের অভিমত হল, এমন হতে পারে না। কেননা, ইজতিহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা তখনই অর্জন হয় যখন

---

৩৩৯ ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহয়া ইবনে শারাফ আন নববী, *আল মাজমু' শারহিল মাযাহিব*, মাকতাবাতুল ইরশাদ, নতুন সংস্করণ, ২০০৮, ১খ. পৃ-১০৫

৩৪০ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), *ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ*, মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলী, ১৩৪৪ হি; ১৯৯৫/১৪১৫, পৃ-৫৭

কেউ পুরো শরী'আর উপর মুজতাহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়। তবে উসুল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যকার একটি বিরাট দল, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিভাজন স্বীকার করেন। যেমন আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকী ও আল্লামা মাহাল্লী অভিমত দিয়েছেন যে,

(والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد) بان تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد فى بعض الابواب كالفرائض بان يعلم ادلته باستقراء منه او من مجتهد كامل و ينظر فيها

'সঠিক মত হল, ইজতিহাদে বিভাজন জায়েয আছে। অর্থাৎ কিছু কিছু লোক কোনো কোনো অধ্যায়ে যেমন ফারায়েয ইত্যাদিতে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী হয়ে যান। এটা এভাবে যে, তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল দলিল প্রমা নিজস্ব মেধা বিচারশক্তি বা কোনো কামিল মুজতাহিদ আলেমের সাহায্যে আয়ত্ব করে ফেলেন। এর ফলে সেসব দলিল প্রমাণ গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনাপূর্বক ফয়সালা দেয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে যায়।[৩৪১]

আল্লামা বানানী শরহে জামইল জওয়ামে কিতাবের পাদটীকায় বলেন,

ان الاجتهاد المذهبى قد يتجزأ فربما يحصل لمن هو دون مجتهد الفتيا فى بعض المسائل.

'ইজতিহাদ ফিল মাযাহিব কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন এই মর্তবা ও যোগ্যতা এমন লোকেরাও অর্জন করেন, যারা মুজতহিদুল ফতোয়ার চেয়েও কম স্তরের হন।

একইভাবে আল্লামা আব্দুল আযীয বুখারি উসুলে ফখরুল ইসলাম বযদাওয়ী-এর পাদটীকায় লিখেছেন যে,

وليس الاجتهاد عند العامة منصبا لايتجزأ بل يجوز ان يفوز العالم بمنصب الاجتهاد فى بعض الاحكام دون بعض.

'অধিকাংশ আলেমের মতে ইজহিতহাদ অবিভাজ্য নয়; বরং একজন আলেম ফিকহ এর কোনো এক শাখায় ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করে অন্য শাখায় তা অর্জনের ব্যর্থও হতে পারেন।[৩৪২]

ইমাম গাযযালীও (র) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

وليس الاجتهاد عندى منصبا لا يتجزأ بل يجوز ان يقال للعالم بمنصب الاجتهاد فى بعض الاحكام دون بعض.

---

৩৪১ আল্লামা বান্নানী, *হাশিয়াতুল বান্নানী আলা শরহে জামইল জাওয়ামে*, মাকতারা তেজারিয়া আল-কুবরা, মিসর। ১৪২৭ হিজরি, ২খ. পৃ- ৪০৩, ৪০৪

৩৪২ আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-বুখারী আল-হানাফী, *কাশফুল আসরার* , দারুল কুতুব আল-ইসলামি, কায়রো, ২০১০, ২খ. পৃ-১১৭৩, বাবু মারিফাতে আহওয়ালুল মুজতাহিদীন.

‘আমার দৃষ্টিতে ইজতিহাদ এমন কোনো যোগ্যতা নয়, যা বিভাজ্য হতে পারে না। বরং এটা সম্ভব যে, কোনো আলেমকে কোনো কোনো হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই যোগ্যতার অধিকারী নয় বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে।[৩৪৩]

এ বিষয়ে আল্লাম সাদ উদ্দীন তাফতাযানী লিখেছেন,

ثم هذه الشرائط انما هى فى حق المجتهد المطلق الذى يفتى فى جميع الاحكام واما المجتهد فى حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم.

‘অতপর এই শর্তগুলো তো পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে খন্ডিত ইজতিহাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করাই যথেষ্ট।[৩৪৪]

হযরত আল্লামা আমীর আলী (র) বলেছেন–

قوله واما المجتهد فى حكم الخ فلابد له من الاطلاع على اصول مقلده لان استنباطه على حسبها فالحكم الجديد اجتهاد فى الحكم والدليل الجديد للحكم المرويّ تخريجٌ.

‘(আংশিক ইজতিহাদের জন্য) স্বীয় ইমামের অনুসৃত মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি জরুরী। কেননা, উক্ত মূলনীতির আলোকেই তাকে ইসতিম্বাত বা সিদ্ধান্ত উদঘাটন করতে হবে। (উসুলে ফিকহ এর পরিভাষায় যিনি পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ তার অনুসৃত মূলনীতির আলোকে) নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের নাম হল ইজতিহাদ ফিল হুকম। পক্ষান্তরে মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে নতুন দলিল পরিবেশনের নাম তাখরীজ।[৩৪৫]

আল্লামা ইবনে হুমামও অভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, আংশিক মুজতাহিদ শুধু এমন ক্ষেত্রগুলোতেই পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের তাকলীদ করতে বাধ্য, যে ক্ষেত্রগুলোতে তার ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই।[৩৪৬]

মোটকথা উসূল তথা মূলনীতি বিশারদ আলেমগণের দ্ব্যর্থহীন অভিমত হল, একজন মুতাবাহহির ও বিশেষজ্ঞ আলেম অন্তত কোনো এক বিষয়ে ইজতিহাদি যোগ্যতা অর্জনের পর (সামগ্রিক ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও) এ কথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করেন যে, আমার ইমাম সাহেবের অমুক সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে ইমামের সিদ্ধান্ত বর্জন করে হাদীস মোতাবেক আমল করাই তার কর্তব্য।

---

৩৪৩ ইমাম আবু হামেদ আল-গাযযলী, *আল-মুসতাসফা মিন ইলমিল উসূল*, শিরকাতুল মদীনাতিল মুনাওয়ারা, সৌদী আরব ২০০৮, ২খ. পৃ- ১০৩

৩৪৪ সাআদ উদ্দীন মসউদ ইবনে উমর আত তাফতাযানী, *শারহুত তাউযীহ আলাত তালবীহ*, মাকতাবা সবীহ মিশর, ৫ম সংস্করণ ২০১০, ২খ. পৃ-১১৮

৩৪৫ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাওশীহ শরহুল জামেউস সাহীহ*, মাকতাবা আর রুশদ, ১৪১৯/১৯৯৮, পৃ–২০৪

৩৪৬ মুহাম্মদ আমীন বাদশাহ, মুস্তফা বাবী আল হালাবী, *তাইসীরুত তাহরীর*, মক্কা মুকাররমা, ২০১৫, ৪খ. পৃ-২৪৩, ৪খ. পৃ-২৪৬

আল্লামা রশীদ উদ্দীন গাঙ্গুহী (র) লিখেছেন,

> ‘এ ব্যাপারে ভিন্ন মতের কোনো অবকাশ নেই যে, ইমামের সিদ্ধান্ত কুরআ’ন সুন্নাহ পরিপন্থী প্রমাণিত হলে তা অবশ্যই বর্জনীয়। তবে প্রশ্ন হল, সাধারণ লোকের পক্ষে এ ধরনের সূক্ষ্ম বিচার ও অনুসন্ধান পরিচালনা কি করে সম্ভব?’[৩৪৭]

এ বিষয়ে সর্বোত্তম পর্যালোচনা পেশ করেছেন উপমহাদেশের সর্ব বিদ্যা বিশারদ আলেমে দ্বীন হাকেমুল উম্মাত মওলানা আশরফ আলী থানবী (র)। তার বক্তব্যটি যেহেতু এই জটিল বিষয়ে

একটি সর্বজনীন সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তাই উদ্ধৃতির কলেবর দীর্ঘ হলেও এখানে তা উল্লেখ করা সমীচিন হবে। তিনি বলেন, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাবের অধিকারী কোনো আলেম কিংবা কোনো সাধারণ লোকের (মুত্তাকী পরহেযগার আলেমের মারফত) যদি হৃদয়ের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য মাসয়ালায় (গৃহীত সিদ্ধান্তের তুলনায়) বিপরীত দিকই অধিক যুক্তিযুক্ত তাহলে দেখতে হবে যে, যে মাসয়ালার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যটি গ্রহণ করা হয়েছে, তার পক্ষে শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে আমল করার অবকাশ আছে কি নাই।

শরী‘আর দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তটির উপর আমল করার ন্যূনতম অবকাশ আছে কি নাই। থাকলে উম্মাহকে বিভেদ ও ভাঙ্গন থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত যুক্তি-দুর্বল দিকের উপর আমল করাই উত্তম। এর পক্ষে দলিল হচ্ছে নিচের হাদীসসমূহ।

كما فى حديث عائشة قالت :سألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه فى البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر فى البيت وأن ألصق بابه الأرض.

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হিজর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটি কি বায়তুল্লাহর অংশ? হযরত বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে তারা (কুরাইশরা) তা বায়তুল্লাহর মধ্যে ঢুকায়নি কেন? তখন নবীজি বললেন, তোমার স্বজাতি (কুরাইশ) যখন কাবাঘর নির্মাণ করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-এর দেয়া ভিত্তি থেকে অর্থ স্বল্পতার কারণে কিছু অংশ বাদ দিয়েছিল। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আপনিই সেই বুনিয়াদের উপর নির্মাণ করে দিন। নবীজি বললেন, কুরাইশের যুগ যদি কুফরির নিকটবর্তী না হত, (কুরাইশের উল্লেখযোগ্য লোক নওমুসলিম না হলে) আমি তাই করতাম। এখন করতে গেলে খামখা লোকদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হবে যে, মুহাম্মদ কা’বাঘর ভেঙে ফেলেছে। তাই এ কাজে এখন হাত দিচ্ছি না।’[৩৪৮]

---

৩৪৭ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, *সাবীলার রাশাদ*, মাতবা মুজতাবায়ী, দিল্লী, ১৩২২ হিজরি, পৃ- ৩০, ৩১

৩৪৮ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, দারু ইবনে কাসীর, দামেস্ক-বৈরুত, ২০০২ ও মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরাইশী আন- নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম*, দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, লেবনান ১৯৮৭,

দেখুন, যদিও মূল ইবরাহীমী বুনিয়াদের উপর কাবাঘর নির্মাণ করে দেয়ার কাজটি শরী'আর দৃষ্টিতে আগ্রাধিকারযোগ্য কাজ ছিল, তবু আরেকটি দিক অর্থাৎ কাবাঘর অপূর্ণাঙ্গ থাকাটাও যেহেতু শরী'আর দৃষ্টিতে বৈধ ছিল, তা অগ্রাধিকারযোগ্য না হলেও নবী করিম (সা) ফিতনা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর আশংকায় অপর দিকটি বেছে নিলেন।

অনুরূপ হযরত ইবনে মসউদ (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি সফরে ফরয নামায চার রাকাত পড়েন। কেউ বলল যে, আপনি সফরে (কসর না করার কারণে) উসমান (রা)-এর কাছে আপত্তি করেছিলেন; অথচ আপনি নিজেই আজকে চার রাকাত পড়লেন? তিনি বুঝিয়ে বললেন, দেখ, এখানে বরখেলাফ করতে গেলে ফেতনার কারণ হতে পারে।

এই ঘটনা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বিপরীত দিকে আমল করার অবকাশ থাকলে ফেতনা ও অনৈক্য রোধ করার উদ্দেশ্যে তা-ই করা উত্তম। কেননা, সফরে কসর করতে হবে এটিই ছিল ইবনে মসউদ (র)-এর মূল সিদ্ধান্ত। তবে তার মতে যুক্তিগত দুর্বলতা সত্ত্বেও বিপরীত দিকটিরও (অর্থাৎ চার রাকাত পড়ারও) অবকাশ ছিল। তাই তিনি ফিতনার আশংকা এড়ানোর জন্যে কসরের পরিবর্তে চার রাকাতই পড়লেন।

আর যদি বিপরীত দুর্বল দিকে আমল করার কোনো সুযোগই না থাকে। বরং আমল করতে গেলে ওয়াজিব তরক হয়ে যায় বা নাজায়েয কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে আর কিয়াস ছাড়া এই আমলের পক্ষে অন্য কোনো দলিল পাওয়া না যায়, তদুপরি সবল দিকটির পক্ষে স্পষ্ট সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকে, এমতাবস্থায় কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্ধ না করে হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। এ ধরনের মাসয়ালার ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ করা জায়েয নেই। কারণ হল, দ্বীনের আসল বুনিয়াদ হচ্ছে কুরআ'ন ও হাদীস। আর তাকলীদের দ্বারা উদ্দেশ্যও হচ্ছে কুরআ'ন ও হাদীসের উপর সহজ ও শান্তিপূর্ণভাবে আমল করা। উভয় ধরনের মাসয়ালার উপর সমন্বয় সম্ভব না হলে অবশ্যই কুরআ'ন হাদীসের উপর আমল করতে হবে। এ অবস্থায়ও যদি কেউ কুরআ'ন ও হাদীসের বিপরীতে তার মাসয়ালা নিয়ে গোঁড়ামী করে তা হবে এমন অন্ধ তাকলীদ, যার নিন্দা কুরআ'ন হাদীস ও আলেমগণের যবানীতে করা হয়েছে।

তবে এই মাসয়ালার ক্ষেত্রেও তাকলীদ বর্জন করার একই সাথে কোনো মুজতাহিদের ব্যাপারে বেআদবী করা, মন্দ কথা বলা অথবা তিনি হাদীসের বিরোধীতা করেছেন বলে অন্তরে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা জায়েয নেই। কেননা, হতে পারে যে, এই হাদীস তিনি পান নি, কিংবা দুর্বল সনদে পৌঁছেছে। কিংবা হতে পারে শরী'আর পার্শ্ব সমর্থনবাচক কোনো দলিল দিয়ে ব্যাখ্যাযোগ্য মনে করেছেন। কাজেই এখানে তিনি অপরাগ বলে বিবেচিত হবেন। হাদীসটি তিনি পান নি অজুহাতে তার জ্ঞানগত পূর্ণতাকে কটাক্ষ করাও গালমন্দ করার মধ্যে শামিল। কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরামের বেলায়ও তাদের জ্ঞানের পূর্ণতা সত্ত্বেও কোনো কোনো হাদীস একটা সময় পর্যন্ত তাদের কাছে পৌঁছায়নি। এতসত্ত্বেও তাদের জ্ঞানগত ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা হয়নি। ...

অনুরূপভাবে উক্ত মুজতাহিদের মুকাল্লিদ, মাসয়ালাটি উল্লেখিত ব্যক্তির মতো যার ভালো করে বুঝে আসেনি, এবং যে এখনও এই সুধারণা পোষণ করে যে, তিনি যে মুজতাহিদের তাকলীদ করেন, তার উক্তি হাদীসের পরিপন্থী নয়, সেই ধারণাতেই তিনি এ মাসায়ালার ক্ষেত্রে আপন ইমামের তাকলীদ করছেন এবং হাদীসকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, কিন্তু কেন তিনি মাসয়ালাটি মেনে চলছেন তাও ভাল করে বুঝেন না, তাকেও মন্দ বলা

উচিত নয়। এর কারণ হচ্ছে, তিনিও তো শরী'আর দলিলকে অবলম্বন করে আছেন এবং তার উদ্দেশ্য সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া অন্যকিছু নয়।

অনুরূপভাবে সেই মুকাল্লিদের জন্যও অনুমতি নেই যে, এমন ব্যক্তিকে তিনি মন্দ বলবেন, যিনি এই মাসয়ালায় আলোচিত প্রেক্ষাপটে তাকলীদ ত্যাগ করেছেন। কেননা, তার এই বিরোধীতা তো এমন বিষয়, যা পূর্ববর্তীদের সময় থেকে চলে আসছে। এ সম্পর্কে আলেমদের অভিমত হচ্ছে, প্রত্যেকের কাছে ধারণাগতভাবে নিজের মাযহাবই সঠিক, তবে এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনামুক্ত নয়। আর অন্য মাযহাব ধারণাগতভাবে ভুল; তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে, এর ফলে এই সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, যদি সব মাযহাব হক হয়, তাহলে একটি মাযহাবের উপর আমল করা হয় না কেন? যখন অন্যদের মধ্যেও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন কেউ গোমরাহ হয়ে গেছে, বেদাতী বা ওয়াহাবী আখ্যা দিয়ে তার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ, ঝগড়া, গীবত, গালমন্দ, অভিশাপ ও সমালোচনার বাণনিক্ষেপ প্রভৃতি আচরণ, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম, তা কীভাবে জায়েয হতে পারে।

তবে মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে যারা একমত নয় এবং মহান পূর্বসূরীদের পতি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল নয় তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী নয়। কেননা, পূণ্যাত্মা সাহাবাগণের সুমহান আদর্শ অনুসরণকারীরাই কেবল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হিসেবে পরিচয় দেওয়ার অধিকার রাখে। এ ধরনের আচরণ তাদের আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই এ ধরনের লোক আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ হয়ে গেছে এবং তারা বেদাতী ও নফসের পূজারীতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে যারা তাকলীদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে এবং কুরআ'ন হাদীসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে উভয় প্রকার মানুষ থেকে যতদূর পারা যায়, দূরে সরে থাকা প্রয়োজন। তাদের সাথে মামুলী ধরনের ঝগড়া থেকেও দূরে থাকা চাই।[৩৪৯]

এ বিষয়ে অন্যান্য মনীষীদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মওলানা আশরফ আলী থানবী (র) এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ইসলামী জাহানে শরী'আর মাসয়ালা অনুসরণের বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকদের মাঝে যে মনোমালিণ্য ও বিরোধ হয়ে থাকে তা সমাধান করার সুন্দর পথ তিনি রচনা করেছেন। এই ভারসাম্যপূর্ণ মূলনীতিটি যদি সবাই অনুসরণ করে তাহলে মুসলিম সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির সুবাতাস প্রবাহিত হতে পারে।

এই আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বিশেষজ্ঞ আলেম সহীহ ও স্পষ্ট মর্মার্থ সমৃদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে আপন মাযহাবের কোনো সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে পারেন। তবে আপন ইমামের সাথে ছোটখাট বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও তিনি সামগ্রিকভাবে সেই ইমামের মুকাল্লিদ হিসেবে গণ্য হবেন। যেমন হানাফী মাযহাবে বহু বিজ্ঞ ফকীহ এই মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফার ফতোয়ার বাইরে গিয়ে অন্যান্য ইমামের মতামতের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন।

---

৩৪৯ আশরফ আলী থানবী, *আল ইকতিসাদ ফিত তাকলীদে ওয়াল ইজতিহাদ*, কদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, বি তা; পৃ-৪২-৪৫

তৃতীয় স্তর : মুজতাহিদ ফিল মাযহাব এর তাকলীদ

তাকলীদের তৃতীয় স্তর হচ্ছে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব-এর তাকলীদ। 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' ঐসব ব্যক্তিদের বলা হয়, যারা শরী'আর মাসয়ালা উদঘাটন ও সিদ্ধান্ত দেয়ার বুনিয়াদী মূলনীতির ক্ষেত্রে কোনো পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ-এর অনুগত হন। তবে সেই মূলনীতি সমূহের ভিত্তিতে শাখা-প্রশাখাগত মাসয়ালাসমূহ সরাসরি কুরআ'ন , হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণী ইত্যাদি অবলম্বনে উদঘাটন ও সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্যতার অধিকারী। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ আপন পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের সাথে বহু শাখাগত হুকুম-আহকামে মতপার্থক্য পোষণ করে থাকেন। কিন্তু মূলনীতি অনুসরণের দিক থেকে তাদেরকে মূল ইমামের মুকাল্লিদ বলা হয়। যেমন হানাফী ফিকহতে ইমাম আবু ইউসূফ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং শাফেঈ ফিকহশাস্ত্রে ইমাম মুযনী (র) ও ইমাম আবু সূর (র), মালেকী ফিকহে সাহনূন (র) ও ইবনে কাসেম (র) আর হাম্বলী ফিকহশাস্ত্রে ইবরাহীম হারাবী (র) ও আবু বকর আল আসরাম (র)। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী এসব বুযুর্গের পরিচয় ব্যক্ত করে লিখেছেন যে,

الثانية طبقة المجتهدين فى المذهب كابى يوسف رح و محمد رح وسائر اصحاب ابى حنيفة رح القادرين على استخراج الاحكام عن الادلة المذكورة على حسب القواعد التى قررها استاذهم فانهم وان خالفوه فى بعض احكام الفروع و لكنهم يقلدونه فى قواعد الاصول.

'ফকীহগণের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছেন মুজতাহেদীন ফিল মাযহাব। যেমন ইমাম আবু ইউসূফ (র) ইমাম আহমদ (র) এবং ইমাম আবু হানিফা (র)-এর অন্যান্য সাথীগণ। যারা উল্লেখিত দলিলাদি (অর্থাৎ কুরআ'ন , সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস হতে) ঐসব মূলনীতির ভিত্তিতে মাসয়ালা উদঘাটন করার যোগ্যতা রাখেন, যে মূলনীতি তাদের উস্তাদ নির্ধারণ করেছেন। কারণ হল এসব বুযুর্গ শাখাগত কোনো কোনো বিষয়ে তাদের উস্তাদের সাথে মতপার্থক্য পোষণ করলেও আসল মূলনীতির ক্ষেত্রে আপন উস্তাদ (ইমাম)-এর অনুসারী।[৩৫০]

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুজতাহিদ ফিল মাযহাব মূলনীতির দিক থেকে মুকাল্লিদ আর শাখাগত মাসয়ালার ক্ষেত্রে মুজতাহিদ হয়ে থাকেন। এই কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রমুখ হানাফী হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর সাথে এখতেলাফ বা ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

চতুর্থ স্তর : মুজতাহিদে মুতলাক এর তাকলীদ

তাকলীদের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের স্তর। মুজতাহিদে মুতলাক বা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ হচ্ছেন এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে ইজতিহাদের যাবতীয় শর্তাবলী পাওয়া যায়। তিনি তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বলে স্বয়ং কুরআ'ন ও হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করার মূলনীতি প্রণয়ন করতে পারেন। সেই মূলনীতির আলোকে কুরআ'ন মাজীদ থেকে শরী'আর হুকুম-আহকামও উদঘাটন করার সক্ষমতা রাখেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম শাফেঈ (র) ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহমদ (র) প্রমুখ। এসব মুজতাহিদ মূলনীতি ও শাখা প্রশাখা উভয় ক্ষেত্রে মুজতাহিদ হয়ে থাকেন। কিন্তু তাদেরকেও এক ধরনের তাকলীদ করতে হয়। তার ধরন হচ্ছে, যে যে মাসয়ালার

---

৩৫০ ইবনে আবেদীন, *শরহে উকূদে রাসমুল মুফতী*, মাতবুআ দারুল ইশাআ, করাচি ১৩৭৮ হি. পৃ-৪

ক্ষেত্রে কুরআ'ন মাজীদ ও সহীহ সুন্নাতের মধ্যে কোনো বিবরণ নেই সেখানে এসব বুযুর্গগণ অধিকন্তু এ কথার চেষ্টা করেন যে, নিজের রায় বা কিয়াস দ্বারা ফয়সালা দেয়ার পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ীদের মধ্য হতে কারো কথা বা কাজের সাথে সঙ্গতি পাওয়া যায় কিনা দেখেন। যদি এ রকম কোনো উক্তি বা কর্মগত উদাহরণ পেয়ে যান, এসব বুযুর্গ সেই উক্তি বা কর্মগত উদাহরণের তাকলীদ করেন। তিন কল্যাণযুগে এ ধরনের তাকলীদের কয়েকটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(১) এই কর্মপন্থার আসল হচ্ছে হযরত উমর (রা)-এর সেই লিখিত পত্র, যা তিনি কাজী শুরাইহ-এর কাছে লিখেছিলেন। ইমাম শাবী বলেন,

عن شريح ان عمر بن الخطاب رض كتب اليه ان جاءك شيئ فى كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال فان جاءك ما ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقض بها فان جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر مااجتمع عليه الناس فخذ به فان جاءك ماليس فى كتاب الله ولم يكن فى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر اى الامرين شئت ان شئت ان تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم و ان شئت ان تتأخر فتأخر ولا ارى التأخر الا خيرا لك.

'হযরত শুরাইহ বলেন, হযরত উমর (রা) তার কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, যদি তোমার সামনে এমন কোনো মাসয়ালা উপস্থিত হয় যার সমাধান আল্লাহর কিতাবে আছে, তাহলে সেই মাসয়ালা মোতাবেক ফায়সালা দান করবে। এ অবস্থায় লোকদের নিজস্ব মতামত তোমাকে এ পথ থেকে যেন বিরত না রাখে। আর যদি তোমার কাছে এমন কোনো মাসয়ালা আসে, যা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নেই, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত দেখবে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দান করবে। আর যদি তোমার কাছে এমন কোনো মাসয়ালা আসে, যা সমাধান আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নেই বা এ সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুন্নাতও বিদ্যমান নেই, তাহলে তুমি এমন কোনো কথার অনুসন্ধান কর যে কথার উপর আগেকার লোকেরা একমত হয়েছিল এবং সে অনুযায়ী আমল কর। আর যদি তোমার কাছে এমন কোনো মাসয়ালা আসে, যা আল্লাহর কিতাবে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত-এর মধ্যেও নাই এবং সে ব্যাপারে তোমার আগে কেউ (কোনো ফকীহ) কথা বলেনি, তাহলে দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো একটি তুমি গ্রহণ করতে পার। একটি হল নিজের চিন্তা থেকে ইজতিহাদ করে পদক্ষেপ নিতে চাইলে নাও আর যদি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে সরে আসতে চাও সরে এসো। আমি তোমার জন্য পেছনে সরে আসার মধ্যে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু দেখি না।'[৩৫১]

৩৫১ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান দারেমী, *সুনানে দারেমী*, মদীনা মুনাওয়ারায় মুদ্রিত, ১৩৮৬ হিজরি, ১খ. পৃ-৫৫

লক্ষ্য করুন, হযরত শোরাইহ (রা) একজন পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ ছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাকে তার নিজস্ব ইজতিহাদি মতামতের উপর আমল করার পরামর্শ তখনই দিয়েছেন, যখন তিনি ঐ বিষয়ে আগেকার ফকীহদের কারো মতামত না পাবেন।

সুনানে দারেমীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি যায়েদ (র)-এর একটি বক্তব্যও উল্লেখিত হয়েছে যে,

كان ابن عباس رض اذا سئل عن الامر فكان فى القران اخبر به وان لم يكن فى القران و كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر به فان لم يكن فعن ابى بكر و عمر فان لم يكن قال فيه برأيه

'হযরত ইবনে আব্বাসকে যদি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হত, তার জওয়াব কুরআ'ন মজীদে থাকলে তিনি সে অনুযায়ী জবাব দিতেন। যদি কুরআ'ন মজীদে সে বিষয়ে কোনো ফায়সালা না থাকত এবং সে বিষয়ে নবী করিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস থাকত, তাহলে তিনি সে অনুযায় জবাব দিতেন। আর যদি সুন্নাহর মধ্যেও না পেতেন, তাহলে হযরত আবু বকর (রা) ও উমর (রা) হতে কোনো বক্তব্য প্রমাণিত হলে সে অনুযায়ী জবাব দিতেন আর যদি সেখানেও না পেতেন তবে তার নিজের ইজতিহাদি রায় অনুযায়ী আমল করতেন।[৩৫২]

عن الشعبى قال جاءه رجل فسأله عن شىء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا و كذا قال اخبرنى انت برأيك فقال الا تعجبون من هذا اخبرته عن ابن مسعود ويسألنى عن رأيى و دينى عندى آثر من ذالك والله لان اتغنى اغنية احب الى من ان اخبرك برأيى.

'ইমাম শা'বী (র)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে কোনো একটি মাসয়ালা জানতে চাইল। তিনি জবাব দিলেন যে, এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র)-এর মতামত আছে। লোকটি বলল, আপনি আমাকে আপনার মতামত কি তা বলুন। ইমাম শা'বী তখন লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের কি এ বিষয়ে অবাক লাগে না যে, আমি তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ-এর ফতোয়ার কথা বলছি আর সে আমার রায় জানতে চায়? আমার দ্বীন আমার কাছে (তার কামনা-বাসনা পূরণ করার চেয়ে) অনেক বেশি অগ্রগণ্য। আল্লাহর কসম, (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) এর মোকাবিলায় তোমাদের সামনে আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরাফেরা অনেক পছন্দনীয়।'[৩৫৩]

এখানেও ইমাম শা'বী একজন মুজতাহিদে মুতলাক বা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ, তিনি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর উস্তাদ। তিনি নিজের ইজতিহাদী মতামতের মোকাবিলায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (র)-এর তাকলীদ করাকে অধিক পছন্দ করেছেন।

---

৩৫২ প্রাগুক্ত

৩৫৩ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দির রহমান দারেমী, *সুনানে দারেমী*, মদীনা মুনাওয়ারায় মুদ্রিত, ১৩৮৬ হিজরি,১খ. পৃ-৪৫

উপসংহার

উপসংহারে আমি বলতে চাই যে, ইসলামের শিক্ষা ও চেতনার মূলকথা মানুষকে সর্ববস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। এমনকি মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) এর আনুগত্যের যে হুকুম দেয়া হয়েছে তাও প্রকারান্তরে আল্লাহরই আনুগত্যেরই হুকুম। কেননা, নবী করিম (সা) কথা ও কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম আহকামের বাস্তব নমুনাই উপস্থাপন করেছেন। কাজেই হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয প্রতিটি বিষয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করাই ইসলামী জীবন ধারার মূলকথা। কেউ যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের পরিবর্তে অন্য কোনো মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে আনুগত্য পাওয়ার হকদার মনে করে এবং কুরআ'ন ও হাদীসের বিধিবিধানকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন কানুনকে অবশ্য পালনীয় বলে বিশ্বাস করে তাহলে সে ব্যক্তি ইসলামের আওতার বাইরে চলে যাবে এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হল আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য বা কুরআ'ন-হাদীসের হুকুম আহকামের অনুকরণ অনুসরণ কীভাবে করা সম্ভব হবে? কুরআ'ন ও সুন্নাহর পর্যালোচনা করলে দুই ধরনের বিধিবিধান পাওয়া যায়। এক ধরনের হুকুম-আহকাম খুবই স্পষ্ট, যার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা পরস্পর সাংঘর্ষিক কোনো ভাবার্থ থাকে না ; যে কেউ পড়ে কোনোরূপ সংশয়ে পতিত হওয়া ব্যতিরেকে তার মর্ম ও বক্তব্য পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যেমন, নামায, রোজা, যাকাত ও হজ্জ এর ফরযিয়ত। অনুরূপভাবে হত্যা, মদ্যপান, চুরি রাহাজানী হারাম হওয়ার বিষয়। এসব হুকুম অকাট্য ও সর্বসম্মত এবং তাতে কোনো গবেষণা বা তাকলীদের প্রয়োজন হয় না।

নবী করিম (সা) হতে বর্ণিত কোনো কোনো হাদীসও অপর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো কোনো বর্ণনা অনুসারে নবীজি অজুর অঙ্গগুলো তিনবার ধুয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় একবার করে ধুয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে ফরয বা মুস্তাবহাব নির্ণয় বা কুরআ'ন হাদীসের বিধিবিধান পালনের জন্য আমাদেরকে গবেষণার আশ্রয় নিতে হবে। এর জন্য আমরা দু'ভাবে কাজ করতে পারি। একটি হল, আমরা নিজেরাই এসব ব্যাপারে ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমল করব। দ্বিতীয় পন্থা হল, এসব ব্যাপারে নিজেরা সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রথমে দেখব, কুরআ'ন ও হাদীসের এসব নির্দেশনা সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ ইমামগণ কী করেছেন। অর্থাৎ কুরআ'ন ও হাদীসের শিক্ষা ও বিধিবিধানের ব্যাখ্যায় আমাদেরকে বুযুর্গ ইমামগণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হবে।

এর মধ্যে প্রথম ধরনটি অবশ্যই বিপজ্জনক। কারণ, সাধারণ মানুষের এমন নিশ্চয়তা নেই যে, তারা কুরআ'ন ও হাদীসের এ জাতীয় বিষয়ে নিজেরা সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কর্মপন্থাটি নিরাপদ। অর্থাৎ কুরআ'ন ও সুন্নায় বিতর্ক বা দ্ব্যর্থ গ্রহণের সুযোগ আছে এমন বিষয়াদিতে যদি নিজেদের উপর নির্ভর না করে পূর্ববর্তী বুযুর্গ আলেম ও ইমামগণ যা বলে গেছেন তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করি তাহলে আমরা সঠিক পথটি খুঁজে পাব। এই কাজটির অর্থ হল তাকলীদ। কুরআ'ন হাদীসের দৃশ্যত বিরোধ আছে বা অস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট– এমন হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে ইমাম বা মাযহাবের অনুকরণ করার নামই তাকলীদ।

এখানে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইমাম বা মুজতাহিদের তাকলীদ কেবল তখনই করা যাবে, যখন কুরআ'ন ও হাদীসের হুকুম স্পষ্ট বুঝা সম্ভব না হবে। ইমাম বা মুজতাহিদ কিংবা মাযহাবের তাকলীদের অর্থ কিছুতেই এটা নয় যে, ইমাম, মুজতাহিদ বা মাযহাবকে স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিবুল ইতাআত বা অবশ্য অনুকরণীয় মনে

করা হবে। এর মর্ম হচ্ছে অনুকরণ ও অনুসরণ তো কুরআ'ন ও হাদীসেরই করা হবে। তবে কুরআ'ন ও সুন্নাতের অনুকরণ করার প্রয়োজনে কুরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্য আইনের ব্যাখ্যাতা হিসেবে ইমাম বা মুজতাহিদের বক্তব্যের উপর আস্থা স্থাপন করা হবে। এ কারণেই শরী'আর নিশ্চিত ও অকাট্য হুকুম আহকামের ব্যাপারে কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ জরুরী নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে তাকলীদ ছাড়াই আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর হুকুম আহকাম সহজে বুঝা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, যিনি তাকলীদ করেন বা মুকাল্লিদ, তিনি তো নিজের ইমাম বা মাযহাবকে শরী'আর মূল উৎস মনে করেন না। কেননা, শরী'আর মূল উৎস হচ্ছে কুরআ'ন ও হাদীস এবং তার পরে ইজমা ও কিয়াস। কিন্তু এরপরও ইমামের মতামতের অনুকরণ এ জন্য করা হয় যে, তিনি যেহেতু কুরআ'ন ও হাদীসের ব্যাপারে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রাখেন সেহেতু তিনি কুরআ'ন হাদীসের যে ভাবার্থ বুঝেছেন তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ও আস্থা রাখার মতো। এখানে তাকলীদের কোন জিনিসটি গুনাহ, নাজায়েয বা হারাম, তা আমাদের বুঝে আসে না।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও যারা নিজেদেরকে ইজতিহাদ ও ইস্তেম্বাত এর যোগ্য মনে করতেন না, তারা ফকীহ সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতেন। তারা বিজ্ঞ সাহাবীরা যে মতামত দিতেন সে ব্যাপারে দলিল প্রমাণ খোঁজ করতেন না। বরং তাদের বাৎলানো মাসয়ালার উপর আস্থা রেখে আমল করতেন।

পরবর্তীকালে আমাদের ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও পুরোধাগণ যেহেতু পরিস্থিতির নাজুকতা ও গণমানুষের শিরা বুঝতেন, তারা সিদ্ধান্ত দিলেন যে, আগের মতো মুতলাক বা মুক্ত তাকলীদ এর দরজা খোলা রাখা যাবে না। কারণ তাতে প্রত্যেকের মনে যখন যে ইমামের কথা নিজের স্বার্থের অনুকুলে দেখবে, তাকে অনুসরণ করার প্রবণতা সৃষ্টি হবে, এবং তা শেষ পর্যন্ত দ্বীনী হুকুম আহকামকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করবে। এ কারণে শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী পূর্ববর্তী ইমামগণের এই সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এখন থেকে অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের পরবর্তী যুগ থেকে একজন মাত্র ইমাম বা একটি মাত্র মাযহাবের তাকলীদ করতে হবে। একেক সময় একেকজন ইমামের আনুগত্য করার সুযোগ কোনো মতেই দেওয়া যাবে না। ইমামগণের এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল পরবর্তী যুগের মানুষের মধ্যে কামনা বাসনার পূজা বা নিজের সুযোগ ও স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা মারাত্মক রোগে পরিণত হয়, যা শেষ পর্যন্ত কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। হাওয়া বা কামনা বাসনা পূজার এ ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে কুরআ'ন মজীদে অনেক জায়গায় সতর্ক করা হয়েছে।

কামনা বাসনার পূজা বা শরী'আর হুকুম আহকামকে নিজের স্বার্থ ও ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করার যে আশংকা আমরা প্রকাশ করলাম তার কারণ হচ্ছে, যারা নফসের পূজারী হয়ে শরী'আ পালনে গড়িমসি করেন তাদের দুটি ধরন আছে। একটি হল, মানুষ ভালো কাজকে ভালো এবং মন্দ কাজকে মন্দ হিসেবে জানে। কিন্তু নফসের ধোঁকায় পড়ে বা কামনা বাসনার বশবর্তী হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের নফস পূজা হল, মানুষ নফসের পূজায় এতখানি দাসত্বের পর্যায়ে চলে যায় যে, হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করে। এ পর্যায়ে গেলে সে ব্যক্তি আর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। শেষোক্ত প্রকারের কামনা বাসনার পূজা নিশ্চিতভাবেই প্রথম প্রকারের চেয়ে মারাত্মক। প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে নিজের গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে তাওবা করার সুযোগ থাকে। দ্বিতীয় প্রকার নফস পূজার ক্ষেত্রে তওবার কোনো সুযোগ থাকে না।

উম্মাহর দরদী ফকীহগণ উপলব্ধি করেন যে, যদি তাকলীদের ক্ষেত্রে মনগড়াভাবে যখন যেভাবে মন চায় একেক ইমাম বা মাযহাবের তাকলীদ করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে কেউ হয়ত সচেতনভাবে আর অধিকাংশই অবচেতন মনে শরী'আ লঙ্ঘন করবে এবং শরী'আ তখন হ য ব র ল হয়ে যাবে। উদাহগরণ স্বরূপ একজনের অযু অবস্থায় শীতকালে শরীর থেকে রক্ত নির্গত হল , তখন সে ইমাম শাফেঈ (র) এর মাযহাবের অনুসরণ করল। কারণ ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে ওজু ভেঙে যাবে আর ইমাম শাফেঈ (র) এর মাযহাব মতে অযু ভাংবে না। একটু পরেই তার সামনে আরেকটি ব্যাপার আসল, কোনো মহিলার গায়ে হাত লাগলে ইমাম শাফেয়ীর মতে ওজু ভেঙে যায় আর ইমাম আবু হানিফার মতে ওজু ভাঙে না। এখন লোকটি নিজের সুবিধার কথা চিন্তা করে ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের অনুসরণ করল এবং ওযু ছাড়াই নামায পড়ল। এভাবে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে চিন্তা করুন।

আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, কেবল চার মাযহাবের কেন তাকলীদ করা হবে, অন্যান্য হক্কানী ইমামগণের কেন তাকলীদ করা যাবে না। আমরা মূল অভিসন্দর্ভে বিশেষজ্ঞদের মতামত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছি যে, চার মাযহাব ছাড়া অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব তাকলীদে বাধ্যবাধকতা না থাকা বা জায়েয না হওয়ার কারণ এটি নয় যে, তারা নাহক্ক ছিলেন। বরং এর আসল কারণ হল, অন্য সব মুজতাহিদ ইমামের ফিকহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তাবলী সংরক্ষিত নেই। তাদের মাযহাবও যদি চার ইমামের মাযহাবের মতো বিস্তারিত, সংরক্ষিত ও গুছানো থাকত, তাহলে তাদের তাকলীদ করতে কোনো অসুবিধা হত না। এখন যেহেতু তাদের উপস্থাপিত মাসয়ালাগুলো গুছানো ও সংকলিত নাই, যা অনুসরণ করে মুসলিম সমাজ সঠিক পথ ধরে চলতে পারে এবং তাদের দোহাই দিয়ে কেউ স্বার্থ হাসিল বা মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা করার সুযোগ না পায় সেহেতু তাদের অনুকরণ বা তাকলীদ করা যাবে না।বাস্তব অবস্থা হচ্ছে একমাত্র আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের চারজন ইমামের মাযহাবেই মুসলিম উম্মাহর ব্যক্তিগত ও সামাজিক যাবতীয় বিষয় সুবিন্যস্ত আকারে বিদ্যমান আছে। যা অনুসরণ করে মানুষ হেদায়তের পথ লাভ করতে পারে।

দুঃখজনক সত্য হল, আমাদের যুগে আহলে হাদীস নামের একটি সম্প্রদায় একমাত্র নিজেদেরকে হকপন্থী বলে দাবি করছে। তারা হাদীসপন্থী বলে দাবি করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেন। যদি কোনো হাদীসকে তাদের নিজস্ব মতবাদের বিপক্ষে পান সে হাদীস যয়ীফ, মওযু বা ইত্যাকার আখ্যা দিয়ে হাদীস সম্বন্ধে এবং এতদিনকার মুসলিম সমাজের আচরিত রীতিনীতি সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করে চলেছেন। তারা নিজেদেরকে সালাফী বা সালফে সালেহীন অতীতের বুযর্গ ওলামাদের অনুসারী হওয়ার দাবিদার হিসেবে প্রচার করেন। কিন্তু যেভাবে পূর্ববর্তী ইমামগণের সমালোচনা করেন তাতে তারা কোনো অবস্থাতেই আক্ষরিক অর্থে সালাফী হতে পারেন না। তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত ও চার ইমামের অনুসারীদেরকে গোমরাহ বলেন।

শরী'আর বিভিন্ন মাসয়ালার ব্যাপারে যদি তারা উদাহরণ স্বরূপ বলতেন যে, তারাবীহ নামায আট রাকাত, তবে বিশ রাকাতও জায়েয, কিংবা বিতিরের নামায আমাদের দৃষ্টিতে এক রাকাত। কিন্তু তিন রাকাত পড়াও বৈধ; তাহলে একটি ধর্মীয় সহনশীলতার পরিবেশ থাকত এবং যুগ যুগ ধরে ফিকহশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলো এবং মাযহাবসমূহ সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হত না। এই লোকেরা নিজেদেরকে মাযহাব বিরোধী প্রচার করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেরা মাযহাব না-মানা বা লা-মাযহাবি হিসেবে আলাদা একটি জামাত সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তারাও তো সরাসরি কুরআ'ন ও হাদীস থেকে মাসয়ালা উদঘাটন করেন না; সাধারণ লা-মাযহাবী লোকের পক্ষে তা

সম্ভবও নয়। বরং তাদের মধ্যকার আগের বা সমসাময়িককালের কিছু লোকের লিখুনি পড়ে এ জাতীয় মতবাদ প্রচার করছেন। কাজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা ঐসব আনাড়ী লোকদের তাকলীদ করছেন, বই লিখলেও ইজতিহাদের যোগ্যতা যাদের নেই।

আমরা আবারো উল্লেখ করতে চাই যে, সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে মানুষের মনে যেহেতু তাকওয়ার ভাবধারা প্রবল ছিল, তারা মুক্ত তাকলীদ বা কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে তাকলীদ না করলেও সমস্যা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং মানুষের মধ্যে সুবিধাবাদী প্রবণতার বিস্তার লাভ করেছে। এমতাবস্থায় শরী'আ খেলনার বস্তুতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ইমাম বা মাযহাবের তাকলীদ করার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইজতিহাদের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তারা কখন কতটুকু নিজস্ব মতামত ভিত্তিক রায় বা ইজতিহাদী ফতোয়া দিতে পারবেন, তারও সীমারেখা বিশ্লেষণ করেছি।

এ পর্যন্ত আমরা তাকলীদের পক্ষে কুরআ'ন সুন্নাহ ও বুযুর্গানে দ্বীনের উদ্ধৃতি দিয়ে তাকলীদের বৈধতা ও প্রয়োজনীতা তুলে ধরেছি। তাকলীদের বিভিন্ন স্তরের কথাও ব্যক্ত করেছি। যারা তাকলীদের বিরোধীতা করেন বা কথায় কথায় বলেন যে, মাযহাব মানা যাবে না, মাযহাব মানা মানে কুরআ'ন ও সুন্নাহকে অস্বীকার করা তাদের উত্তরগুলো সবিস্তারে উপস্থাপন করেছি। মূলত কুরআ'ন হাদীসের সঠিক অনুসরণ করার স্বার্থেই তাকলীদের প্রয়োজন। মুসলিম সমাজে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা এবং কুরআ'ন হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যার পথ বন্ধ করার জন্যই যোগ্যতম ইমামের তাকলীদ বা মাযহাব মানার বিকল্প নেই। আমরা এ কথাও প্রমাণ করেছি যে, ইসলামী উম্মাহ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, যে চারটি মাযহাবকে হক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ কারো নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআ'ন

২. আল-কুরআ'নুল করিম (অনুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০১০

৩. আত-থানবী, আশরফ আলী ইবনে আব্দুল হক আত-থানবী, (১৮৬৩–১৯৪৩ খ্রি.) ***আল- ইকতিসাদ ফিত তাকলীদে ওয়াল ইজতিহাদ,*** কদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি, বি তা।

৪. আত-তাবরীযী: আবু আবদুল্লাহ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (০০০–৭৪১ হি. ০০০–১৩৪০ খ্রি.), ***মিশকাতুল মাসাবীহ,*** আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫/১৯৮৫ খ্রি.

৫. আত-তাবারানী: আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), ***মুসনদুশ শামিয়ীন,*** মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবনান, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. ১৯৮৪ খ্রি.

৬. আত-তাবারানী: আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), ***আল-মু'জামুল আওসাত,*** দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, ১৪১৫ হি. / ১৯৯৪ খ্রি.

৭. আত-তাবারানী: আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), ***আল-মু'জামুল কবীর,*** মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.

৮. আত-তিরমিযী: মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. / ৮২৪–৮৯২ খ্রি.), ***আল-জামি'উল কবীর আস-সুনান,*** মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ খ্রি.

৯. আত-তৈয়ব, আব্দুল হুসাইন আত তৈয়্যব, (১৩১২/১৮৯৩–১৪১১/১৯৯০) ***আতয়াবুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআ'ন***, সৈয়দ আব্দুল হুসাইন আত-তৈয়ব, বুনিয়াদে ফারহাঙ্গে ইসলামী, তেহরান, ইরান, ১৪১৭ হিজরি

১০. আত-তাফতাযানী, সা'দ উদ্দীন মসউদ ইবনে উমর আত তাফতাযানী (৭৯২ হিজরি) ***শারহুত তাউযীহ আলাত তালবীহ,*** মাকতাবা সবীহ, মিশর, ৫ম সংস্করণ ২০১০খ্রি.

১১. আদ-দারিমী: আবু মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল ফযল ইবনে বাহরাম আদ-দারিমী আত-তামীমী আস-সামারকন্দী (১৮১–২৫৫ হি.৭৯৭–৮৬৯ খ্রি.), ***আস-সুনান আল-মুসনদ,*** দারুল মুগনী লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী', সুউদী আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি.২০০০ খ্রি.

১২. আদ-দেহলভী, ওলীউদ্দীন আব্দুর রহীম ইবনে ওজীহুদ্দীন, প্রকাশ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), (১৭০৩–১৭৬২) ***আল-ইনসাফ ফি বয়ানে সবীলিল ইখতিলাফ,*** দারুন নাফায়েস, বৈরুত, ১৯৮৬খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আদ-দেহলভী: ওলীউদ্দীন আব্দুর রহীম ইবনে ওজীহুদ্দীন, প্রকাশ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), (১৭০৩–১৭৬২) **হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা,** শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী, মাকতাবা সালাফিয়া লাহোর, ২০০৫ খ্রি.

১৪. আদ-দেহলভী: ওলীউদ্দীন আব্দুর রহীম ইবনে ওজীহুদ্দীন, প্রকাশ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র), (১৭০৩–১৭৬২) ***ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদে ওয়াত তাকলীদ,*** মাতবা মুজতাবায়ী, দেহলভী, ১৩৪৪ হি;

১৫. আদ-দিয়ার বকরী : হুসায়ন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আদ-দিয়ার বকরী (০০০–৯৬৬ হি./০০০–১৫৫৯ খ্রি.), ***তারিখুল খমীস ফী আহওয়ালি আনফুসিন নাফিস,*** দারু সাদির, বৈরুত, লেবানন ২০০৩খ্রি.

১৬. আদ-দারাকুতনী: শায়খুল ইসলাম আলী ইবনে আমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী ইবনে মাসউদ ইবনুন নু'মান ইবনে দীনার আল-বাগদাদী আদ-দারাকুতুনী (৩০৬–৩৮৫ হি. ৯১৮–৯৯৫ খ্রি.), ***আস-সুনান,*** মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবনান, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.

১৭. আন-নাসাফী: আবুল বারাকাত হাফিযুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন-নাসাফী (০০০–৭১০ হি./ ০০০–১৩১০ খ্রি.), ***মনারুল আনওয়ার ফী উসুলিল ফিকহ,*** মতবায়ে আহমদ কামিল, কায়রো, মিসর, ১৩২৬ হি. = ১৯০৮ খ্রি.

১৮. আন-নাসাফী : আবুল বারাকাত, হাফিযুদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন-নাসাফী (০০০–৭১০ হি./০০০–১৩১০ খ্রি.), **কাশফুল আসরার শরহুল মুসান্নিফ আলাল-মানার,** দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবনান, ২০০৫খ্রি.

১৯. আনওয়ার শাহ আল-কাশ্মীরী: মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ ইবনে মু'আয্‌যম শাহ আল-কাশ্মীরী আল-হিন্দী আদ-দেওবন্দী (১২৯২–১৩৫৩ হি. ১৮৭৫–১৯৩৪ খ্রি.), **আল-আরফুশ শাযীয়ি শরহু সুনানিত তিরমিযী**, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, লেবনান, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.

২০. আন-নববী: আবু যাকারিয়া মুহউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আন-নববী (৬৩১–৬৭৬ হি./১২৩৩–১২৭৭ খ্রি.), **আল-আরবাঊনান নববিয়া**, দারুল মিনহাজ, বৈরুত, লেবনান, প্রথম সংস্করণ: ১৪৩০ হি. = ২০০৯ খ্রি.

২১. আন-নববী: আবু যাকারিয়া মুহউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আন-নববী (৬৩১–৬৭৬ হি./১২৩৩–১২৭৭ খ্রি.), **আল-মিনহাজ শরহু সহীহহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ**, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, লেবনান, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯২ হি. = ১৯৭২ খ্রি.

২২. আন-নববী: আবু যাকারিয়া মুহউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আন-নববী (৬৩১–৬৭৬ হি./১২৩৩–১২৭৭ খ্রি.), **আল-আযকারুন নাববিয়া**, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবনান, নতুন সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

২৩. আন-নববী: আবু যাকারিয়া মুহউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আন-নববী (৬৩১–৬৭৬ হি./১২৩৩–১২৭৭ খ্রি.), **তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন ১৯৮৭খ্রি.

২৪. আন-নববী: আবু যাকারিয়া মুহউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আন-নববী (৬৩১–৬৭৬ হি./১২৩৩–১২৭৭ খ্রি.), **আল মাজমু' শারহিল মাযাহিব,** মাকতাবাতুল ইরশাদ, নতুন সংস্করণ, ২০০৮খ্রি.

২৫. আন-নাসায়ী: আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫–৩০৩ হি. = ৮৩০–৯১৫ খ্রি.), **আল-মুজতাবা মিনাস সুনান = আস-সুনানুস সুগরা**, মাকতাবুল মতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.

২৬. আন-নাসায়ী : আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫–৩০৩ হি. = ৮৩০–৯১৫ খ্রি.), সুনানুন নাসায়ী, মাকতাব আল-মাতবুআতিল ইসলামিয়া, বৈরুত ২০১১খ্রি.

২৭. আন-নাসায়ী: আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুআইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহর ইবনে দীনার আল-খুরাসানী আন-নাসায়ী আল-কবীর (২১৫–৩০৩ হি. = ৮৩০–৯১৫ খ্রি.), **আয-যু'আফা ওয়াল মতরুকূন**, দারুল ওয়া'য়ী আল-আরবী, হলব, মিসর, প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.

২৮. আন-নুবাইরী, শাহাব উদ্দীন আহমদ আন-নুবাইরী, (১২৭৯–১৩৩৩ খ্রি.), **নাহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব,** ফারসি তরজমা: ড. মাহমূদ মাহদাবী দামেগানী, আমীর কবির প্রকাশনী, তেহরান, ইরান, ১৯৮৬খ্রি.

২৯. আন-নাবলুসী, আব্দুল গণি ইবনে ইসমাঈল ইবনে আব্দুল গণি আন নাবলুসী (১০৫০/১৬৪১–১১৪৩/১৭৩১) **খোলাসাতুত তাহকীক ফী হুকমিত তাকলীদ ওয়াত তালফীক,** মাকতাবাতুত হাকীকা, তুরস্ক, ১৪৩২/২০১১খ্রি.

৩০. আবু দাউদ: আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশির আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২–২৭৫ হি. = ৮১৭–৮৮৯ খ্রি.), **আস-সুনান**, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত, লেবনান, ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.

৩১. আবু দাউদ আত-তায়ালিসী: আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনুল জারূদ আত-তায়ালিসী (১৩৩–২০৪ হি. = ৭৫০–৮১৯ খ্রি.), **আল-মুসনদ**, দারুল হিজরা, কায়রো, মিসর, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.

৩২. আবু হানিফা: আবু হানিফা আন-নু'মান ইবনে সাবিত ইবনে যূতী ইবনে মাহ আত-তায়মী আল-কূফী (৮০–১৫০ হি. = ৬৯৯–৭৬৭ খ্রি.), **আল-ফিকহুল আকবর**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. আবু আওয়ানা: আবু আওয়ানা, ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আন-নায়শাপুরী (০০০–৩১৬ হি. = ০০০–৯২৮ খ্রি.), **আল-মুসতাখরাজ**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.

৩৪. আবুল হাসান আল-আমাদী: আবুল হাসান, সাইয়েদুদ্দীন আলী ইবনে আবু আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিম আস-সা'লাবী আল-আমাদী (৫৫১–৬৩১ হি. = ১১৫৬–১২৩৩ খ্রি.), **আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম**, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন ও দামিশক, সিরিয়া, ২০১১খ্রি.

৩৫. আবদুল কাদির আল-কুরাশী: আবু মুহাম্মদ মুহ্উদ্দীন আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নসরুল্লাহ আল-কুরাশী (৬৯৬–৭৭৫ হি. = ১২৯৭–১৩৭৩ খ্রি.), **আল-জাওয়াহিরুল মাযিয়া ফী তাবাকাতিল হানাফিয়া,** মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান।

৩৬. আবদুল হাই লাখনবী: আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-লাখনবী আল-হিন্দী (১২৬৪–১৩০৪ হি. = ১৮৪৮–১৮৮৭ খ্রি.), **আল-আসারুল মারফূআ ফিল আখবারিল মাওযূআ**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন প্রথম সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.

৩৭. আবদুল হাই লাখনবী: আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আবদুল হাই ইবনে মুহাম্মদ আবদুল হালীম আল-আনসারী আল-লাখনবী আল-হিন্দী (১২৬৪–১৩০৪ হি. = ১৮৪৮–১৮৮৭ খ্রি.), আত-তাওশীহ আলাত তালবীহ শরহিত তাওজীহ লিমাতনিত তানকীহ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত ২০১২খ্রি.

৩৮. আয-যুরকানী: আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে শাহাবউদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আয-যুরকানী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), মানাহিলুল ইরফান ফী উলুমিল কুরআ'ন , আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া, কায়রো, ২০০৩ খ্রি.

৩৯. আয-যারকা, মুস্তফা আহমদ যারকা, আল মাদখালুল ফিক্বহিল আম ইলাল হুকুকিল মাদানিয়্যা, (১৯০৪–১৯৯৯), **মাতবাআ জামেয়া সুরিয়া**, দামেশক, ১৯৫৮, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫২ হিজরী

৪০. আয-যারকাশী: বদরুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ বাহাদুর ইবনে আবদুল্লাহ আয-যারকাশী (৭৪৫–৭৯৪ হি. ১৩৪৪–১৩৯২ খ্রি.), **আল-বোরহান ফী উলুমিল কুরআ'ন** , দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবিয়া, বৈরুত, ১৯৫৭খ্রি.

৪১. আয-যুবাইদী : আবুল ফয়য মুরতুযা মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রায্যাক আল-হুসাইনী আয-যুবাইদী (১১৪৫–১২০৫ হি.= ১৭৩২–১৭৯০ খ্রি.), **ইতহাফে সাদাতিল মুত্তাকীন**, আল মাতবাআতুল মাইমানিয়া, কায়রো, ১৯৯৪খ্রি.

৪২. আয-যুবাইদী: আবুল ফয়য, মুরতুযা, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রায্যাক আল-হুসাইনী আয-যুবাইদী (১১৪৫–১২০৫ হি. = ১৭৩২–১৭৯০ খ্রি.), **উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা ফী আদিল্লাতি মাযহাবিল ইমাম আবী হানীফা মিম্মা ওয়াফাকা ফিহিল আইয়িম্মাতিস সিত্তা আও আহাদিহিম,** এইচ এম সাঈদ কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. আয-যাহাবী: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা**, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবনান, ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.

৪৪. আয-যাহাবী: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দামিশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), **মীযানুল ই'তিদাল ফী নকদির রিজাল**, দারুল মা'রিফা লিত-তাবা'আ ওয়ান নাশার, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৩৮২ হি. = ১৯৬৩ খ্রি.)

৪৫. আয-যাহাবী: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), **তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায = তাবকাতুল হুফ্‌ফায**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.

৪৬. আয-যাহাবী: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), **আল-কাশিফু ফী মা'রিফাতি মান লাহু রিওয়ায়াতুন ফিল কুতুবিস সিত্তা**, দারুল কিবলা লিস-সাকাফাতিল ইসলামিয়া, জিদ্দা, সৌদি আরব, ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.

৪৭. আয-যাহাবী: শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), **যিকরু আসমায়ি মান তাকাল্লামা ফিহি ওয়াহুয়া মূওয়াসসাকুন**, মাকতাবাতুল মানার, যুরকা, জর্ডান, ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.

৪৮. আয-যায়লায়ী: আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ আয-যায়লায়ী (০০০–৭৬২ হি. = ০০০–১৩৬০ খ্রি.), **নাসবুর রায়া লি আহাদীসিল হিদায়া**, দারু নাশরিল কুতুব আল-ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ: ১৩৫৭ হি. = ১৯৩৮ খ্রি.

৪৯. আল কান্নুজী, আবুত তৈয়্যব মুহাম্মদ সিদ্দিক খান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল হুসাইনী আল বুখারী আল কান্নুজী, (০০০–১৩০৭ হিজরি) **ফতহুল বয়ান ফী মাকাসিদিল কুরআ'ন ,** মাকতাবাতুল আসরিয়া, সায়দা, লেবনান, ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.

৫০. আল-মাদানী, শায়খ মুহাম্মদ, (১৯০৭–১৯৬৮) **আল ইত্তিহাফাতুস সানিয়্যা ফিল আহাদীসিল কুদসিয়া**, লাজনাতুল কুরআ'ন ওয়াস সুন্নাহ, মিসর, ২০০১

৫১. আল-জিলানী, আব্দুল কাদের আল-জিলানী, (১০৭৮–১১৬৬) **আল-ফাতহুর রব্বানী ওয়াল ফায়যুর রহমানী,** দারুর কুতুবিল ইলমিয়া, কায়রো, ২০০৩

৫২. আল-আইনী, বদরুদ্দীন, আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইবনু আহমদ ইবনি মুসা ইবনি আহমদ আল-আইনী (৭৬২–৮৫৫ হি. = ১৩৬১–১৪৫১ খ্রি.), উমদাতুল কারী শারহে সহীহিল বুখারী, ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ২০১০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. আল-হাকিম: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.): **মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৭ হি. = ১৯৭৭ খ্রি.

৫৪. আল-বুখারী, মুহাম্মদ সিদ্দিক হাসান খান আল কুনুজি আল বুখারী, **আত-তাজুল মুকাম্মাল মিন জাওয়াহিরি মাআসিরিত তারাযিল আখির ওয়াল আউয়াল, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনুল ইসলামিয়া, কাতার, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৮ হি. = ২০০৭ খ্রি.**

৫৫. আল-বায্যার: আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল খালিক ইবনে খাল্লাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আতাকী আল-বায্যার (০০০–২৯২ হি. = ০০০–৯০৫ খ্রি.), **আল-মুসনদ = আল-বাহরুয যাখ্খার**, মকতবাতুল উলূম ওয়াল হাকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪–১৪২৯ হি. = ১৯৮৮–২০০৯ খ্রি.

৫৬. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), **শুআবুল ঈমান**, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.)

৫৭. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), **আল-মদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা**, দারুল খুলাফা লিল-কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবনান, ২০১৫

৫৮. আল-বায়হাকী: আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), **আস-সুনানুল কুবরা**, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্‌রমা, সৌদি আরব, ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.

৫৯. আল-বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), **মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার**, জামিয়াতুদ দারাসাত আল-ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান, প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.

৬০. আল-বায়হাকী: আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), **দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরিয়ত**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৬১. আল-লালাকায়ী: আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনে মানসূর আত-তাবারী আর-রাযী আল-লালাকায়ী (০০০–৪১৮ হি. = ০০০–১০২৭ খ্রি.), **শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআত**, দারু তাইয়িবা, রিয়াদ, সৌদি আরব, অষ্টম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.

৬২. আল-খতীবুল বগদাদী: আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), **আল-জামিউ লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'**, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৯৯৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. আল-খতীবুল বগদাদী: আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), **আল-ফকীহ ওয়াল মুত্তাফিকা**, দারুল ইফতা মুদ্রণালয়, সৌদি আরব, রিয়াদ, ১৩৮৯ হিজরি।

৬৪. আল-খতীবুল বগদাদী: আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), **আল কেফায়া ফি ইলমির রেওয়ায়া,** আল মাকতাবাতুল ইলমিয়া, মদীনা মুনাওয়ারা, ২০১০

৬৫. আল-খতীবুল বগদাদী: আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.),

৬৬. আল-খতীবুল বগদাদী: আবু বকর আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), **তারীখু মদীনাতিস সালাম ওয়া আখবারু মুহাদ্দিসীহা ওয়া যিকরু কুত্তানিহাল উলামা মিন গায়রি আহলিহা ওয়া আরদীহা = তারীখু বগদাদ**, দারুল গারব আল-ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

৬৭. আল-খতীব তাবরীযী, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ খ্রি.

৬৮. আল-মাকদিসী: তকী উদ্দীন আবু মুহাম্মদ আবদুল গনী ইবনে আলী ইবনে সুরূর আল-মাকদিসী আল-জাম্মায়ীলী আদ-দামিশকী আল-হাম্বলী (৫৪১–৬০০ হি. = ১১৪৬–১২০৩ খ্রি.), **আখবারুদ দাজ্জাল**, দারুস সাহাবা, মিসর, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.

৬৯. আল-বুখারী: হিবরুল ইসলাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.), **আত-তারীখুল কবীর**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবনান, ২০০০ খ্রি.

৭০. আল-বুখারী: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.), **কিতাবুয যুআফা আস-সগীর**, মাকতাবাতু ইবনি আব্বাস, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৫ খ্রি.

৭১. আল-বুখারী: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.), **আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ**, দারু তওকিন নাজাত, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.

৭২. আল-কালাবাযী: আবু নাসার আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনুল হাসান আল-বুখারী আল-কালাবাযী (৩২৩–৩৯৮ হি. = ৯৩৫–১০০৮ খ্রি.), ***রিজালু সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. আল-হাকিম: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুলাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), **আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন**, মাকতাবাতু আন-নাসার, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৩৮৮ হি. = ১৯৬৮ খ্রি.

৭৪. আল-হাকিম: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুলাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), **তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুমুল বুখারী ও মুসলিম ওয়া মানফারা কুল্লা ওয়াহিদিম মিনহুমা**, মুআস্‌সিসাতুর কুতুব, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.

৭৫. আল-হায়সামী: আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী আল-কাহিরী আল-মিসরী (৭৩৫–৮০৭ হি. = ১৩৩৫–১৪০৫ খ্রি.), **মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ**, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৭৬. আল-মক্কী, সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে আলভী আল-মালিকী আল-মক্কী (০০০–১৪২৪ হি. = ০০০–২০০২ খ্রি.), **আল-মানহালুল লাতীফ ফী উসূলিল হাদীস আশ-শরীফ**, মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতনিয়া, মদীনা মুনাওওয়ারা, সৌদি আরব, সপ্তম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.

৭৭. আল-উকায়লী: আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা ইবনে হাম্মাদ আল-উকায়লী আল-মক্কী (০০০–২২৩ হি. = ০০০–৯৩৪ খ্রি.) **আয-যু'আফউল কবীর**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, মিসর, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.

৭৮. আল-কাস্‌তাল্লানী: আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্‌তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), **ইরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহ আল-বুখারী**, আল-মাকতাবাতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো, মিসর, সপ্তম সংস্করণ: ১৩২৩ হি. = ১৯০৫ খ্রি.

৭৯. আল-বাজী, আবুল ওয়ালীদ, সুলায়মান ইবনে খলফ ইবনে সা'দ ইবনে ওয়ারিস আত-তাজীবী আল-কুরতুবী আল-বাজী আল-উনদুলুসী (৪০৩–৪৭৪ হি. = ১০১২–১০৮১ খ্রি.), **আত-তা'দীলু ওয়াত তাখরীজ লিমান খারাজা লাহুল বুখারী ফিল জামিয়িস সহীহ**, দারুল লিওয়া, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.

৮০. আল-ইয়াফিয়ী: আফীফুদ্দীন আবুল্লাহ ইবনে আস'আদ ইবনে আলী আল-য়াফী (৬৯৮–৭৬৮ হি. = ১২৯৮–১৩৬৭ খ্রি.), **মিরআতুল জিনান ওয়া ইবরাতুল য়াকযান ফী মা'রিফাতি মা য়ু'তাবারু মিন হাওয়াদিসিয যামান**, দারুল কিতাব আল-ইসলামী, কায়রো, মিসর, ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.

৮১. আল-গাযালী: হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তূসী (৪৫০–৫০৫ হি. = ১০৫৮–১১১১ খ্রি) **ইয়াহয়াউ উলূমিদ্দীন**, দারুল মারিফা, বৈরুত, লেবনান, ১৯৯১ খ্রি.

৮২. আল-গাযালী: হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু হামিদ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী আত-তূসী (৪৫০–৫০৫ হি. = ১০৫৮–১১১১ খ্রি), **আল-মুসতাশফা**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৩ হি. = ১৯৯৩ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. আল-রাযী, ফখরুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনুল হাসান ইবনুল হুসাইন আত-তায়মী আর-রাযী (৫৪৪–৬০৬ হি. = ১১৫০–১২১০ খ্রি.), **মাফাতীহুল গায়ব = আত-তাফসীরুল কবীর**, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, লেবানন, তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.

৮৪. আল-কাত্তানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফয়য জা'ফর ইবনে ইদরীস আল-হাসানী আল-ইদরীসী আল-কাত্তানী (১২৭৪–১৩৪৫ হি. = ১৮৫৭–১৯২৭ খ্রি.), **আর-রিসালাতুল মুসতাত্‌রাফা লি-বায়ানি মশহুরি কুতুবিস সুন্না আল-মুশরিফা**, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন, ষষ্ঠ সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.

৮৫. আল-জাযায়িরী, তাহির ইবনে সালিহ (মুহাম্মদ সালিহ) ইবনে আহমদ ইবনে মাওহাব আস-সামউনী আল-জাযায়িরী আদ-দামিশকী (১২৬৮–১৩৩৮ হি. = ১৩৫২–১৯২০ খ্রি.), **তাওজীহুন নযর ইলা উসূলিল আসার**, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়া, হলব, মিসর, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.

৮৬. আল-মিয্‌যী: আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনুয যকী আবু মুহাম্মদ আল-কাযাযী আল-কলবী আল-মিয্‌যী (৬৫৪–৭৪২ হি. = ১২৫৬–১৩৪১ খ্রি.), **তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল**, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০০ হি. = ১৯৮০ খ্রি.

৮৭. আল-মারগীনানী: বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল জলীল আল-ফিরগানী আল-মারগীনানী (৫৩০–৫৯৩ হি. = ১১৩৫–১১৯৭ খ্রি.), **আল-হিদায়া ফী শরহি বিদায়াতুল মুবতাদী**, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, লেবনান, ১৯৮২ খ্রি.

৮৮. আল-মুনযিরী: আবু মুহাম্মদ যকীউদ্দীন আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কওয়ী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুনযিরী (৫৮১–৬৫৬ হি. = ১১৮৫–১২৫৮ খ্রি.), **আত-তরগীব ওয়াত তারহীব**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

৮৯. আল-জাস্‌সাস : আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আল-জাস্‌সাস (৩০৫–৩৭০ হি. = ৯১৭–৯৮০ খ্রি.), **আহকামুল কুরআ'ন** , দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.

৯০. আল-কারদারী: মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনুল বায্‌যার আল-কারদারী (০০০–৭২৭ হি. =০০০–১৩২৬ খ্রি.), **মানাকিবু ইমামিল আ'যম আবী হানীফা**, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান, ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.

৯১. আল-কাযবীনী, আবুল ইয়া'লা, খলীল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল খলীল আল-কাযবীনী (০০০–৪৪৬ হি. = ০০০–১০৫৪ খ্রি.), **আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতি ওলামায়িল হাদীস**, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.

৯২. আল-জূযেজানী: আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আস-সা'দী আল-জূযাজানী (০০০–২৫৯ হি. = ০০০–৮৭৩ খ্রি.), **আহওয়ালুর রিজাল**, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৯৩. আল-আজলী: আবুল হাসান আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালিহ আল-আজলী আল-কূফী (১৮১–২৬১ হি. = ৭৯৭–৮৭৫ খ্রি.), **মা'রিফাতুস সিকাত মিন রিজালি আহলিল ইলমি ওয়াল হাদীস ওয়া মিনায যুআফা ওয়া যিকরু মাযাহিবিহিম ওয়া আখবারিহিম**, মাকতাবাতুদ দার, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, ১৪০৫ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.

৯৪. আল-মুওয়াফ্ফাক মক্কী: আবুল মুওয়াইয়িদ, আল-মুওয়াফ্ফাক ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-মক্কী আল-খাওয়ারিযমী (৪৮৪–৫৬৮ হি. = ১০৯১–১১৭৬ খ্রি.), মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা, দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত, প্রথম সংস্করণ: ১৩১১ হি. = ১৮৯৩ খ্রি.

৯৫. আল-খাওয়ারিযমী: আবুল মুওয়াইয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-খুওয়ারিযমী (৫৯৩–৬৫৫ হি. = ১১৯৭–১২৫৭ খ্রি.), ***জামিউল মাসানীদ***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.

৯৬. আল-আসবাহানী: আবু নুআইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩–৪৩০ হি. = ৯৪৮–১০৩৮ খ্রি.), **মুসনাদু ইমাম আবী হানীফা**, মাকতাবাতুল কওসার, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.

৯৭. আল-আসবাহানী: আবু নুআইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩–৪৩০ হি. = ৯৪৮–১০৩৮ খ্রি.), **তারীখু আসবাহান = আখবারু আসবাহান**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.

৯৮. আল-বালাযূরী: আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবির ইবনে দাউদ আল-বালাযূরী (০০০–২৭৯ হি. = ০০০–৮৯২ খ্রি) **ফুতূহুল বুলদান**, দারু আল-কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.

৯৯. আল-হামাবী, আবু আবদুল্লাহ শিহাবুদ্দীন ইয়াকূত ইবনে আবদুল্লাহ আর-রূমী আল-হামাবী (৫৭৪–৬২৬ হি. = ১১৭৮–১২২৯ খ্রি.), **মু'জামুল বুলদান**, দারু সাদর, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.

১০০. আল-আসবাহানী : সদরুদ্দীন, আবু তাহির আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-আসবাহানী (৪৭৮–৫৭৬ হি. = ১০৮৫–১১৮০ খ্রি.), **আত-তুয়ূরিয়াত**, মাকতাবাতু আযওয়াসিস সলফ, রিয়াদ সৌদি, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

১০১. আল-আকফানী: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সায়িদ আল-আনসারী আস-সানজারী আল-আকফানী (০০০–৭৪৯ হি. = ০০০–১৩৪৮ খ্রি.), **ইরশাদুল কাসিদ ইলা আসনাল মাকাসিদ ফী আনওয়ায়িল উলুম**, দারুল ফিকর আল-আরবী, কায়রো, মিসর।

১০২. আল মুজাদ্দিদী, মুফতি সৈয়দ আমীমুল ইহসান (১৯১১–১৯৭৪), তারীখে ইলমে ফিকহ, মাকতাবা বুরহান, উর্দু বাজার, জামে মসজিদ দিল্লী।

১০৩. আলমগীরি, ইমাম নিজামুদ্দীন আল বালখী ও একদল শীর্ষস্থানীয় আলেম সম্পাদিত ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি, মাকতাবাতুল কুবরা আল আমিরিয়া, মিশর, ১৩১০ হিজরি

Dhaka University Institutional Repository

১০৪. আল-মাইবেদী, আবুল ফযল আহমদ ইবনে আবি সাআদ ইবনে আহমদ ইবনে মেহরীযদ মাইবেদী (মৃ. ৫৩০), তাফসীরে কাশফুল আসরার ওয়া উদ্দাতুল আবরার, ইন্তেশারাতে আমীর কবির, তেহরান, ইরান, ১৯৬৫ খ্রি.

১০৫. ইবরাহীম ইবনে মূসা আল লাখমী আশ মাতেবী, আল মুওয়াফেকাত ফী উসুলিস শরী'আ, দারুল কুতু আল ইলমিয়া, বৈরুত, ২০০৪,

১০৬. আল-উসামানী, মুফতি মুহাম্মদ শফী ইবনে মুহাম্মদ ইয়াসীন আল-উসামানী, (১৮৯৭–১৯৭৬), তাফসীরে মাআরেফুল কুরআ'ন , অনুবাদ: মওলানা মুহিউদ্দীন খান, সৌদী আরব মুদ্রিত, তা বি।

১০৭. আল-হারাবী, আবু উবাইদ আল কাসেম ইবনে সালাম আল-হারাবী আল-বাগদাদী (১৫৭/৮৩৮–২২৪হি./৭৭৪ খি.), **কিতাবুল আমওয়াল,** দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৬ খ্রি.

১০৮. আল-বাগদাদী, শাহাব উদ্দীন আল-আলুসী আল-বাগদাদী (১৮০২- ১৮৫৪) **রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম ওয়াস সাবঈল মাসানী,** দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি.

১০৯. আল-কাদেরী, মুহাম্মদ তাহের আল কাদের (১৯৫১) নাস ও তাবীরে নাস, মিনহাজুল কুরআ'ন পাবলিকেশন্স, উর্দু বাজার, লাহোর, ২০১৩ খ্রি.

১১০. আল-হাসকফী: সদরুদ্দীন, মুসা ইবনে যাকারিয়া আল-হাসকফী (০০০–৬৫০ হি. = ০০০–১২৫২ খ্রি.), ***মুসনদুল ইমামিল আযম***, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

১১১. আল-ওয়াযীর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-ওয়াযীর (১৩৫৭–১৪৪০) **আল মুসাফফা ফী উসুলিল ফিকহ**, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৭/১৯৯৬ খ্রি.

১১২. আল-ওয়াযিরী, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল ওয়াযিরী (৭৭৫-৮৪০ হি.) আল-আওয়াসেম ওয়াল কাওয়াসেম ফিয যাব্বে আন সুন্নাতি আবিল কাসেম, মুদ্রণে মুআসসা আর রিসালা, ১৪১২/ ১৯৯২ খ্রি.

১১৩. আল-খারেযামী, জালাল উদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীনআল খারেযামী, (৭৬৭) **কিফায়া ফী শারহিল হিদায়া,** দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৮১ খ্রি.

১১৪. আল-কুরতুবী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ফারাহ আল-আনসারী শামসুদ্দীন আল কুরতুবী (মৃ. ৬৭১) **আল-জামে লি আহকামিল কুরআ'ন ,** দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৫ খ্রি.

১১৫. আল-জাওহারী, আবু নসর ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ আল-জওহারী (মৃ. ৩৯৩হি/১০০৩), তাজুল লুগা ওয়া সিহাহুল আরবিয়া, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৯৯ খ্রি.

১১৬. আল-কালকাশান্দী, আবুল আব্বাস আল কালকাশান্দি (মৃ. ৮২১–১৪১৮) সুবহুল আ'শা ফী সানাআতিল ইনশা, আল-কুতুবুল ইসলমিয়া, বৈরুত ২০১২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১১৭. আল-খাযেনী, আবুল ফাতাহ আব্দুর রহমান মুনসূর আল-খাযেনী (১১শতক–১২শতক), মীযানুল হিকমত, মাতবা দায়েরাতুল মাআরিফুল উসমানিয়া, হায়দারবাদ, ভারত, ১৯৩৯ খ্রি.

১১৮. আল-হায়সামী, হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বকর ইবনে সুলায়মান আল-হায়সামী, (৭৩৫/১৩৩৫–৮০৭/১৪০৫) মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪/১৯৯৪ খ্রি.

১১৯. আল-মুবারকপূরী, মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রহীম আল মুবারকপূরী, (১৮৬৭–১৯৩৫) তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে আত তিরমিযী, মুআসসিসাতুর রিসালা, কায়রো ২০১৫ খ্রি.

১২০. আল-বান্নানী, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল-বান্নানী (১১৩৩/১৭২৭–১১৯৪/১৭৮০), **হাশিয়াতুল বান্নানী আলা শরহে জামইল জাওয়ামে**, মাকতারা তেজারিয়া আল-কুবরা, মিসর, ১৪২৭ হিজরি।

১২১. আল-বুখারী, মুহাম্মদ আমীন ইবনে মাহমূদ আল বুখারী প্রকাশ আমীর বাদশাহ আল-বুখারী (০০০-৯২৭/০০০-১৫৬৫), **তাইসীরুত তাহরীর শরহে কিতাবুত তাহরীর**, মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবী, বৈরুত ২০১৫ খ্রি.

১২২. আল-হানাফী, আলা উদ্দীন আব্দুল আযীয ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-বুখারী আল-হানাফী (মৃ. ৭৩০হিজরি), কাশফুল আসরার শরহে উসুলুল বযদভী, দারুল কুতুব আল-ইসলামি, কায়রো, ২০১০ খ্রি.

১২৩. আলী আল-কারী: নুরুদ্দীন, মোল্লা, আলী ইবনে (সুলতান) মুহাম্মদ আল-হারওয়ী আল-কারী (০০০–১০১৪ হি. = ০০০–১৬০৬ খ্রি.), **মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ**, দারুল ফিকর, দামিস্ক, সিরিয়া, প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.

১২৪. আস-সাম্বালী: মুহাম্মদ হাসান আস-সাম্বালী (০০০–১৩০৫ হি. = ০০০–১৮৮৭ খ্রি.), **তানসীকুন নিযাম ফী মুসনাদিল ইমাম আ'যম**, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান।

১২৫. আস-সুবকী: তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহহাব ইবনে তকীউদ্দীন আস-সুবকী (৭২৭–৭৭১ হি. = ১৩২৭–১৩৭০ খ্রি.), **তাবাকাতুস শাফিয়া আল-কুবরা**, দারুল হিজরা, কায়রো, মিসর, তৃতীয় সংস্করণ: ১৪১৩ হি. = ১৯৯২ খ্রি.

১২৬. আস-সুয়ুতী: জালাল উদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), **তাবয়ীযুস সহীফা বি-মানাকিবি আবী হানীফা**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.

১২৭. আস-সুয়ুতী: জালাল উদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), আল-আলফিয়াতু আলা ইলমিল হাদীস, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.

১২৮. আস-সুয়ুতী: জালাল উদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), **তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী**, দারুল তাইয়িবা, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪১১ হি.১৯৯১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১২৯. আস-সুয়ুতী: জালাল উদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.): □ ***তাবাকাতুল হুফ্ফায***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.

১৩০. আস-সুয়ুতী, জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), **আল-হাওয়ী লিল-ফাতাওয়া,** দারুল ফিকর লিত-তাবাআ ওয়ান-নাশর, বৈরুত, লেবনান, ১৪২৪ হি./ ২০০৪ খ্রি.

১৩১. আস-সুয়ুতী, জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), **আদ দুররুল মনসূর ফিত তাফসীরিল মাসূর,** জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪৩২/২০১১ খ্রি.

১৩২. আস-সুয়ুতী, জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), **আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআ'ন** ওয়াযারাতুশ শূউনিল ইসলামিয়া ওয়াল ইরশাদিস সাউদিয়া, সৌদী আরব, ২০০৮ খ্রি.

১৩৩. আস-সুয়ুতী, জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), ***মিফতাহুল জান্নাত ফিল ইহতিজাজু বিস-সুন্নাহ***, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.

১৩৪. আস-সুয়ুতী, জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), **তারীখুল খুলাফা**, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্‌রমা, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.

১৩৫. আস-সামারকান্দী, আবু বকর আলা উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবি আহমদ আস- সামারকান্দী (মৃ. ৪৫০/১১৪৫) তোহফাতুল ফোকাহা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৫/ ১৯৮৪ খ্রি.

১৩৬. আশ-শরকাভী, আব্দুল্লাহ ইবনে হিজাযী ইবনে ইবরাহীম আশ শরকাভী (১২২৭–১১৫০ হিজরি) **ফাতহুল মুবদি বিশারহে মুখতাসারুয যুবাইদী**, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত লেবানন, ১৯১৯ খ্রি.

১৩৭. আশ–শে'রানী, আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল আনসারী আশ–শে'রানী (৮৯৮–৯৭৩ হিজরি).**কিতাবুল মীযান,** মাকতাবা তারীমুর হাদীসা, বৈরুত, ১৮৬১-৬২ খ্রি.

১৩৮. আশ-শাহরাস্তানী: আবুল ফতহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল কারীম ইবনে আবু বকর আহমদ আশ-শাহরাস্তানী (৪৭৯–৫৪৮ হি. ১০৮৬–১১৫৩ খ্রি.), **আল-মিলাল ওয়ান নিহাল**, দারুল মাআরিফ, বৈরুত, লেবানন, , প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.

১৩৯. আশ-শাফিয়ী: ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে উসমান ইবনে শাফি' ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদু মুনাফ আশ-শাফিয়ী আল-মুত্তালাবী আল-কুরাশী আল-মক্কী (১৫০–২০৪ হি. = ৭৬৭–৮২০ খ্রি.), **আল-মুসনদ**, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৩৭০ হি. = ১৯৫১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৪০. আশ-শওকানী: মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শওকানী আল-ইয়ামানী (১১৭৩–১২৫০ হি. = ১৭৫৯–১৮৩৪ খ্রি.), **ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহকীকিল হক মিন ইলমিল উসূল**, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.

১৪১. আহমদ রেযা খান, ইবনে নাকী আলী খান কাদেরী বেরলভী (১২৭২–১৩৪০ হিজরি/ ১৮৮৬-১৯২১ খ্রি.) ফাতাওয়া রাজাবিয়া, রেযাখান ফাউন্ডেশন, লাহোর পাকিস্তান, ১৯৯৪ খ্রি.

১৪২. আর-রাফিয়ী: আবুল কাসেম আবদুল কারীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল কারীম আর-রাফিয়ী আল-কাযওয়ীনী (৫৫৭–৬২৩ হি. = ১১৬২–১৯৮৭ খ্রি.), **আত-তাদবীন ফী আখবারি কাযবীন**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৭ খ্রি.

১৪৩. আর-রামাহুরমুযী: আবু মুহাম্মদ কাযী আল-হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আর-রামাহুরমুযী আল-ফারসী (০০০–৩৬০ হি. = ০০০–৯৭০ খ্রি.), **আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বায়নার রাওয়ী ওয়াল ওয়ায়ী**, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, তৃতীয় সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.

১৪৪. ইবনে মনসুর: আবু উসমান সাঈদ ইবনে মানসুর ইবনে শু'বা আল-খুরাসানী আল-জূযাজানী (০০০–২২৭ হি. = ০০০–৮৪২ খ্রি.), **আস-সুনান**, আদ-দারুস সালাফিয়া, মোম্বাই, ভারত, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ১৯৮২ খ্রি.

১৪৫. ইবনে খল্লিকান : আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে খল্লিকান আল-বারমাকী আল-ইরবিলী (৬০৮–৬৮১ হি. = ১২১১–১২৮২ খ্রি.), **ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আম্বাউ আবনায়িয যামান**, দারু সাদির, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭১ খ্রি.

১৪৬. ইবনে খলদুন: আবু যায়েদ অলীউদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন আল-খাযরামী আল-ইশবীলী (৭৩২–৮০৮ হি. = ১৩৩২–১৪০৬ খ্রি.), **দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী তারীখিল আরব ওয়াল বারবার ওয়া মিন আসিরিহিম মিন যাওয়ীশ শানিল আকবর = তারীখু ইবনে খলদুন,** দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.

১৪৭. ইবনে কসীর: আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি.১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), **আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া**, দারূল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ১৪০২ হি. ১৯৮২ খ্রি.

১৪৮. ইবনে কসীর: আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), **তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.

১৪৯. ইবনে হাজর আসকলানী: আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৫০. ইবনে হাজর আসকলানী: আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***ফতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা লিত-তাবাআ ওয়ান নাশার, বৈরুত, লেবানন, ১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.

১৫১. ইবনে হাজর আসকলানী: আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***হাদউস সারী মুকাদ্দিমাতু ফতহিল বারী শরহি সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, ১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.

১৫২. ইবনে হাজর আসকলানী: আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), **তাহযীবুত তাহযীব**, দায়িরাতুল মা'আরিফ আন-নিযামিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩২৬ হি. = ১৯০৮ খ্রি.

১৫৩. ইবনে কসীর: আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি.= ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), **আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ, আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া মুদ্রিত, ১৪০৪/১৯৮৪ খ্রি.**

১৫৪. ইবনে কসীর: আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি.= ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), **লিসানুল মীযান**, মুআস্সাতুল আ'লামী, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯০ হি. = ১৯৭১ খ্রি.

১৫৫. ইবনে খুযায়মা: শায়খুল ইসলাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা ইবনুল মুগীরা ইবনে সালিহ ইবনে বকর আস-সুলামী আন-নায়শাপুরী আশ-শাফিয়ী (২২৩–৩১১ হি. = ৮৩৮–৯২৩ খ্রি.), **আস-সহীহ**, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবানন, ১৩৯০ হি. = ১৯৭০ খ্রি.

১৫৬. ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), **আল-মুসনদ**, মুআস্সিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.

১৫৭. ইবনুল জাওযী: আবুল মুযাফ্ফর জামালুদ্দীন ইউসুফ ইবনে ফারাগল ইবনে আবদুল্লাহ আল বাগদাদী সিবত ইবনুল জাওযী (৫৮১–৬৫৪ হি. = ১১৮৫–১২৫৬ খ্রি.), ***আল-ইনতিসার ওয়াত তারজীহ লিল মাযহাবিস সহীহ***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৯৯৫খ্রি.

১৫৮. ইবনুল জাওযী: আবুল ফারাজ জামাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওযী (৫০৮–৫৭৯ হি. = ১১১৬–১২০১ খ্রি.): ***আল-মুনতাযাম ফী তারিখিল উমাম ওয়াল মুলূক***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.

১৫৯. ইবনুস সালাহ: তকী উদ্দীন আবু আমর উসমান ইবনে আবদুর রহমান আশ-শাহরাযুরী (৫৫৭–৬৪৩ হি. = ১১৬১–১২৪৫ খ্রি.), ***মা'রিফাতু আনওয়ায়ি উলূমিল হাদীস = মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.

১৬০. ইবনে ফাহদ: তকী উদ্দীন আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হাশিমী আল-আলওয়ী আল-আসফূনী আল-মক্কী আশ-শাফিয়ী (৭৮৭–৮৭১ হি. = ১৩৮৫–১৪৬৬ খ্রি.), **লাহযুল আলহায বি-**

Dhaka University Institutional Repository

যায়লি তাবাকাতিল হুফ্‌ফায, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবনান, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯৮ খ্রি.

১৬১. ইবনে মাঈন: আবু যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ইবনে আওন ইবনে যিয়াদ ইবনে বিসতাম ইবনে আবদুর রহমান আল-মুররী আল-বগদাদী (১৫৮–২৩৩ হি. = ৭৭৫–৮৪৮ খ্রি.), **তারিখু ইবনি মাঈন**, মারকাযুল বাহস আল-ইলমী, মাক্কাতুল মুকাররামা, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৯ হি. = ১৯৭৯ খ্রি.

১৬২. ইবনে আনাস: ইমামে দারুল হিজরা আবু আব্দিল্লাহ আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী আল-হিময়ারী (৯৩–১৭৯ হি. = ৭১২–৭৯৫ খ্রি.), **আল-মুয়াত্তা**, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, ১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.

১৬৩. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জাওযিয়া (৬৯১–৭৫১ হি. = ১২৯২–১৩৫০ খ্রি.), **ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন-রব্বিল আলামীন**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.

১৬৪. ইবনে তাইমিয়া : তকী উদ্দীন আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী আল-হাম্বলী আদ-দামিশকী (৬৬১–৭২৮ হি. = ১২৬৩–১৩২৮ খ্রি.) আল-ফাতাওয়াল কুবরা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, কায়রো, ২০১০ খ্রি.

১৬৫. ইবনে তাইমিয়া: তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী আল-হাম্বলী আদ-দামিশকী (৬৬১–৭২৮ হি. = ১২৬৩–১৩২৮ খ্রি.), **আল-মুসাওয়াদা ফী উসূলিল ফিকহ**, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত, লেবনান, ২০০৪ খ্রি.

১৬৬. ইবনে মাজাহ: ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯–২৭৩ হি. = ৮২৪–৮৮৭ খ্রি.), **আস-সুনান**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.

১৬৭. ইবনে আবু হাতিম: আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০–৩২৭ হি. = ৮৫৪–৯৩৮ খ্রি.), ***আল-জারহ ওয়াত তা'দীল***, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত ও দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৩৭১ হি. = ১৯৫২ খ্রি.

১৬৮. ইবনে সা'দ: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮–২৩০ হি. = ৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, দারু সাদির, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.

১৬৯. ইবনুল জা'দ: আবুল হাসান, 'আলী ইবনুল জা'দ ইবনি 'ওবাইদ আল-হাশিমী আল-জাওহারী (১৩৩–২৩০ হি. = ৭৫০–৮৪৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, মুআস্‌সাসাতু নাদির, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৯০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৭০. ইবনে হিব্বান: আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মু'আয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.), **আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান**, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.

১৭১. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মু'আয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.), **আল-মজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন ওয়ায যুআফা ওয়াল মাতরূকুন**, দারুল ওয়া'য়ী আল-আরবী, হলব, মিসর, প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৬ হি. = ১৯৭৬ খ্রি.)

১৭২. ইবনে আমীর হাজ: আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ = ইবনে আমীর হাজ = ইবনুল মওয়াক্কিত আল-হানাফী (৮২৫–৮৭৯ হি. = ১৪২২–১৪৭৪ খ্রি.), **আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. = ২০৮৩ খ্রি.)

১৭৩. ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী: আবু মুহাম্মদ, মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা আল-জামায়ীলী আল-মাকদিসী আল-দামিশকী আল-হানবলী (৫৪১–৬২০ হি. = ১১৪৭–১২২৩ খ্রি.), **রওযাতুন নাযের ওয়া জান্নাাতুল মানাযির**, দারুর রাইয়ান লিত-তাবাআতি ওয়ান নশর, বৈরুত, লেবানন (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৩ হি. = ২০০২ খ্রি.)

১৭৪. ইবনে আবদুল হাদী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল হাদী ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী আল-জামাঈলী আস-সালিহী আদ-দিমাশকী আল-হাম্বলী (৭০৫–৭৪৪ হি. = ১৩০৫–১৩৪৩ খ্রি.), **মুখতাসারু তাবাকাতি উলামায়িল হাদীস**

১৭৫. ইবনে আসাকির: তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৪৯৯–৫৭১ হি. = ১১০৫–১১৮৬ খ্রি.), **তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিক্‌রু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতাযু বনূহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা**, দারুল জীল, বৈরুত, লেবানন (১৪১২ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

১৭৬. ইবনে আবু শায়বা: আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান ইবনে খাওয়াসিতী আবু শায়বা আল-আবাসী (১৫৯–২৩৫ হি. = ৭৭৬–৮৪৯ খ্রি.), **আল-মুসানড়বাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার**, মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৭৭. ইবনে নুকতা: আবু বকর, মুঈনুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল গনী ইবনে আবু বকর ইবনে শাজাআ ইবনে নুকতা আল-হাম্বলী (৫৭৯–৬২৯ হি. = ১১৮৩–১২৩১ খ্রি.), **আত-তাকয়ীদু লি-মা'রিফাতি রুওয়াতিস সুনান ওয়াল মাসানীদ**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবনান

১৭৮. ইবনে মানজূইয়া: আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে মানজূইয়া (০০০–৪২৮ হি. = ০০০–১০৩৭ খ্রি.), **রিজালু সহীহ মুসলিম**, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন (১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯. ইবনে হাযম: আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ ইবন হাযম আল-উনদুলুসী আয-যাহিরী (৩৮৪–৪৫৬ হি. = ৯৯৫–১০৬৩ খ্রি.), **আল-ফসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন (১৩৯৭ হি. = ১৯৭৭ খ্রি.)

১৮০. ইবনুল হাজ: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাজ আল-আবদরী (০০০–৭৩৭ হি. = ০০০–১৩৩৬ খ্রি.), **মদখালুশ শর'ই আশ-শরীফ**, দারুত তুরাস, বৈরুত, লেবনান

১৮১. ইবনে আবদুল বর : আবু ওমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বর আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি. = ৯৮৭–১০৭১ খ্রি.), **জামিউ বয়ানিল ইলম ওয়া ফযলিহি**, দারু ইবনিল জাওযী, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১৮২. ইবনে আবদুল বার্‌র : আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বার্‌র আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি. = ৯৮৭–১০৭১ খ্রি.): **আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব**, দারুল জীল, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১৮৩. ইবনে আবদুল বার: আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বার্‌র আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি. = ৯৮৭–১০৭১ খ্রি.), **আত-তামহীদু লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিনাল মাআনী ওয়াল আসানীদ**, ওয়াযারাতু উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়া, মরক্কো (১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ খ্রি.

১৮৪. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়া: মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সা'দ আল-জাওযিয়া (৬৯১–৭৫১ হি. = ১২৯২–১৩৫০ খ্রি.), **ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন আন-রব্বিল আলামীন**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.

১৮৫. ইবনুল জওযী: আবুল ফরজ জামাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযি (৫০৮–৫৭৯ হি. = ১১১৬–১২০১ খ্রি.), **সিফাতুস সাফওয়া**, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর, ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.

১৮৬. ইবনে আবিদীন: মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আযীয আবিদীন আদ-দামিস্কী আল-হানাফী (১১৯৮–১২৫২ হি. = ১৭৮৪–১৮৩৬ খ্রি.), **রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী**, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.

১৮৭. ইবনুল আকফানী: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সায়িদ আল-আনসারী আস-সানজাওয়ী (০০০–৭৪৯ হি. = ০০০–১৩৪৮ খ্রি.), **ইরশাদুল কাসিদ ইলা আসনাল মাকাসিদ ফী আনওয়ায়িল উলুম**, দারুল ফিকর আল-আরবী, কায়রো, মিসর, ১৯৯৮ খ্রি.

১৮৮. ইবনুল হাজ্জাজ; আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), **আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ**, দারু ইহয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯. ইবনুল হাজ্জাজ; আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), **আল-কুনা ওয়াল আসমা**, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব, ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.

১৯০. ইবনুল হাজ: আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল হাজ আল-আবদরী (০০০–৭৩৭ হি. = ০০০–১৩৩৬ খ্রি.), **মাদখালুশ শর'ই আশ-শরীফ**, দারুত তুরাস, বৈরুত, লেবনান, ১৯৯৬ খ্রি.

১৯১. ইবনুল হুমাম: কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে মাসউদ আস-সিওয়াসী আল-ইসকান্দরী (৭৯০–৮৬১ হি. = ১৩৮৮–১৪৫৭ খ্রি.), ***ফতহুল কদীর শরহুল হিদায়া***, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবনান, ২০০০ খ্রি.

১৯২. ইবনে জরীর আত-তাবারী: আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), **জামিউল বায়ান ফী তাওয়ীলিল কুরআ'ন** , দারু হিজর, কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

১৯৩. ইবনে খসরূ আল-বলখী: আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খসরূ আল-বলখী (০০০–৫২২ হি. = ০০০–১১২৭ খ্রি.), **মুসনদুল ইমাম আল-আ'যম আবী হানীফা**, আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়া, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব, প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হি. = ২০১০ খ্রি.

১৯৪. ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

১৯৫. ইবনুল হাকাম, মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকেম (৩২১–৪০৫হি.৯৩৩–১০১৪খ্রি.), আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন, মাকতাবাতু আন- নাসার, রিয়াদ, সউদী আরব, ১৩৮৮হি.১৯৬৮খ্রি.

১৯৬. ইবনে আল জাযারী, আবুল খায়র মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আদ দেমাশকী আল-জাযারী, (৭৫১–৮৩৩ হিজরি) আন নাশরু ফী কিরাআতিল আশর, আল মাতবাআতুত তিজারিয়া আল কুবরা, কায়রো মিশর, ২০১০

১৯৭. ইবনে আল হাল্লাক, জামাল উদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ সায়ীদ ইবনে আল হাল্লাক আল কাসেমী (১৮৬৬–১৯১৪) তাফসীরে মাহাসিনুত তা'বীল, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৩৩২ হিজরি

১৯৮. ইবনে আবিদীন: মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আযীয আবিদীন আদ-দামিস্কী আল-হানাফী (১১৯৮–১২৫২ হি. = ১৭৮৪–১৮৩৬ খ্রি.), **রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার = হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী**, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯. ইবনে আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আব্দুল আযীয আবেদীন, (১১৯৮/১৭৮৪–১২৫২/১৮৩৬) শরহে উকুদে রসমিল মুফতি, ইদারা আল মাআরিফ, কায়রো, ২০১৫খ্রি.

২০০. ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আহিময়ারী আল বসরী (মৃ. ২১৮হিজরি) ফারসি অনুবাদ : রফিউদ্দীন ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ হামেদানী কাজী আবারকূহী, তেহরান, ১৯৮২ খ্রি.

২০১. ইবনুল কাইয়েম জাওযী, আবু আব্দিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আইয়ুব আদ-দেমাশকী (১২৯২–১৩৫০) এলামুল মুকেয়ীন আন রাব্বিল আলামীন, দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া, বৈরুত, ২০০৮ খ্রি.

২০২. ইবনুল কাইয়েম জাওযী, আবু আব্দিল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আইয়ুব আদ-দেমাশকী (১২৯২–১৩৫০) যাদুল মাআদ ফী হাদয়ে খাইরিল ইবাদ, মুআসসেসা আর রিসালা, ১৯৯৮ খ্রি.

২০৩. ইকবালনামা, ইকবালের পত্রাবলী সংকলন, সম্পাদনা: শেখ আতাউল্লাহ, ইকবাল একাডেমী পাকিস্তান, লাহোর-১৯৫১ খ্রি.

২০৪. কাযী আয়ায: আবুল ফযল কাযী আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬–৫৪৪ হি. = ১০৮৩–১১৪৯ খ্রি), **আল-ইমলা ইলা মা'রিফাতি উসূলির রিওয়ায়া ওয়া তাকয়ীদিস সিমা'**, দারুত তুরাস, কায়রো মিসর, প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৯ হি. = ১৯৭০ খ্রি.

২০৫. কাযী যাকারিয়া: কাযিউল কুযাত শায়খুল ইসলাম যয়নুদ্দীন আবু ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে যাকারিয়া আল-আনসারী আল-খাযরাজী আস-সুনায়কী আল-মিরসী আশ-শাফিয়ী (৮২৪–৯২৬ হি. = ১৪২০–১৫১৯ খ্রি.), **ফতহুল বাকী বি-শরহি আলফিয়াতিল ইরাকী**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.

২০৬. কাযী যাকারিয়া: কাযিউল কুযাত শায়খুল ইসলাম যয়নুদ্দীন আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে যাকারিয়া আল-আনসারী আল-খাযরাজী আস-সুনায়কী আল-মিরসী আশ-শাফিয়ী (৮২৪–৯২৬ হি. = ১৪২০–১৫১৯ খ্রি.), **গায়াতুল উসূল ফী শরহি লুব্বিল উসূল**, দারুল কুতুব আল-আরাবিয়া, কায়রো, মিসর, ২০০৩ খ্রি.

২০৭. কাযী আয়ায: আবুল ফযল কাযী আয়ায ইবনে মুসা ইবনে আয়ায ইবনে আমরূন আল-ইয়াহসাবী (৪৭৬–৫৪৪ হি. = ১০৮৩–১১৪৯ খ্রি), **আল-ইমলা ইলা মা'রিফাতি উসূলির রিওয়ায়া ওয়া তাকয়ীদিস সিমা'**, দারুত তুরাস, কায়রো মিসর ও আল-মাকতাবাতুল আতিকিয়া, তুনস, তিউনিশিয়া, প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৯ হি. = ১৯৭০ খ্রি.

২০৮. গাঙ্গুহী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (১২৪৪/১৯০৫–১৩২৩/১৮২৯) সাবীলার রাশাদ, মাতবা মুজতাবায়ী, দিল্লী, ১৩২২ হিজরি

২০৯. তাশ কুবরাযাদাহ: উসামুদ্দীন আবূল খায়র আহমদ ইবনে মুস্তাফা ইবনে খলীল (৯০১–৯৬৮ হি. = ১৪৯৫–১৫৬১ খ্রি.), **মিফতাহুস সা'আদা ওয়া মিসবাহু সিয়াদা**, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-ওসমানিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত, প্রথম সংস্করণ: ১৩২৮ হি. = ১৯০৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

২১০. তাকী উসমানী, মুহাম্মদ তাকী ইবনে মুহাম্মদ শফী ইবনে মুহাম্মদ ইয়াসীন, (১৯৪৩–০০০) তাকলীদ কি শরয়ী হাইসিয়্যত, মাকতাবা দারুল উলুম, করাচি, ১৪২৫/২০০৪ খ্রি.

২১১. তাকী উসমানী, মুহাম্মদ তাকী ইবনে মুহাম্মদ শফী ইবনে মুহাম্মদ ইয়াসীন, (১৯৪৩–০০০) দারসে তিরমিযী, মাকতাবা দারুল উলুম, করাচি ২০১৪ খ্রি.

২১২. রেই শাহরী, মুহাম্মদ রেই শাহরী (১৯৬৪), মীযানুল হিকমাত, দারুল হাদীস কোম, ১৪২২ হিজরি।

২১৩. রামিয়ার, ড. মাহমুদ রামিয়ার (১৯২৩–১৯৮৫), তারিখে কুরআ'ন , ইন্তেশারাতে আমীর কবির, তেহরান, ইরান, ১৯৮৩ খ্রি.

২১৪. সাহারানপুরী, খলীল আহমদ সাহারানপুরী (১৮৫২–১৯২৭), বযলুল মজহুদ ফী হাল্লে সুনানে আবি দাউদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪২৭/ ২০০৬ খ্রি.

২১৫. সালাফী, মুহাম্মদ ইসমাঈল সালাফী (মৃ: ১৯৫৮) তাহরীকে আযাদীয়ে ফিকর ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ কি তাজদীদী মাসাইল, মাকতাবা নযিরিযা, নিউ দিল্লী, ১৯৬৮ খ্রি.

২১৬. সিদ্দীক হাসান খান: আবুল তাইয়িব, মুহাম্মদ সিদ্দীক খান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আল-কিন্নুজী (১২৪৮–১৩০৭ হি. = ১৮৩২–১৮৯০ খ্রি.), **আত-তাজুল মুকাম্মাল মিন জাওয়াহিরি মাআসিরিত তারাযিল আখির ওয়াল আওয়াল**, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনুল ইসলামিয়া, কাতার, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৮ হি. = ২০০৭ খ্রি.

২১৭. সিদ্দীক হাসান খান: আবুল তাইয়িব মুহাম্মদ সিদ্দীক খান ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে লুতফুল্লাহ আল-হুসায়নী আল-বুখারী আল-কিন্নুজী (১২৪৮–১৩০৭ হি. = ১৮৩২–১৮৯০ খ্রি.), **ফতহুল বয়ান ফী মাকাসিদিল কুরআ'ন** , মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত, লেবানন, ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.

২১৮. শাব্বির আহমদ আল-উসমানী: শায়খুল ইসলাম শাব্বির আহমদ ইবনে ফযলুর রহমান আল-উসমানী আদ-দেওবন্দী (১৩০৫–১৩৬৯ হি. = ১৮৮৭–১৯৪৯ খ্রি.), **মাওসূআতু ফতহিল মুলহিম বি-শরহি সহীহিল ইমাম মুসলিম**, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৬ হি. = ২০০৬ খ্রি.

২১৯. হাজী খলীফা, মুস্তাফা ইবনে আব্দুল্লাহ আল হানাফী (জন্ম ১০৬৭ হি) হাদিয়াতুল আরেফীন আসমাউল মুআল্লেফিন ও আসারুল মুসান্নিফীন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৩হি./১৯৯২ খ্রি.

২২০. হাজী খলীফা, মুস্তাফা ইবনে আব্দুল্লাহ আল হানাফী (জন্ম ১০৬৭ হি) কাশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত লেবানন, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.